শারদীয় সংখ্যা / ১৩৭৮

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ২-৩
শারদীয় ১৩৭৮

সূচিপত্র

প্রবন্ধ

গল্প

রিপোর্টাজ

দীর্ঘ কবিতা

কবিতাগুচ্ছ

প্রেমেন্দ্র মিত্র। বিষ্ণু দে। বিমলচন্দ্র ঘোষ। অরুণ মিত্র। বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়। শঙ্খ ঘোষ। বীরেন্দ্র নাথ রক্ষিত। শিবশম্ভু পাল। তুষার চট্টোপাধ্যায়। শান্তি কুমার ঘোষ। অমিতাভ দাশগুপ্ত ১৭২-১৮৪

আল মাহমুদ। সিদ্ধেশ্বর সেন। সতীন্দ্রনাথ মৈত্র। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়। সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। মহবুব আনোয়ার। সুমিত চক্রবর্তী। সাধনা মুখোপাধ্যায় ৩২৫-৩৩১

মণিভূষণ ভট্টাচার্য। গৌরাঙ্গ ভৌমিক। অনন্ত দাশ। আশিস সান্যাল। পবিত্র মুখোপাধ্যায়। তুলসী মুখোপাধ্যায়। রবীন সুর। দীপেন রায়। শিশির সামন্ত ৩৪০-৩৪৬

উপদেশকমণ্ডলী

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য। হিরণকুমার সান্যাল। সুশোভন সরকার।
অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র। গোপাল হালদার। বিষ্ণু দে। চিন্মোহন সেহানবীশ।
সুভাষ মুখোপাধ্যায়। গোলাম কুদ্দুস।

সম্পাদক

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তরুণ সান্যাল

প্রচ্ছদ : ধ্রুব রায়

পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড কলিকাতা ৭ থেকে প্রকাশিত।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বরেণ্য কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

অমর স্মৃতির উদ্দেশে

'পরিচয়'-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য

পরিচয়
বর্ষ ৪১ । সংখ্যা ২-৩
ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৭৮

বুদ্ধিজীবীর বক্তব্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

এই মর্মে অভিযোগ উঠেছে যে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা ওপার বাঙলার মানুষের জন্যে যেমন দরদে আত্মহারা হয়েছেন এপার বাঙলার মানুষের জন্যে তেমন মুখর নন। এপারে কি অনর্থ ঘটছে না! তাহলে এত উপেক্ষা কেন?

অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের হয়ে কথা বলার অধিকার আমাকে কেউ দেয়নি। তাঁদের বক্তব্য তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন। আমি শুধু আমার বক্তব্য বলি। কিন্তু তার আগে বলে রাখি যে, বুদ্ধিজীবী শব্দটি আমার মনঃপূত নয়। ইংরেজিতে ইনটেলেকচুয়াল বলতে যা বোঝায় তা জীবিকার সঙ্গে বাঁধা নয়। যাঁরা বুদ্ধির অনুশীলন করেন তাঁরাই ইনটেলেকচুয়াল। জীবিকা তাঁদের যাই হোক না কেন।

বাঙলাদেশের অভ্যন্তরে গত চব্বিশ বছরে কী ঘটেছে-না-ঘটেছে সে-বিষয়ে আমাদের কারো কোনো সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা ছিল না। আনুপূর্বিক বিবরণও আমরা কেউ জানতাম না। ঘরের ওদিককার দরজাটা একরকম বন্ধ ছিল। বিশেষত মিলিটারি ডিকটেটরশিপ শুরু হবার পর থেকে। শেষের দিকে এমন হয় যে চিঠিপত্র যায়-আসে লণ্ডন বা নিউইয়র্ক ঘুরে। পত্রিকা তো একদম নিষিদ্ধ। রাশিয়ার লৌহযবনিকার কথা শুনেছি। সেটা কি এই বাঁশের যবনিকার চেয়ে দুর্ভেদ্য?

যেখানেই স্বাভাবিক যোগাযোগ দীর্ঘকাল রুদ্ধ হয় সেখানেই হঠাৎ অনবরুদ্ধ হলে আগ্রহের আতিশয্য ঘটে। এই কয়মাসের মধ্যেই সে-আগ্রহ স্তিমিত হয়ে এসেছে। জানবার যা তা আমরা একরকম জেনে গেছি। খুঁটিনাটি জানার বাকি আছে। বছরখানেকের মধ্যে সেটাও অজানা থাকবে না।

তবে সঙ্গে-সঙ্গে একথাও মানতে হবে যে পূর্ববাঙলা আমাদের সবাইকে

স্তম্ভিত করে দিয়েছে। পৃথিবীতে এমন নির্বাচন কখনো হয়নি। এমন অসহযোগও কখনো হয়নি। এমন গণহত্যাও এত কম সময়ের মধ্যে আর কোথাও হয়েছে বলে শুনিনি। হিটলারের ইহুদীহত্যাও পর্যায়ক্রমে হয়েছিল বিস্তীর্ণ সময় জুড়ে। তারপর এমন স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধই বা আর কোথায় ঘটেছে! পূর্ব বাঙলা আমাদের শুধু স্তম্ভিত করেছে তা নয়, উল্লসিত করেছে, বজ্রাহতও করেছে। হাঁ, এমন বিপুলসংখ্যক শরণার্থীই বা আর কোন দেশ থেকে পালিয়েছে, পূর্ববাঙলার সামরিক শাসকদের অপশাসন আমাদের বেদনাবিহ্বল করেছে।

ইতিহাসের এটা একটা অভূতপূর্ব অধ্যায়। এ-অধ্যায় চিরস্মরণীয় হবে। আমরা যদি এর সম্বন্ধে নীরব থাকি তবে আমরাই ভাবীকালের কাছে কৃপার পাত্র হব।

বন্ধুরা একদিন এসে বলেন, "শেখ মুজিবর রহমানকে ওরা নকল বিচারের পর নির্ঘাত বধ করবে। আমাদের কথায় ফল কিছু হবে বলে মনে হয় না, তবু এটা আমাদের কর্তব্য। এটুকু যদি না করি তবে পরে মুখ দেখাব কী করে! মানুষের জন্যে মানুষের কি এইটুকুও করতে নেই।"

আমি অভিভূত হয়ে বলি, "অনেক আগে করা উচিত ছিল। আসুন, করা যাক।"

আমরা যা করেছি ঠিকই করেছি। তবে ভুল হলো এইটুকু যে ময়দানে মিলিত হয়ে আবেদন করা হলো। ময়দান বুদ্ধিজীবীদের যথাস্থান নয়। সেখানে আমরা সমবেত হবার আগে-আগে হাজার ছেলে-ছোকরা জড়ো হয়েছিল। শেখ মুজিবের জন্যে তাদের কারো চোখে জল বা মনে ব্যথা ছিল না। উদগ্র কৌতূহল চিত্রতারকাদের দেখতে। গাড়ি দেখলেই ওরা আটকায়। যখন দেখে তাদের প্রার্থিত মুখ তখন আনন্দে দিশাহারা হয়ে ছুটে আসে, ঘেরাও করে।

সে এক দৃশ্য! এবার আমি বাইরের লোকের মতো নয়, ভিতরের লোকের মতো দেখেছি। কারণ এখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় চিত্রতারকার সঙ্গে একই গাড়িতে আমিও ছিলুম। যোগাযোগটা কাকতালীয়। আমাদের গাড়ি দেখে দু-ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্র-জনতা জালের মতো গুটিয়ে আসে। আমরা যেন মাছ। তা দেখে চালকের যা দৌড়! সে তো সভয়ে ফিরেই যাচ্ছিল। তারকা আর তার স্বামীও সাহস পাচ্ছিলেন না। আমি বলি, "এত ভয় কিসের! চলুন, ওরা আপনাকে মারবে না। ওরা আপনাকে শ্রদ্ধা জানাতে চায়।"

নামলাম আমরা। কিন্তু সামনে ক্যামেরার ভিড় দেখে আমি সঙ্কোচ বোধ

করি। তারকাকে ও তাঁর স্বামীকে নিরাপদ ভেবেই আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। ততক্ষণে বেশ দেরি হয়ে গেছে। সভাস্থলে তখন লোকারণ্য। ভিতরে ঢুকতেই পাইনে। একইরকম অবস্থা আরো অনেকের। পরে তারকা ও তাঁর স্বামীকে না দেখে একটু উদ্বিগ্নই ছিলুম। জনতার শ্রদ্ধাও তো বিপত্তির কারণ হতে পারে। পরে জানা গেল পুলিশের কর্ডন তাঁদের রক্ষা করেছে।

তা হলে দেখুন, পুলিশ কত কাজে লাগে। আদরণীয়কে আদরের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যেও পুলিশকে ডাক পড়ে। ছেলেদের এটুকু শিক্ষাও হয়নি যে নারীকে রক্ষা করতে তারা অনার-বাউণ্ড। আমারও শিক্ষা হলো যে নারীকে আমি না বুঝেসুঝে অভয় দিয়েছি। ওঁরা তো ফিরেই যাচ্ছিলেন, যেতে দিলে পুলিশ ডাকতে হতো না। ভাগ্যিস পুলিশ মোতায়েন ছিল কাছেই। নইলে কী যে হতো?

পশ্চিমবঙ্গের অরাজক ও অসভ্য অবস্থা দেখে এক বন্ধু আমাকে বলেছিলেন, "একটা যুদ্ধ লাগিয়ে দিন। তাহলে দেখবেন সেইদিকেই সকলের সব শক্তি নিয়োজিত হবে। খুনোখুনি দু-দিনেই থেমে যাবে।"

অর্থাৎ মহামারী বাধিয়ে দিলে দৈনন্দিন নরহত্যা নিবারিত হবে। চমৎকার দাওয়াই। একেই বলে রোগের চেয়ে দাওয়াই আরো খারাপ।

না, এর উপযুক্ত দাওয়াই আমার জানা চাই। শেখ মুজিবকে বধ করতে উদ্যত হলে কী করা উচিত সে-বিষয়ে আমার ধারণা অতি স্পষ্ট। কিন্তু একজন নিরীহ পথচারীকে অতর্কিতে আক্রমণ করলে কী করা উচিত তা আমার ধারণাতীত। আমার এত সাহস নেই যে আমিই বাধা দিতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। এসব ক্ষেত্রে আর দশজনের মতো আমারও ধারণা এটা সরকারেরই ডিউটি। তাঁরা আমার কাছ থেকে ট্যাক্স নিয়েছেন, পুলিশ পুষছেন। আমাকেই যদি লোকের প্রাণরক্ষার দায় কাঁধে নিতে হলো তবে পুলিশ কেন? ট্যাক্স কেন? সরকারই বা কেন?

তা ছাড়া আমি এগিয়ে যাব যে, আমার হাতে হাতিয়ার কোথায়? শুধু হাতে কি চার পাঁচজন সশস্ত্র পুরুষের সঙ্গে লড়া যায়। অস্ত্রশস্ত্র যাঁদের রাখতে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের নাকি বলা হয়েছে সরকারের কাছে জমা দিতে। নয়তো বিপ্লবীরা কেড়ে নিতে পারে। কিন্তু সরকারের কাছে নিজেদের বন্দুক রিভলবার পিস্তল যাঁরা জমা দিয়েছেন তাঁদের আত্মরক্ষার কী ব্যবস্থা হয়েছে? এই তো আমার এক প্রতিবেশীর ঘরে একদল যুবক ঢুকে পিস্তল দাবি করল

সেদিন। পিস্তল যে ইতিপূর্বে জমা দেওয়া হয়ে গেছে এ-খবর তারা জানত না। জানলে পিস্তলের জন্যে ভদ্রলোকের ঘর তল্লাসি করত না। অবশেষে তাঁকে গুলি করত না।

এমনি কত ট্র্যাজেডি যে কত জায়গায় ঘটে যাচ্ছে তারজন্যে আমরা কে কতটুকু করতে পারি। তেমনি বিপ্লবীদের উপরে গুলি চলছে। কেন কী অবস্থায় তার কতটুকুই বা আমরা ব্যক্তিগতভাবে অনুসন্ধান করে জানতে পারি? সরকারী বিবরণ যথার্থ কি অযথার্থ তা যাচাই করার সাধ্য কি আমাদের কারো আছে? তাছাড়া অনেক ক্ষেত্রেই এসব ঘটনা তো অন্তর্দলীয়। যে বেশি মার খায় সে-ই পুলিশকে দোষ দেয়। পুলিশ কেন নিষ্ক্রিয়। অথচ পুলিশ যদি সক্রিয় হতো, যদি গুলি চালাত, তাহলে পুলিশকেই দোষ দেওয়া হতো আবার অত্যাচারী বলে। পুলিশকে খুন করা হতোও। পুলিশ তো হামেশাই মরছে।

এ-পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীরাও শত ইচ্ছা থাকলেও মুখ খুলতে পারেন না। খুললেই যার গায়ে লাগে সেই গালাগালি দেয়। সভা করেও দেখেছি বুদ্ধিজীবী-দের কারো সঙ্গে কারো মত মেলে না। অন্ধ কী করে অন্ধকে পথ দেখাবে!

বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে আলোক পাবার আগেই লোকে যে-যার পথ বেছে নিয়েছে। লোকে আজকাল সন্ধ্যের পরে বাড়ি থেকে বড়ো একটা বেরতে চায় না। এমনকি ডাক্তার পর্যন্ত কল দিলে আসেন না। যেসব এলাকায় উপদ্রব বেশি সেসব অঞ্চল থেকে অধিবাসীরা অন্যত্র সরে যাচ্ছেন। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ এলাকায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন। গ্রামেও অরাজকতা। গ্রাম থেকে বহুলোক শহরে শরণার্থী হচ্ছেন। সরকারকেই এর সমাধান সন্ধান করতে হবে। তবে জনসাধারণ যদি উদাসীন হন সরকার একা কী করে পুলিশ বা মিলিটারির সাহায্যে সবাইকে রক্ষা করবেন? পুলিশ বা মিলিটারির উপর অতখানি নির্ভর করলে রাষ্ট্র যে পুলিশ রাষ্ট্রেই পরিণত হবে। কিংবা মিলিটারি রাজ চেপে বসবে।

বুদ্ধিজীবীদের দিকে না তাকিয়ে জনসাধারণ যদি নিজের দিকে তাকায় তা হলে দেখবে যে জনমতই সবচেয়ে প্রবল শক্তি। জনমত প্রবল বলেই মানুষ মানুষের মাংস খায় না। মানুষ রাস্তায় উলঙ্গ হয়ে বেড়ায় না। এসব বন্ধ করার জন্যে কেউ সরকারের দ্বারস্থ হয় কি? বুদ্ধিজীবীদের উপর বরাত দেয় কি? জনসাধারণ পণ করলে দৈনন্দিন নরহত্যাও বন্ধ করতে পারে। দাদারা না বলেন তো নাই বললেন। সাধারণ লোকেরও তো মুখ আছে। তারা যদি একবার মুখ খোলে তা হলেই যথেষ্ট কাজ হয়।

'জনপদ' রুশ

গোপাল হালদার

সৌভাগ্যক্রমে রুশ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আজ আমাদের সরাসরি পরিচয় ঘটছে। সাধারণত সমসাময়িক কালেই আমাদের আগ্রহ। এমনও মনে করি অক্টোবর বিপ্লবের ফলে রুশিয়ার প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইতিহাস ও ঐতিহ্য দুই-ই বুঝি এখন গৌণ ও গুরুত্বহীন। এইখানেই মস্ত একটা ভুল ধারণা প্রশ্রয় পায়। রুশিয়া নিশ্চয়ই পূর্বেকার 'শ্লাভোফিল'দের রুশিয়া নেই,—কিন্তু সোভিয়েত জীবনাদর্শে গঠিত হয়ে উঠতে-উঠতেও রুশিয়া 'পাশ্চাত্যবাদী'দের রুশিয়া হয়ে ওঠেনি; বরং হয়েছে আধুনিকধর্মী এক 'রুশোফিল' রুশিয়া। যারা সমসাময়িক রুশ সমাজ ও সংস্কৃতির মধ্যে আপাতবিরোধী ভাবধারা ও কর্মকাণ্ডের লক্ষণ দেখেন, তাঁরা এই কথাটার মর্ম বুঝতে পারেন না। মার্কিন-দেশের মতো রুশিয়া হালেজন্মা দেশ নয়—এমনকি, পাশ্চাত্য য়ুরোপের অগ্রসর দেশের থেকেও রুশিয়ার জীবনে ভালোমন্দ শুদ্ধ তার অতীত ঐতিহ্য বেশি দুর্মর। কিরূপে? দিগন্তবিস্তৃত রুশ স্তেপভূমি, বহু বিস্তৃত অরণ্যাণী বিপুল নদীপথ,—রুশিয়ার বহিঃপ্রকৃতির এই ভৌগোলিক অবস্থা শিল্পোদ্যোগে পরিবর্তিত হয়নি। মানব প্রকৃতির থেকেও—প্রশান্ত সাগরের উপকূল থেকে উত্তরসাগর পর্যন্ত দুই মহাদেশে বিস্তৃত বিরাট রুশদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ বসতির জনপদ জীবন অল্পাধিক বিচ্ছিন্ন, তাতে বৈচিত্র্য ও অ-সমতা সামান্য নয়। এই ভৌগোলিক ও জন-বিন্যাসে যে আবহমান রুশ জীবনধারা গড়ে উঠেছে, তার সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অর্থ ঐ পারিবেশিক-বিধৃত জীবনধারার বিলোপ নয়,—বরং আধুনিক শিল্পজীবন ও প্রয়োগবিজ্ঞানের সৌকর্যে তার আধুনিক প্রকাশ। নিশ্চয়ই যদিও অনেক পরিবর্তন রুশিয়ার অনিবার্য—টেকনোলজিক্যাল প্রভাব সমস্ত উন্নত দেশেই সুদূরপ্রসারী। কিন্তু এই রুশিয়ারও আধুনিককালের গতিরূপ বুঝতে হলে যেমন জার সাম্রাজ্যের রুশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্র না চিনলেই নয়, তেমনি আধুনিক রুশ সাহিত্য ও সমাজকে যথাযথ বুঝতে হলে রুশ জাতির আবহমান ইতিহাসকেও একবার সমগ্রভাবে না দেখলেও চলে না।

কথাটা আরও বিশেষ স্মরণীয় রুশ-সাহিত্যের জিজ্ঞাসু ছাত্রদের পক্ষে, 'রুশ সাহিত্যিকেরা চিরদিনই তাদের জাতির সমস্যাগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত···তাদের সাহিত্যেই রয়েছে তাদের সমাজচিন্তা আর তাদের সমাজ-চিন্তাই তাদের সাহিত্য' বর্তমান গ্রন্থের লেখকের এই উক্তি যে যথার্থ, রুশ-সাহিত্যের মনোযোগী পাঠককে তা স্বীকার করতেই হয়। লমনোসভ পুসকিন থেকে আরম্ভ করে মাত্র দেড়শ পৌনে দু'শ বৎসরের যে রুশ-সাহিত্য তাই আধুনিক রুশ-সাহিত্য, পৃথিবীর যে-কোনো আধুনিক বৃহৎ সাহিত্যের সঙ্গে এই যে সাহিত্য সমানক্ষেত্রে দাঁড়ায় তার উৎকর্ষ ও বৈশিষ্ট্য দুইই বিস্ময়কর। কিন্তু আমরা অনেকেই রুশ-সাহিত্যের সেই বৈশিষ্ট্য ঠিক মতো অনুধাবন করতে পারি না—কারণ তার পরবর্তী বিকাশ পথটা আমাদের দৃষ্টিতে অনালোচিত।

আধুনিক রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙলার ক্ষুদ্র বৃহৎ আলোচনা দেখা যায়। কিন্তু পুশকিনের পূর্ববর্তী রুশ-সাহিত্য সম্বন্ধে তা বিশেষ দুর্লভ। বোধহয় অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'ঈগরদলের কথা' একমাত্র উল্লেখযোগ্য সেরূপ লেখা। একটা কারণ রুশ-ভাষা যদি বা কিছু কেউ জানি, প্রাচীন রুশ-ভাষা বুঝবার ক্ষমতা আমাদের বিশেষ কারও নেই। আর সেই কারণেই প্রাচীন রুশ-সাহিত্যেও আগ্রহ নেই। অবশ্য ইংরেজি জার্মান প্রভৃতি ভাষা থেকে সে বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা যায়। সেসব ভাষায় নির্ভরযোগ্য ওরূপ বইও আছে। সম্প্রতি শ্রী অসিত চক্রবর্তী মহাশয় প্রাচীন রুশ-ভাষা ও সমাজ জীবন নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। শ্রীযুক্ত অসিত চক্রবর্তী তাঁর 'প্রাচীন রুশের সাহিত্য ও সমাজচিন্তা' (প্রকাশক সুবর্ণরেখা, দাম আট টাকা) গ্রন্থখানি রচনায় সেসব ভাষার বইয়ের সুযোগও নিয়েছেন, তা বুঝতে পারি। তা ছাড়া তিনি নিজে রুশ-ভাষা ভালো জানেন এবং সোফিয়ায় (বুলগেরিয়া) তিন বৎসর পড়াশোনা করে স্লাভগোষ্ঠীর ভাষার অনুশীলনও করেছেন। কাজেই মূল রুশ-ভাষার গবেষণা গ্রন্থাদিরও সদ্ব্যবহার তিনি করতে পেরেছেন। বাঙালির পক্ষে এরূপ প্রস্তুতি আর কারও আছে কিনা জানিনা। থাকলেও, অসিত চক্রবর্তী মশায়ই বোধহয় বাঙলা ভাষায় রুশ-সাহিত্যের এই প্রেক্ষাপট নির্দেশে প্রথম ব্রতী হয়েছেন। আর সে-দায়িত্ব পালনও করেছেন যোগ্যতার সঙ্গে। আনন্দের কথা ভারত গভর্ণমেণ্টের অর্থানুকূল্য এর মুদ্রণে পাওয়া গিয়েছে; এবং লেখকের অগোচরেই বইখানা

নেহরু পুরস্কারও লাভ করেছে (১৯৭০)।

রুশ-সাহিত্যের এ-প্রেক্ষাপট যে কী, তা এখানে বলবার অবকাশ নাই। শুধু আভাস দিতে পারি—প্রথমত জাতি হিসাবে নানা জাত মিলিয়ে রুশ জাতি—স্লাব (আর্য গোষ্ঠীর) তবু মূল বনিয়াদ। সেই জাতি গঠনের ইতিহাস অনেক জাতির ওরূপ ইতিহাসের মতোই জাতি-উপজাতির দ্বন্দ্ব ও মিলন মিশ্রণের ইতিহাস। জিজ্ঞাস্য হতে পারে সোভিয়েত যুগ বহুতর জাতি যেরূপ নিবিড় ও গভীরভাবে বর্তমান রুশ জীবনের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে তা কি রুশজাতির স্বাভাবিক নতুনতর প্রসারেরও একটা আভাস নয়? কিন্তু সে ভাবীকালের কথা। আমাদের আপাতত জিজ্ঞাস্য অতীতের রুশিয়া!

একেবারে অতীত স্বভাবতই অস্পষ্ট—রুশিয়া, উক্রাইন, শ্বেত-রুশিয়া এই ভূভাগে স্লাবগোষ্ঠীর ও শক, হুন, খাজার, মঙ্গোল ও তাতার প্রভৃতি নানা জাতি-উপজাতির খণ্ডখণ্ড অঞ্চলে দ্বন্দ্ব-মিলনের অধ্যায়। মনে রাখা দরকার সে জীবনেরও বুনিয়াদ ছিল বিচ্ছিন্ন গ্রামের চাষী ও বিক্ষিপ্ত গঞ্জের হাটের ব্যবসায়ী ও বণিক। এই জনপদ জীবনের অধ্যায় অ-লিখিত পর্ব। রুশ জাতির লিখিত ইতিহাসের সূচনা কিয়েফ্‌কে কেন্দ্র করে, কিয়েফ্‌ উক্রাইনের প্রধান শহর। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে নর্ডিক-যোদ্ধা যুরিক সেখানে এক রাজবংশ স্থাপন করেন; কিয়েফ্‌ তাঁদের আমলে প্রাধান্য বিস্তার করে। তখনো তারা অনেক প্রাচীন জাতির মতোই নানা দেবতা-অপদেবতায় বিশ্বাসী, পূজো করত নানা মূর্তি। খ্রীঃ ৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে কিয়েফ্‌-এর রাজা ভ্‌লাদিমির খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করলেন। সেই সূত্রেই মুখ্যত আরম্ভ হলো ইতিহাসের বিদিত যুগ। গ্রীক বর্ণমালাকে ভিত্তি করে কিরিল ও মেথুদিয়স দুই সন্ন্যাসী ভ্রাতা তখন প্রবর্তন করলেন কিয়েফ্‌-এর ভাষা লেখার বর্ণমালা। কিয়েফ্‌-এর নব-দীক্ষিতদের ভাষায় লেখা হলো খ্রীষ্টধর্মের কথা। এই ভাষা প্রথমত বুলগারীয় স্লাবেরই একটা রূপ;—রুশিয়ার চর্চ বা ধর্মমণ্ডলী তা বরাবর ব্যবহার করে আসছেন সেই সময় থেকে প্রায় অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সকল কাজে বিশেষ করে ধর্মবিষয়ক রচনায়। বলাবাহুল্য, বিজাতীয় চর্চের আওতায় এই ভাষা, বাক্যরীতি সবই একটু কৃত্রিম। এ-ভাষাকে বলা হয় 'চর্চ স্লাবোনিক'—এবং তা প্রাচীন বুলগারীয় ভাষারই নামান্তর। তবু প্রাচীন রুশ সাহিত্যেরই প্রথম রূপ আবার ওই কিরিল লিপির সাহায্যে সেই দশম শতাব্দীর পর থেকে কিয়েফ্‌-এর নানাস্থানে লেখা হতে শুরু হয় নানা ধরনের সাহিত্য, ইতিবৃত্ত, কাহিনীকাব্য

ইত্যাদি। এসব রচনার বুনিয়াদ কিয়েফ্ অঞ্চলের 'ক্ষেত্রবাসী' ('পলিয়ান') মানুষের তখনকার কথ্যভাষা। এটিও তাই প্রাচীন রুশ ভাষারই একটা রূপ—দ্বিতীয় রূপ। বলা বাহুল্য, সে ভাষায়ও 'চর্চ স্লাবোনিক' বা প্রাচীন বুলগারীয় ভাষার প্রভাব প্রচুর তবে মূল রূপটা কথ্য, জীবন্ত। কিয়েফ্-এর এই যুগের রুশ সংস্কৃতি ও রুশ-সাহিত্যকে বলা হয় 'কিয়েফ্ রুশ'—মস্কো ও মধ্যঅঞ্চলের 'আধুনিক রুশ' থেকে তার পার্থক্য বোঝাবার জন্য। কিয়েফ্ রুশ প্রাচীন রুশেরই এক নাম। লিখিত রুশ-সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন অবশ্য ধর্মচর্চায়, তার যে রূপ তা চলে চর্চ স্লাবোনিকে, যা মূলত প্রাচীন বুলগারীয় ও কৃত্রিম ভাষা। আর 'ঈগর দলের কথা'র মতো কিছু কাহিনীকথা, ইতিকথা লেখা হয়। চর্চ স্লাবোনিক মিশ্রিত 'ক্ষেত্রবাসী'দের কথ্যরূপে। 'প্রাচীন রুশভাষা' বলতে এই ভাষাই বিশেষ করে বুঝোয় এই কিয়েফ্ রুশ।

কিয়েফ্-এর প্রতিপত্তির শেষে, সামন্ত প্রধানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে, ক্রমে স্থির হয় মস্কোর প্রাধান্য। আরম্ভ হয় মস্কোর যুগ যাতে 'জার'দের আবির্ভাব। তখনো পূর্বেকার সাহিত্যধারা অক্ষুণ্ণ থাকে—তবে তখন মস্কোর রাজদফতরের কাজে দেখা যায় মস্কো অঞ্চলের কথ্যভাষার মর্যাদা—এইটিই আধুনিক রুশ ভাষার প্রাথমিক রূপ। কিন্তু চর্চ স্লাবোনিক-এর প্রতিষ্ঠা সে-সময়ে ধার্মিক লেখায় বরাবরই অব্যাহত। আর 'কিয়েফ্-রুশ'ও প্রভাবহীন নয় সেই মস্কো যুগের রুশভাষাতেও। আধুনিক রুশভাষা তাই মিশে আছে তার এই তিনরূপে—'চর্চ স্লাবোনিক', 'কিয়েফ্ রুশ' ও 'মস্কো কেন্দ্রিক মধ্যযুগের কথ্যরুশ'। ভাষার দিক থেকে এই মোটামুটি রুশভাষার বিকাশধারা।

রুশ-সাহিত্যের দিক থেকে আবার বলা চলে—প্রথম হলো অলিখিত রুশ লোকসাহিত্যের ধারা—যা পরে সংগৃহীত ও লিখিত হয়েছে। সেই লিখিত রূপের ভাষা প্রাচীন নয়, কিন্তু এ-বিষয়ে, সাহিত্যরূপে ঐতিহ্যে অ-খ্রীস্টান প্রাচীন উপজাতি চাষী ও বণিকদের ভাব ও ঐতিহ্য নিয়ে এই লোকসাহিত্য গঠিত। খ্রীস্টান হবার পরেও এ-ধারা লুপ্ত হয়নি। আধুনিক রুশ-সাহিত্যের লেখকরাও (পুশ্‌কিন, গগল, লেরমনতফ্, তলস্তোয় প্রভৃতি) তার থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছেন। রুশ-সাহিত্যর দ্বিতীয় পর্ব হলো প্রাচীন রুশ-সাহিত্য অর্থাৎ লিখিত 'কিয়েফ্ রুশ'-এর সাহিত্য—চর্চ স্লাবোনিক রুশ ও 'নিজ কিয়েফ্'-এর কথ্যরূপে তা বিধৃত। সে-সাহিত্যর তৃতীয় পর্বে (প্রায় লমনোসোফ থেকে) আঞ্চলিক রুশ-সাহিত্য। আর ১৯১৮এর পরে জন্মে—চতুর্থ পর্বের

সোভিয়েত রুশ-সাহিত্য।

লেখকের এই গ্রন্থে আলোচ্য প্রধানত রুশ লোকসাহিত্য,—আর সেই অলিখিত প্রাচীন যুগের রুশের সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন যা প্রধানত ওই লোকসাহিত্য থেকে সংগৃহীত। 'কিয়েফ্ রুশ' সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি মাত্র একটি অধ্যায় যোগ করেছেন, তা যথেষ্ট বলতে পারি না। কিন্তু সে খেদ তিনি মিটিয়ে দিয়েছেন ৪টি চমৎকার অধ্যায়ে রুশ লোকসাহিত্যের সম্বন্ধে উদ্ধৃতি পূর্ণ তথ্যে। এবং তৎসহ রুশ লোকসাহিত্যের সহিত সম্পর্কিত গবেষণা-সংবাদের আরও ৩টি অধ্যায় যোগ করে—যথা 'জর্জ ভার্ণভস্কি'র মূল প্রাচীন রুশ ধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রবন্ধের সারানুবাদ, 'পুশকিন ও লোকসাহিত্যে'র আলোচনা এবং রুশিয়ায় লোকসাহিত্যের ইতিহাস রচনার ইতিহাস। কোনো অধ্যায়েরই মূল্য সামান্য নয়। যাঁরা লোকসাহিত্য রসিক তাঁরা আনন্দলাভ করবেন লেখকের উদ্ধৃত (ও অনূদিত) রুশ লোকসাহিত্যের নিদর্শন সমূহ পাঠে—'স্কাজকার' (রূপকথা) নানারূপ ও তার সামাজিক তাৎপর্যে, 'চাস্তস্কা'র ('ছড়া' জাতীয়, 'ননসেন্স রাইম'), 'পেসজিয়া' (গীত) ও 'বীলিনা' (বীরগাথা) প্রভৃতির নানা নিদর্শনে রসাস্বাদনে। কৃষির গান, শ্রমের গান, বিয়ের, নানা উৎসবের গান—কী অসামান্য এ-সম্পদ! কী তার শিল্পপ্রকরণ! কতকটা আমাদের দেশেরই মতো—এবং কোথায় তার আবার আমাদের দেশের ওসব লোকসাহিত্যের থেকে পার্থক্য—সে-ভাবনাও লেখকের কৃপায় পাঠকের জ্ঞানে সঞ্চারিত হতে বাধ্য।—উপাদেয় যেমন এই মূল বিবরণভাগ, তেমনি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য অপরভাগের লেখকের পরিবেশিত ভার্ণাভস্কির আলোচনা, এবং রুশ লোকসাহিত্যের গবেষণার ইতিহাসপ্রকৃতি। সকৃতজ্ঞ-চিত্তে রুশ সমাজ ও সাহিত্যের জিজ্ঞাসু পাঠকদের পক্ষ থেকে আমরা লেখককে তাই অভিনন্দন জানাই বাঙলাভাষায় এই গ্রন্থ লাভ করে।

একটি গৌণ কথাও নিবেদন করি—অনেক কথা সংক্ষেপে বলতে গিয়ে—এবং কখনো-কখনো বিষয়ের গৌণাংশে দৃষ্টি বেশি দিয়ে—পাঠককে তিনি বিপন্ন করে ফেলেছেন। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভেবে দেখবেন আরও একটু পরিচ্ছন্ন, শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মুখ্য বিষয় পরিবেশন সম্ভব কিনা। মোট ১৭০ পৃষ্ঠার এই বইখানা আসলে গ্রন্থের প্রথম পর্ব—'জনপদ রুশ'-এর কথা। দ্বিতীয় পর্বে প্রকাশিত হবে 'সামন্ত রুশ'-এর কথা।

এক চিল্‌তে কালো কাপড়

রণেশ দাশগুপ্ত

এক

ষাটের দশকের প্রথমদিকের কথা। বাইরে থেকে এসেছে কয়েকজন বিদেশি আর বিদেশিনী ঢাকায়। এসে বসেছে খবরের কাগজের দপ্তরে। 'কী আছে বাঙলাদেশে দেখাবার?' ভেবেছে সাংবাদিকরা। কিছুটা বিব্রত তারা। নোটবই বের করেছে এক বিদেশিনী, বলেছে, 'জামদানী ঢাকাই শাড়ি। সে কি দেখবার মতো আছে?' ভেবেছে সাংবাদিকরা। 'কারিগর দেখতে চাই, দুনিয়ার সেরা কারিগর রয়েছে তোমাদের দেশে', বলেছে বিদেশিনী। 'বেঁচে আছে সেই তাঁতিরা?' সাংবাদিকরা দ্বিতীয়বার বিব্রত। দেখা গিয়েছে বিদেশিনী পাকা খবর নিয়ে এসেছে, গ্রামের নাম পর্যন্ত। অতঃপর জীপে চড়ে গ্রামযাত্রা।

'এমন রূপ, এমন রূপদক্ষ শিল্পী আছে এই বাঙলাদেশে। অথচ একী দারিদ্র্য, একী অপরিসীম দুঃখ!' কথাটা বেরিয়ে এসেছে এক বিদেশির মুখ থেকে।

জামদানী ঢাকাই শাড়ির কারিগরের খোঁজে গণ্ডগ্রামে উপস্থিত বিদেশি আর বিদেশিনীরা। যে-শিল্পীর আঙুলে জামদানী শাড়ির কাজ হয়, যার হাত দুটি জাদুকর, সে একেবারে মুখোমুখি বসে। বিদেশি আর বিদেশিনীরা চেয়ে রয়েছে সত্তর বছর বয়স্ক জরাজীর্ণ বৃদ্ধ তাঁতির মুখের দিকে। না-খেয়ে না-খেয়ে একী কঙ্কাল চেহারা! দুই চোখভরা দুঃখ আর অনিশ্চয়তা।

এরপরেই ফিরে আসার পথে চোখে পড়েছে গ্রামীণ মানুষজন। কলস্বিনী নদীর ধারে-ধারে আলতো করে বসানো জলরং-এর ছবির মতো একেকটা গ্রামে টিনে আর ছনে ছাওয়া ঘরের বেড়ার আশেপাশে একী নিদারুণ দারিদ্র্যের দাহে পোড় খাওয়া হাজার-হাজার মানুষ।

প্রশ্ন : এসব কথা লেখা হয় না তোমাদের কাগজে?

উত্তর : না। সামরিক আইনের নিষেধ।

প্রশ্ন : বই লেখা হয় না?

উত্তর : না, ছাপানো বিপদ। ছাপাখানাই উঠিয়ে দেবে এসব বই ছাপলে।

আগামীকাল একুশে ফেব্রুয়ারি! বাঙলা ভাষা আন্দোলনের শহীদদিবস। সরকার-হুঁশিয়ার। বে-আইনি ইস্তাহারের সন্ধানে নিরাপত্তা বিভাগের লোকেরা ঢাকা শহরে প্রায় পঞ্চাশটা ছাপাখানায় হানা দিয়েছে গতরাত্রে।

একজন সাংবাদিকের পকেট থেকে বেরিয়ে আসে কালো কাপড়ের একটা চিল্‌তে। মৃদু হেসে সে বলে, আমাদের প্রতিবাদের একমাত্র ভাষা। আমাদের ইস্তাহার। এজন্যে কোনো ছাপাখানার দরকার হয় না। সকলেই ঝুঁকে পড়ে।

সাংবাদিক বলে, এ-হলো কালো আগুনের শিখা। এ-শুধু শোকের চিহ্ন নয়। একদিন এই আগুন দাউদাউ করে জ্বলে উঠবে সারা দেশে। আগামী কাল এক ঝলক্ দেখতে পাবে যদি চোখ খোলা রাখো।

বিদেশি আর বিদেশিনীরা পরদিন সকালে হোটেলের অলিন্দে দাঁড়িয়ে তাদের কৌতূহলী চোখ খোলা রাখে। কোথা থেকে এল এতগুলি অগ্নিশিখা এই বিষণ্ণতার ছাই চাপাপড়া দেশ থেকে! রাওয়ালপিণ্ডির স্ফীতোদর সামরিক শাসকদের ভ্রূকুটিকে তুচ্ছ করে শত-শত কালো পতাকা উড়িয়ে খালি পায়ে মিছিল করে চলেছে তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীরা শহীদ মিনারের দিকে। দার্শনিক পাস্‌কাল ভঙ্গুর নলখাগড়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন মানব-মানবীর। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলেছেন, এই নলখাগড়া চিন্তাভাবনার অধিকারী, তাই সর্বজয়ী। শহীদ মিনারের পথের যাত্রী এই ক্ষীণাঙ্গ তরুণ-তরুণীরাও কি তাই? অথবা নতুন কালের দার্শনিকের দৃষ্টিতে নতুনভাবে তুলনীয়? এরা এমন বিপ্লবী বিদ্রোহী চিন্তায় উদ্দীপিত, ফরাসি বিপ্লবের প্রথম পথিকৃতেরা যাদের কথা ভাবতে পারেননি। ডাগর-ডাগর চোখে জোড়া-জোড়া চেতনার টুকরো-টুকরো সূর্য অজস্র। ভোরবেলায় বেরিয়েছে নিশ্চয় না খেয়েই। এমনিতেই বুঝতে পারা যায়, প্রথম যৌবনেই দারিদ্রে অনাহারে পোড় খাওয়া। 'জন্মেই দেখেছে অন্ন নেই।' তবু এদের পদভারে কাঁপছে পৃথিবী। চাপা বিদ্রোহের ইন্ধনে এরা প্রাণবন্ত।

মিছিল কিন্তু নীরব নিস্তব্ধ। হয়তো কথা বলছে কালো পতাকাগুলি। ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেরই কামিজে কালো কাপড়ের চিল্‌তে আঁটা। লাহোর করাচী রাওয়ালপিণ্ডির নবাবদের পাকানো বাঁকা চোখের ওপর একী রাষ্ট্রদ্রোহ!

শুধু ভাষার এত শক্তি! কী ধরনের ব্যাখ্যা হতে পারে এর?

দুই

বাহান্ন সালের পর থেকে বাঙলাদেশের মানুষ একটার পর একটা অভ্যুত্থানে শরিক হয়ে সংগ্রামের উত্তুঙ্গ শিখর থেকে খাদে নেমে আবার উঠবার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌছেছে, 'আমাদের আর কিছু না থাক, আমাদের বাঙলাভাষা আছে।'

একেকটা অভ্যুত্থানের পরে দেখা গিয়েছে, ভেঙে গিয়েছে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলির ঐক্য। মনে হয়েছে কাঁচের বাসনের মতো ভেঙে গিয়েছে যৌথ কর্মসূচি, যৌথ ভাবনাচিন্তা। মনে হয়েছে, কুড়িয়ে-কাড়িয়ে বিষয়গুলিকে জোড়া দেওয়া আর সম্ভব নয়, দলগুলিকেও নয়। কর্মসূচির বিভিন্ন বিষয়কেও নয়। একথা মনে হয়েছে, '৫৫ সালে যখন যুক্তফ্রন্ট দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল, '৬৩ সালে যখন জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ে উঠেও উঠল না, '৬৯ সালের মার্চ মাসে যখন ১১ দফা আন্দোলনের বিজয়ীরা ভাগ হয়ে গেল। কিন্তু প্রত্যেকবারই নতুন করে ঐক্য হয়েছে দুটো কারণে। একটা কারণ নিছক বাঁচার জন্যে তলা থেকে উঠে দাঁড়ানো। আরেকটা বাঙলাভাষাকে বাঁচানো।

প্রথমত, শাসকচক্রের বিরুদ্ধে সমস্ত নিপীড়িত মানুষকে বিদ্রোহের জন্যে নতুন করে সাজতে হয়েছেই। কিছু না করে পারা যায়নি চূড়ান্ত অপ্রস্তুতির মধ্যেও। শাসকচক্রের নির্মম শোষণের অঙ্কুশ অস্থির করে তুলেছে বাঙলাদেশের মানুষকে। এই অস্থিরতার প্রতিভূ হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা, কারণ তারা প্রতিভূ হয়েছে জনগণের।

দ্বিতীয়ত ২১এ ফেব্রুয়ারি বারবার ফিরে এসেছে। এক চিল্‌তে কালো কাপড়ের নিশানায় পুনরভ্যুত্থানের আহ্বান নিয়ে। শহীদ-মিনারের সামনে দাঁড়িয়েছে তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের পেছনে কাতার দিয়ে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলি। আবার মুখ দেখাদেখি হয়েছে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলির।

'৫৪ সালে, '৬২ সালে, '৬৯ সালে এবং তারপরে '৭১ সালে সংগ্রামী রাজনৈতিক দলগুলি যখন বাইরে এক হয়েও মনে এক হতে পারেননি, যখন ঐক্যের শর্তগুলিকে কণ্টক মনে করে আপদ হিসেবে ধরে নিয়েছে, তখন তরুণ-তরুণী ছাত্র-ছাত্রীদের আহ্বানে জনগণ একটা জায়গায় বিনা শর্তে বিনা দরা-দরিতে নিষ্কণ্টক নিরাপদ হয়ে মিলতে পারার পথ দেখিয়েছে। সেটা বাঙলা ভাষাকে নিরাপদ নিষ্কণ্টক করার তাগিদ। বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ব্রতী সংগ্রামী দলগুলি শহীদমিনারে দাঁড়িয়ে সকলেই অন্তত একটা কথা বলেছে,

'তোমার মর্যাদা রাখব বাঙলাভাষা।' লাহোর-করাচী-রাওয়ালপিণ্ডির নবাবেরা এটা প্রথম থেকেই আন্দাজ করেছিল। এইজন্যে তারা বাঙলাভাষাকে আক্রমণ করেছিল ১৯৪৮ সালেই। ১৯৪৮ সালে পিছু হটে ১৯৫২ সালে বাঙলাদেশকে আবার তার মাতৃভাষা থেকে ছিঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল। আবার পিছু হটে ১৯৫৯-৬০ সালে বাঙলাভাষার রাষ্ট্রভাষা মর্যাদা বাঁ-হাতে দিয়ে ডান-হাতে সেই মর্যাদাকে কেড়ে নিতে চেষ্টা করেছিল। তারা বাঙলা হরফের জায়গায় রোমান হরফ প্রবর্তন করার আয়োজন করেছিল কোনোরকমের বৈজ্ঞানিক কারণে নয়। সেটা তারা করতে চেয়েছিল জনগণের ব্যবহার্য ভাষা এবং রাজকার্য অথবা উচ্চশিক্ষার ভাষার মধ্যে একটা দুর্লজ্ঘ্য কৃত্রিম প্রাচীর খাড়া করে বাঙলা-ভাষাকে চিরকালের মতো দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা করতে। বাঙলাদেশকে যারা উপনিবেশ হিসেবে শোষণ করতে চেয়েছে, তারা বাঙলাভাষাকে হিন্দু-মুসলমান হিসেবে ভাগ করে তার গণভিত্তিতে বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস করতে চেয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটা ঘোঁট পাকিয়ে তোলার পিছনে ছিল এই মতলবটাই।

এছাড়া বাঙলা একাডেমি এবং বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডকে সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাজেট বরাদ্দের মারফত আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে শাসকচক্র চেয়েছিল বাঙলা-সাহিত্যের চর্চার ওপর খবরদারি—কড়া খবরদারি কায়েম রাখতে। বাঙলাভাষার চর্চা যাতে বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামী রাজনৈতিক চিন্তা আর কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত না হতে পারে সে-সম্বন্ধে তারা নিশ্চিত হতে চেয়েছিল। বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের চর্চাকে রাওয়ালপিণ্ডি-ইসলামাবাদের আমলারা প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে রাখতে চেয়েছিল একে বাঙালি জাতিসত্তার অনিবার্য বৈপ্লবিক বিকাশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বাজেট বরাদ্দের রাশ টেনে রাখা বাঙলা একাডেমি আর বঙালা উন্নয়ন বোর্ডেও বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের তরঙ্গরাশি তলাভেদ করেই উছলে উঠেছে। শেষপর্যন্ত শুকনোকাঠ হয়ে যাওয়া ডালেও যেমন বসন্তের দূতেরা কিশলয়ের পতাকা তুলিয়ে দেয় তেমনিভাবে। অর্থাৎ, রাওয়াল-পিণ্ডি-ইসলামাবাদের ক্ষমতাসীনচক্র বাঙলাভাষাকে খর্ব বরার চেষ্টা করেছে '৪৮ সাল থেকে '৭০ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তা মানাতে পারেনি তারা। এইজন্যেই শেষ-পর্যন্ত তারা সংহার করতে চেয়েছে একে ৭১ সালের ২৫এ মার্চ শহীদমিনারের ওপর ট্যাঙ্কের গোলা মেরে বাঙালি জাতিকেই ধ্বংস করার উদ্দেশ্য নিয়ে তারা বাঙলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কামান-ট্যাঙ্ক-জঙ্গীবিমান-যুদ্ধজাহাজ নিয়ে।

বাঙলাদেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষ এই হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ খাড়া করতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। একেবারে খালিহাতে শুরু হয়েছে এই মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু শক্তি এসেছে খালিহাতেও প্রথমাবধি। বাঙলাদেশের সাড়ে সাত কোটি বাসিন্দা একটা ভাষায় কথা বলতে পারে, নিজেদের বুঝতে পারে, নিজেদের ঐক্যকে রক্ষা করতে পারে।

তিন

বাঙলাদেশের শ্রমিককৃষক এবং মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং তাদের বিভিন্ন মুখপাত্ররূপী রাজনৈতিক দল ও সংগঠনকে মুক্তিসংগ্রাম চালাতে গিয়ে বারবার যুক্তফ্রন্ট গঠন করতে হয়েছে। যদিও এইসব যুক্তফ্রন্ট টেকেনি, তবু একটা স্রোতের খাতে প্রবাহিত হয়ে এসেছে সংগ্রাম। শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ বিভিন্ন শ্রেণীও পেয়েছে এই খাত, এই খাতটা বাঙলাভাষার খাত। যাঁরা সমস্ত মুক্তিসংগ্রামকে শ্রেণীসংগ্রামের প্রেক্ষিতে বিচার করেন, তাঁরাও ভাষাতত্ত্বের বিচারে বসে বলেছেন, ভাষা সমগ্র সামাজিক। ভাষা জাতিসত্তার অন্যতম সার্বিক উপাদান। বাঙলাদেশের ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে এই সিদ্ধান্তের সত্যতা। ইসলামাবাদ রাওয়ালপিণ্ডিচক্রের বিরুদ্ধে বাঙলাদেশের সাড়ে সাতকোটি বাসিন্দার ২৪ বছরের মুক্তিসংগ্রামে শ্রেণীগত সত্তার মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের দরুণ অন্তর্দ্বন্দ্বজনিত মতভেদ ঘটলেও, বাঙলাভাষার ঐক্যের তাগিদ অন্তঃশীলভাবে বহমান থাকায় মতভেদগুলি জনগণের অথবা বাঙালি জাতিসত্তার ঐক্যের ধারাটিকে প্রভাবিত করতে পারেনি, বিপর্যস্ত করতে পারেনি। এমনকি ১৫ই মার্চ তারিখে ইসলামা-বাদ-রাওয়ালপিণ্ডির সামরিকচক্র যখন বাঙলাদেশের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে সমস্ত রকমের মারণাস্ত্র আর ধ্বংসাস্ত্র নিয়ে তখন মুক্তিসংগ্রামী দলগুলি একটা বিশেষ মুক্তিসনদের চুক্তিপত্রে একমত না থাকলেও জনগণ দিশাহারা হয়ে পড়েনি। অন্ততপক্ষে এটা বলা যায়, সেই চূড়ান্ত মুহূর্তেও জনগণ ঐক্যবদ্ধ থাকতে পেরেছে, কারণ জনগণ একভাষায় কথাবলতে পেরেছে। সেভাষা সোনার বাঙলার মাতৃ-ভাষা রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাঙলা' জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে সামনে এসে গিয়েছে যেন এক প্রকৃতিদত্ত অধিকারে। এখানে মধ্যবিত্তশ্রেণী বাঙলাভাষাকে লাভ করার তাকে সচেতনতার মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানোর ব্যাপারে উদ্যোগী অংশ নিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের পর্যায়ে এ-বিষয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্যোগী অংশ নিচ্ছে। কিন্তু অন্যান্য শ্রেণী তথা শ্রমিক এবং কৃষকেরাও বাঙলাভাষার শক্তি

যোগানের কাজে গভীরভাবে নিয়োজিত রয়েছে। বিশেষ করে কৃষকসমাজের কথাটা এখানে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার।

মধ্যবিত্তশ্রেণী বাঙলাভাষার ব্যাপারে বরাবরই সোচ্চার থেকেছে। এজন্যে মূল্যও তাকে দিতে হয়েছে নির্যাতন বরণ করে। শ্রমিকশ্রেণী প্রথমদিকে এবিষয়ে সোচ্চার না থাকলেও পরের দিকে সোচ্চার হয়ে উঠেছে মুক্তিসংগ্রামের সমস্ত রকমের ঝুঁকি নেবার ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে। কৃষকসমাজ বা শ্রেণী এ-বিষয়ে অবশ্য খুব সোচ্চার বলে মনে হয়নি। বাস্তবপক্ষে ২১এ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিক-ভাবে গ্রামাঞ্চলে খুব বেশি পালিত হয়নি। কৃষকসমিতির তরফ থেকে ২১এ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যাপক কোনো কর্মসূচি বেশ কিছুকাল পর্যন্ত নেওয়া হয়নি। এতে হয়তো ওপর থেকে দেখার জন্যে বাঙলাভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো কোনো মহলে ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে বাঙলাভাষার ব্যাপারে এবং বাঙলা-ভাষার জন্যে সংগ্রামের ব্যাপারে কৃষকসমাজ যথেষ্ট অগ্রণী নয়। আসলে ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশীদার ছাত্রছাত্রীদের মারফত কৃষকসমাজ এ লড়াইয়ে শরিক হয়েছে। ব্যাপকভাবে ছাত্রছাত্রীরা এসেছে বাঙলাদেশের কৃষক-সমাজ থেকেই। বাঙলাভাষার ব্যাপারে কৃষকসমাজের ভূমিকা সাধারণভাবে সোচ্চার না হওয়াতে রাওয়ালপিণ্ডির কর্তাব্যক্তিরা উৎসাহিতই বোধ করেছে নিশ্চয় এবং এই কারণেই উপায় উদ্ভাবন করে বিভিন্ন সময়ে ভেবেছে যে, মুক্তি সংগ্রামকে শক্তিহীন করে দেওয়া যাবে ব্যাপক গ্রামীণ সমাজের পটভূমিতে। কিন্তু আসল সত্যটা এই যে, বাঙলাদেশে কৃষকসমাজই বাঙলাভাষার মূল রিজার্ভ বা ভাণ্ডার। বাঙলাভাষার ইতিহাস এই সত্যের ইতিহাস।

এখানে শুধু একটা কথাই প্রমাণ হিসেবে সামনে রাখা যেতে পারে। বাঙলা দেশে গত হাজার বছরে রাজভাষা রূপে বাঙলাভাষার স্থান হয়নি। রাজভাষা রূপে স্থান পেয়েছে প্রথমে সংস্কৃত, তারপরে ফার্সি, তারপরে ইংরেজি। প্রথমে সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় এবং পরে এই সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থায় কিছুকিছু বুর্জোয়া উপাদান যুক্ত হয়েছে বলে উচ্চশ্রেণীরা বাঙলাভাষাকে ছেড়ে রাজভাষার দিকেই ঝুঁকেছে। বাঙলাভাষাকে বাঁচিয়ে রেখেছে অবনত স্তরের শ্রেণীসমূহ তথা গ্রামীন সমাজ তথা কৃষকসমাজ। এর অর্থ এই নয় যে, শুধু বাঙলাভাষার রূঢ় রূপটি অথবা আদিরূপটিকে কৃষকসমাজ ধরে রেখেছে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কঠোর মধুর, আকাড়া কাড়া, আদি এবং আগন্তুক যা কিছু দিয়ে বাঙলাভাষা প্রসারিত হয়ে এসেছে গত কয়েক হাজার বছর ধরে, তার সকলকেই কৃষকসমাজ আপন

ভাষার ভাণ্ডারে জমা করেছে, ব্যবহার করুক বা নাই করুক। বাঙলা লোক-কাব্য তথা লোকসঙ্গীতই এর প্রমাণ।

বাঙলাদেশব্যাপী গ্রামীণ সমাজ এই বাঙলাভাষা সঞ্চিত এবং প্রসারিত হওয়ার জন্যেই এর আগে যারা বাঙলাদেশকে দখল করেছে এবং শাসন করেছে এবং বশে আনতে চেয়েছে তারা বাঙলাভাষাকে নষ্ট করে দিতে পারেনি অথবা স্থানচ্যুত করতে পারেনি। উপেক্ষা করেছে তারা কৃষকসমাজকে, কারণ কৃষক সমাজকে শোষণ করেছে তারা এবং দাবিয়ে রেখেছে। কৃষকসমাজের মাতৃ-ভাষাকে তারা আমলে আনতে চায়নি। (অবশ্য কোনোকোনো খেয়ালী রাজপুরুষ নবাব রাজা ব্যতিক্রম)।

বাঙলাভাষা অচ্ছুত থেকেছে সেইসব মধ্যবিত্তের কাছেও যারা রাজকীয় ভাষাকে ধরে আরোহণ করতে চেয়েছে সমাজের অভিজাত স্তরে।

রাষ্ট্রের কর্ণধাররা সাধারণভাবে ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের অধিকর্তা হওয়ার বাঙলাদেশের গণভাষাকে রাজকার্য অথবা শিক্ষার বাহনরূপে স্থান দেবার কথা চিন্তা করতেও পারেননি। ওয়ারিশ সূত্রে বাঙলাদেশকে উপনিবেশরূপে লাভ করেছে মনে করে করাচি-লাহোর-রাওয়ালপিণ্ডির কর্তাব্যক্তিরা বাঙলাভাষাকে একইভাবে অস্তিত্বহীন বলে ধার্য করতে চেষ্টা করে এবং গদিনসীল হয়েই ফরমান জারী করে যে, উর্দু হবে বাঙলাদেশেরও রাষ্ট্রভাষা। গ্রামাঞ্চলের ভাষা কৃষকের ভাষা, বাঙলা ভাষা যে রাষ্ট্রের ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে, এটা তাদের তালিমের বাইরে ছিল। কিন্তু তারা গ্রামেই বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে ধাক্কা খেল, তবে পুরোপুরি বুঝতে পারল না, বিদ্রোহী বাঙলাভাষার মূলভাণ্ডার সঠিকভাবে কোথায় অবস্থান করছে। তারা প্রথমে ভেবেছে, বাঙলাভাষার প্রতিরোধের ব্যাপারটা ঘটেছে শুধু শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের তরফ থেকেই।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ যে ১৯৪৮ সালের পর থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাওয়ালপিণ্ডি চক্রের বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব দেখাতে পেরেছে স্থায়ীভাবে বাঙলাভাষার অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালাতে গিয়ে, তার সম্মতি এসেছে বাঙলাদেশের সেই মৌন গণসমুদ্র থেকে, যার অন্তরে রয়েছে বাঙলাভাষার কমপক্ষে হাজার বছরের সঞ্চয়।

কৃষকসমাজ ক্রমবর্ধমানভাবে তার সম্মতি জানিয়েছে বাঙলাদেশের গণ-তান্ত্রিক মুক্তিসংগ্রামের পতাকাবাহী ছাত্রছাত্রীদের মারফত, যাদের মধ্যে ক্রমেই বেশি-বেশি করে প্রতিফলিত হয়েছে কৃষকসমাজের মুক্তির তাগিদ,

কারণ, ছাত্রসমাজের শ্রেণীকাঠামোতে বেশি-বেশি করে কৃষকসমাজের আনুপাতিক গুরুত্ব প্রসারিত হয়ে এসেছে।

বাঙলাভাষা আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ গানগুলি যে কৃষকসমাজের পক্ষে বোধ্য ভাষায় কৃষক তথা গ্রামীণ সমাজকে লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছে, এটা নিছক রূপরীতির ব্যাপার নয়।

বাঙলাদেশের নিপীড়িত কৃষকসমাজ এবং সেই কৃষকসমাজ থেকেই সম্প্রতি উদ্ভূত বাঙলাদেশের শ্রমিকশ্রেণী এখনও হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারে না যে, বাঙলাভাষাকে কৃষকসমাজ এবং শ্রমিকশ্রেণী কী গভীর মমতায় লালন করে চলেছে। কিন্তু তবু আদায় করে নেন শিল্পীর কাছ থেকে শর্তহীন স্বীকৃতি। কৃষকসমাজ আজ যে গণপ্রজাতান্ত্রিক স্বাধীন বাঙালি জাতি ও রাষ্ট্রের মূল শক্তি-ভাণ্ডার তার মূলে রয়েছে কৃষকসমাজের বাঙলাভাষার ঐতিহাসিক রক্ষক হিসেবে ভূমিকা। বাঙলাভাষার গবেষণা অথবা গণ-প্রজাতন্ত্রের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে কৃষকসমাজের গৌণ ভূমিকাকে বড় করে দেখলে মাতৃভাষা, স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের সংগ্রামে বাঙলাদেশের কৃষকসমাজের কার্যকর এবং সম্ভাব্য বিরাট বিপ্লবী ভূমিকাকে বুঝতে পারা যাবে না।

রাজীব উপাখ্যান

অমিয়ভূষণ মজুমদার

এখন মজুন্দারকে একটু অন্যরকম দেখায়। মাথায় মাঝ বরাবর টাক, বেশ পাকা গোঁফ, গায়ে তসরের পাঞ্জাবি। এক-কথায় কলকাতার টেরিলিন যুগে তাকে বহিরাগত বলে চিনতে দেরী হয় না, এবং সেজন্যই শেয়ালদায় নামা মাত্র চাটুয্যে তাকে নিজের অভিভাবকত্বে গ্রহণ করেছে, এক পাও একা নড়তে দেয় না; কেন না নতুন মুখ দেখলেই পাড়ার ছেলেরা তাকে সরিয়ে পুলিশী জুলুম দূর করলেম মনে করতে পারে।

হেসে মজুন্দার বলল, এসবই স্থরু অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে যেদিন খুনী আসামীদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো তুলে নিলেন। কেন-না এই আশা করা গেল রাজনীতির নামে খুন, সেটাইতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ, তা করেও তুমি বেকসুর খালাস পেতে পার। অর্থাৎ খুন করাটা দোষের নয়। ওটার টাইমিং নিয়ে যা-কিছু মতের গোলমাল।

চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করল, তুমি হাসছ? একে তো রাজনীতির মতামত বলে, তুমি এই বুঝি নতুন পথ ধরেছ? মজুন্দার বলল, তুমি কি কফির অর্ডার দিয়েছ চাটুয্যে? সে সিগারেট বার করে ধরাল। বললে, আমার নতুন গল্প এইভাবেই স্থরু হয়েছে। অথবা যদি তোমাদের আপত্তি থাকে ১২৭।২ লাউডেন স্ট্রিটের বাড়িটা থেকে তবে আরম্ভ করি। এ-বাড়িটা তোমাদের চিনতে অস্থবিধা হবে না। যে কোনো গলি দিয়ে লাউডেন স্ট্রিটে ঢুকেই তুমি জংধরা লোহার ছোটখাট স্তূপ অনেক দেখতে পাবে। তুমি যদি ভালো করে দেখ দেখতে পাবে হেন লোহার তৈরি জিনিস নেই যার ভাঙা, বিকল অবশেষ সেখানে অনুপস্থিত: প্যারামবুলেটর, হিটার, মোটরের এঞ্জিন, ডাক্তারী যন্ত্র, হাসপাতালের লোহার খাটের টুকরো, মরচে ধরা ছোরা, রেফ্রিজারেটরের ডালা, পেরেক, পার্কের রেলিং, ছাপাখানার কলের টুকরো, ইত্যাদি—কি নেই সেই স্তূপে!

ভটচায হেসে বলল—অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতির নিদর্শন সবকিছুই

সেই স্তূপে উপস্থিত এটা যদি গল্পের সুরু হয়, তাহলে আমিই কফির অর্ডার দিচ্ছি এবং স্ন্যাক্‌স্।

মজুন্দার বলল, এখন, ১২৭।২ বাড়িটা যখন তৈরি হচ্ছে তখন এমন ছিল না। রাস্তাটা তখন নতুন হচ্ছে। ফলে এটাই তখন কলকাতার আধুনিকতম পাড়া। সেজন্যই জজসাহেব রিটায়ার করে বাড়িটা করেছিলেন।

চাটুয্যে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে চাইল। বলল, বুঝছি তুমি রাস্তার ওপারের বাড়িটা নিয়েই গল্প বানাতে চেষ্টা করছ।

মজুন্দার বলল, এখান থেকে কি দেখা যাচ্ছে? লোহার স্তূপটার পাশে একটা অষ্টিন গাড়ি আছে দেখতে পাবে। সেটাই ছিল একেবারে হালের মডেল। আর তারপর কালের স্রোত আরও দক্ষিণে সরে যেতেই, এই বাড়ি গাড়ি আর পাড়া আর তেমন চোখে পড়ার মতো নয়। অন্যদিকে দেখো নতুন অবস্থায় এটা তো ছিল বহিরাগতদের কলোনি—সবাই বিভিন্ন জায়গা থেকে এসে বাড়ি করছিল। এখন এই পাড়ায় জন্মেছে, এ-পাড়াই যাদের পৃথিবী এমন সকলেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং লাউডেন স্ট্রিটের বৈশিষ্ট্য নিয়ে তারা দাবি পেশ করে থাকে।

কিন্তু, চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করল, ১২৭।২ কেন? ওর সামনেই তো ভাঙা লোহার স্তূপটা বেশ বড়ো।

অন্য রকমেও সুবিধা আছে। মজুন্দার বলল, বাড়িটা এ-রকম যে গল্পের মানুষ কয়েকটিকে একটি জায়গায় পাওয়া যাচ্ছে। তিন ভাই-এর তিনটি পরিবার—তারা বেশ পৃথক আবার একত্র। সাধারণ গল্পে এ-রকম লোক-গুলোকে একত্র আনতে ঘটনার সূত্রপাত করতে হয়, প্রাথমিক আলাপ আলোচনা বর্ণনা করতে হয় নতুবা পাঠক বিশ্বাস করতে চায় না; এখানে দরজা খুলে করিডরে এলেই হলো। আর তা ছাড়া ভাই তো, কাজেই প্রাথমিক আলাপ আছে ধরে নেয়া যায়। জজসাহেব ওদিকে দূরদর্শী ছিলেন। বাড়ির প্ল্যানই এমন যে তিনটে সমান ভাগ করে নেয়া যায় বাড়িটাকে এক তলা দোতলা তিনতলায়। একইরকম দেখতে তিনভাই। আর তা বলতে হলে একটা কথা এখানে বলা দরকার জজসাহেবের এই পরিবারের স্ত্রী-পুরুষেরা অর্থাৎ শর্মা পরিবার তিনটিতে সকলেই রূপবান ও রূপবতী।

চাটুয্যে খঁৎ করে হাসল। তোমাদের গল্প লেখকদের সুন্দর পুরুষ আর সুন্দর স্ত্রী না হলে মানায় না। অথচ দেশের শতকরা আশি জনের গায়ের রং

কালো চোখ-নাক-ঠোঁট-মুখ অখাদ্য।

মজুমদার বলল, ঠিক তা নয়। বরং কফি আসছে দেখো। চাঁদকে মেঘে দেখে চালের চোরাকারবারী মেয়ে বলে মনে করি না বটে, এই রূপের ব্যাপারে আমরাও কিন্তু ভাবছি। রূপ বলতে যে গৌরবর্ণ, টানা চোখ, চোখা নাক ইত্যাদি মনে আসে তাতো একটা স্টাণ্ডার্ড, বংশ পরম্পরায় টাকার জোরে তেমন গর্ভধারিকাদের যোগাড় করতে থাকলে দু-তিন পুরুষ পরে বংশের সবাই তেমন সুরূপা-কুরূপা হতে পারে। ইনকাম ট্যাক্সকে ফাঁকি দিতে পারলে রূপ সংগ্রহ করা যায়—এটা সূত্র হতে পারে। পার্কিনসনের সূত্রের মতো।

কফি এসেছিল। সেটাকে টেনে নিয়ে মজুমদার বলল, যাই বল কফিটা তোমার ভালো এই পাড়াতেও।

চাটুয্যে সিগারেট ধরাল।

তা দেখে মজুমদার বলল, তুমি বদলাওনি দেখছি। কফির কাপে চুমুক দিয়েই এখনও সিগ্রেট ধরিয়ে থাক।

চাটুয্যে বলল, কিন্তু তোমার বদল হয়েছে, মজুমদার। তোমার এখনও হাসিমস্করার সময় আছে। ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিলে মানুষ সুরূপা হয় বল।

কিছু একটা বলতে গিয়ে মজুমদার থামল। সে-যে পিছিয়ে আছে তাতে সন্দেহ নেই। তার কথাবার্তার হাল্কা ভঙ্গিতে এদের কাছে তা ধরা পড়ছে এরকম সন্দেহ হয়। যেন আড়াল নিতে সে একটু তাড়াতাড়ি বললো, আমাদের গল্পটা কিন্তু ১২৭।২ এর সবগুলি সুন্দর নর-নারী সম্বন্ধে নয়। সে-বাড়িটা থেকে তিন-চারজনকে বেছে নিলেই হবে। তিন ভাই এবং তাদের একজনের স্ত্রীকে গল্পে আনলেই চলবে। আর সকলেই থাকছে। কিন্তু তাদের কথা না বললেও ধরে নিতে অসুবিধা হবে কি?

চাটুয্যের মন এ-গল্পে আসছে না বোঝা গেল। সে বলল, গুজব এই তুমি নাকি নতুন করে গল্প লিখতে রাইফেল আর ঘোড়া বেচে সেই টাকায় কলকেতায় থাকতে এসেছ?

মজুমদার এবার হাসল। বলল, ওটা গুজব। সেটা একবার হবে এমন মনে হয়েছিল। কিন্তু ঘোড়াটা ৪৭ খৃষ্টাব্দে মরেছে। রাইফেল ইদানীং থানায় জমা দিয়েছি। এ-সত্ত্বেও আমি যদি মনো করো, খোলা আকাশ-বাতাসের বন-জঙ্গলের মানুষ থেকে গিয়েছি তা ভাগ্যদোষে।

ভটচায বলল, কিন্তু এবার আপনি আমাদের এই সহরের একটা বাড়ির

কথা বলতে চাইছেন তো? তাও নতুনই হবে। সেই চেষ্টাই করছি।

চাটুয্যে বলল, আচ্ছা, কও তাই। তা হলে লাউডেন স্ট্রিটের সেই তিন ভাই এবং তাদের একজনের স্ত্রী কি করল তোমার। মজুন্দার কফি পট থেকে আর একটু কফি আদায় করল। বলল, কি আর করবে। তাদের কিছু করার আগে জজসাহেবের ছক্ করা শেষ হয়ে গিয়েছিল। ফলে আমাদের এই গল্প আরম্ভ হওয়ার সময়ে বড়, মেজ এবং ছোট তিন ছেলেই উপার্জনশীল, মাঝারি ধরনের পুষ্ট টাকযুক্ত চেহারা, এবং নিজনিজ অফিসে মাঝারি ধরনের কর্তাব্যক্তি বা সংক্ষেপে সাহেব। মেজ এবং ছোট মার্চেন্ট অফিসে, বড় রাইটার্সে। এবং তাদের প্রত্যেকের দু-তিনটি করে কুড়ি-একুশ থেকে বারো-তেরো পর্যন্ত বয়সের পুত্র-কন্যা আছে। পুত্র-কন্যাদের মধ্যে কারো কারো পোশাকে, ব্যবহারে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠা করার ঝোঁক দেখা দিচ্ছে। যেমন ধরো বড়তরফের বড়মেয়ে একদম সাদা যুঁইফুলের মতো ভয়েলের শাড়ি পরে বাইরে যাওয়া পছন্দ করে। মেজতরফের ছেলে বড়ো। ভটচাজ বলল, এদের সম্বন্ধে আর জেনে কি হবে। এরা তো গল্পে সামনে আসছে না।

মজুন্দার বলল, তা ঠিক বলেছেন বরং এদের পরিবারের সেই স্ত্রীটির কথা বলা যেতে পারে। কিন্তু এখানে আমার একটা খটকা লেগেছে চাটুয্যে। কারো অতীত দিয়ে তার বর্তমানকে বুঝতে চেষ্টা করা যায় কি না! দেখ আদালতে এই প্রথা আছে যে অভিযুক্ত আগেও অপরাধ করে শাস্তি পেয়েছিল এটাকে বর্তমান অভিযোগের প্রমাণ হিসাবে নেয়া হয় না। যদিও আমরা সাধারণ মানুষ একবার চোর তো চিরকালই চোর এ-রকম যুক্তিকে সমর্থন করি।

চাটুয্যে বলল, জনসাধারণের এই ধারণা উড়িয়ে দেয়ার মতো নয়। লোকটি যে প্রথমবার চুরি করেছে তাতে এটা বোঝা যায় সে অধিকসংখ্যক লোক থেকে পৃথক।

ভটচাজ মনে করিয়ে দিল, কিন্তু আপনি বোধহয় নারী চরিত্রের কথা বলছিলেন। তাতে এমন সব প্রশ্ন উঠতে হলে আন্দাজ করতে হবে কেউ অভিযুক্তা না হোক অপরাধিনী ছিল।

বেশ, মজুন্দার বলল, ব্যাপারটা তা হলে নিজেদের মধ্যে পরিষ্কার করে নিলে হয়। এখন থেকে কুড়ি বছর আগে যদি কেউ কোনো বিষয়ে সাধারণের চাইতে অন্যরকমের কিছু ঘটিয়ে থাকে এখন বর্তমানে তার মধ্যে সে-রকমের

ঘটানোর ঝোঁক থাকতে পারে কিনা সেটাই দেখতে হবে। যদিও এই কুড়ি বছর সে যে বিষয়েও সমাজের দশজনের মতো চলে এসেছে। চোরের ব্যাপারে বিষয়টা যদি টাকা, এ-ব্যাপারে বিষয়টাকে সেক্স বলতে পার।

চাটুয্যে বলল, এ দেখি গল্পটা জমে উঠে, ব্যাপার কি? মজুন্দার বলল, না এতে হাসি-ঠাট্টার কিছু নেই। শব্দটা ইংরেজি। রাবীন্দ্রিক কায়দায় তাকে প্রেমজীবনও বলতে পার। আর তোমরা দুজনে নিশ্চয় বিশ্বাস কর পুরো একটা পুরুষের কাছে চিন্তার স্বাধীনতা আর পুরো একটি স্ত্রীমানুষের কাছে সেক্স সমান মূল্যবান। কোনো কারণেই এ-দুটোকে খর্ব করলে তারা আর পুরোটা থাকে না। যাক সে কথা, আমাদের গল্পের নায়ক প্রাক্তন জজসাহেবের ছোটছেলে রাজীবলোচন তার জ্যেষ্ঠের বিয়ের পাঁচ-সাত দিন পরে আবিষ্কার করেছিল অদ্ভুত নির্জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে নববধূ। বাড়িভরা লোকজন; বাড়ি দেখতে, বিয়ে দেখতে কলকেতায় এই সুযোগে চিকিচ্ছে করাতে আত্মীয়-স্বজনে বাড়ি ঠাসা। সস্ত্রীক জজসাহেব জীবিত—তারই মধ্যে একটি মেয়ের পক্ষে ভোররাতের কিছু পরেই অন্যান্য ঘরগুলি থেকে কয়েক হাতের মধ্যে অমন একটা নির্জন কোণ খুঁজে নেয়াইতো এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা। অদ্ভুতভাবে নির্জন সেই বারান্দার কোণ তো তার শোবার ঘরের পাশেই অথচ যেন বাড়ির বাইরের অনেক দূরের এক নির্জন পার্কের রেলিং। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নতুন বিয়ে হওয়া সেই আঠারো-উনিশের মেয়েটি। মুখের চন্দনের উপর দিয়ে শুকনো কান্নার দাগ আর সেই দাগের উপর দিয়ে আরও জল নামছে। নীল ঢাকাই শাড়ি পরনে। নতুন ঝকঝকে জড়োয়ার গহনায় যার শরীর উজ্জ্বল সেই মেয়েটির এই ভোর সকালে এমন কান্নার কি হতে পারে? যেন তার চারিদিকে তখন এক বিষণ্ণ উদাস নিঃস্ব বৈকাল—যাকে দিবসান্ত বলে।

তখন আমাদের রাজীবলোচনের যেসব যতটুকু অভিজ্ঞতা ছিল তার সাহায্যে সে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেও গেল। তা যে ভুল এটা সে নিজেই পরে বুঝেছিল। কিন্তু সেই ভুল সিদ্ধান্তের উপরে এই বাড়ির বড় বৌ এবং ছোট দেওরের—(তারা দুজনেই তখন আঠার-উনিশ) মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ সখ্য গড়ে উঠেছিল। দেওর-ভাজে সখ্য আমাদের সমাজে এখনও কিছু আছে, কিন্তু বলছি যে এটা তার চাইতে বেশি কল্লোক্ষ ছিল। একবার নায়ক বলেছিল আমি বিয়ে করব ভেবেছ? কেন? কেন? বউদির মুখটা প্রথমে গম্ভীর, তারপরে বিষণ্ণ হলো; তারপর হাসিতে টোল খেল তার গাল; হেসে

সে মেঘ উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল—পাগল হতে হয় না কি? তখন, ঠিক তখনই নয়, কাছাকাছি সময়ে নায়ক একদিন নিজের ঘরে গিয়ে সেই গানটা করেছিল রবিবাবুর, যাতে বলা আছে—কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া তোমার চরণে দিব হৃদয় খুলিয়া। কিন্তু প্রণয়ের কথা কি করে বলি তুমি যে স্বপ্নের দেবতা। আজ যখন নিজেই জিজ্ঞাসা করছ তখন কি করে বলব কত ভালোবাসি।

চাটুয্যে বলল, কিন্তু এটা তো ভুল সিদ্ধান্তের উপরে তৈরি কিছু। আর এ প্রণয় তোমার গল্পও না।

মজুন্দার বলল, ভুল সিদ্ধান্তের উপরে কি মানুষ খুন করা যায় না। আর তখন কি সে খুন করা লোকটা ফিরে আসছে সিদ্ধান্তটা ভুল ছিল বললে। এক্ষেত্রেও সখ্যটা তো প্রকৃত। সব সময়েই অবশ্য সেটা গান গাইবার মতো থাকেনি; কিন্তু এখনও বোধহয় যদিও যাচাই করা হচ্ছে না কারণের অভাবে অনেকদিন, ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে পৃথক্ পরিবার হয়ে যাওয়ার পরেও পরস্পরের বিশ্বাসভাজন থেকে যাওয়ার মতো মন আছে।

ভটচায বলল, অর্থাৎ কি না, যাকে ফ্রিজিড বলে তাই ছিল নাকি মেয়েটি।

মজুন্দার বলল, বরং উল্টোটাই হতে পারে। হয়তো কেন? নিশ্চয়ই সে অসাধারণ গভীর কবিতার মতো পবিত্র একটা পাপকে সেক্স মনে করে থাকবে।

চাটুয্যে চিন্তা করে বলল, অর্থাৎ নায়িকার মন যাতে এক পদার্থ আছে।

মজুন্দার বলল, কথাটাকে একটু ঘুরিয়ে বল বরং কোনো কোনো পুরুষ যেমন কখনই অন্যের বা নিজের চিন্তাকে এই শেষ কথা বলে চিন্তার স্বাধীনতাকে বর্জন করার উপায় নেই; নিজের চিন্তায় স্বাধীনতা নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি নেই, তেমন এমন কোনো কোনো স্ত্রীলোক থাকতে পারে যাদের সেক্স-চিন্তা শয্যার চিন্তা থেকে পৃথক, তা তাদের কাছে চিন্তার বিষয়।

ভটচাজ বলল, আর একবার কফি দিতে বলা হবে।

মজুন্দার বলল, এখনই? সময়ের দিক দিয়ে আমরা বোধহয় গল্পের শুরুরও আগে আছি এখনও। মাঝামাঝি এলে তখন বরং। এখানে আর একটা প্রশ্ন ঠিক করে নেওয়া দরকার—বই আমাদের জীবনে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে।

আপনি কি মরাল্ সেন্সের কথা বলছেন? ভটচাজ জিজ্ঞাসা করল।

ঠিক তা নয়। মজুন্দারের এ-বিষয়ে নিজেরই সন্দেহ আছে। সে বলল,

দেখ, চাটুয্যে আমার তো মনে হয় না সাহিত্যের চরিত্রগুলোকে কেউ সত্যি বলে মনে করে। কিন্তু সে-সব চরিত্র বিভিন্ন অবস্থায় পড়ে যেমন ভাবে যা করে তা কি আমাদের চিন্তা এবং কাজকে পথ দেখায়? আগে যে সব ব্যামোকে সহ্য করা হতো এখন তাকে আর দেব-নিগ্রহ বলে মানা হয় কি? অ্যান্টি-বায়োটিকস্ সম্বন্ধে শুনতে-শুনতে এখন আনাড়িও সেসব রোগের নিদান বলতে পারে যেন। শরীরের ভিতরের বিগড়ানো সম্বন্ধে আমরা কি আগের মতো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হই? অমুকের এইরকমের অসুখে ডাক্তার এই ওষুধ দিয়েছিল এই বলি না কি? তেমন ধরো যে সব আধুনিক সাহিত্য পড়েছে, সে কি নিজের মনের বিশেষ অবস্থায় একটা পথ খুঁজে নিতে পারে না? মনে কর লেডি চ্যাটার্লি যে পড়েছে তার মনের কি অনেকগুলো সঙ্কোচ কেটে যায় না। একটু সাহসিকা হয় নাকি সে?

চাটুয্যে বলল, এ-সম্বন্ধে এ-রকম মত আছে যে যদি কেউ তাকে অনুসরণ করে তবে বুঝতে হবে সে নিজে থেকেই লেডি চ্যাটার্লি ছিল। কিন্তু গল্পটা বল হে, মজুন্দার। দেখাই যাচ্ছে মানুষ নিজের শরীরের ভিতরের কলকব্জা বিগড়ালে এখন নিশ্চেষ্ট থাকে না। মূক-বধির যন্ত্রণা ভোগ করতে চায় না। অন্যদিকে এমন যদি তোমার নায়িকার সংশ্লিষ্ট বিষয় হয় তবে আমরা এও মনে রেখেছি সে প্রায় কিশোরী বয়সেই একদিন সেক্স নিয়ে কান্নাকাটি করেছিল অর্থাৎ ও-বিষয়ে সে সিআরিয়াস ছিল।

ভটচাজ বলল, তা ছাড়া, গল্পটা ১২৭/২ লাউডেন স্ট্রিটের হলেও শুরুটা অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে কি করেছিল তা থেকে শুরু।

মজুন্দার হেসে বলল, তাহলে কফি আসুক। তা আসতে-আসতে আমরা গল্পের মাঝখানে যেতে পারব। বেয়ারা এল। আঙুল তুলতেই, আলুর চিপ ভাজা আর কফির অর্ডার নিয়ে চলে গেল।

মজুন্দার বলল, তাহলে রাজীবলোচনকে আমরা বরং অনুসরণ করি।

চাটুয্যে হঠাৎ বলল, কিন্তু একটা কথা, মজুন্দার, এটা কিন্তু কলকাতা আর—হাঁ, তা বোধহয় একটু গলা নিচু করে জ্যান্ত বা মৃত রাজনীতি সম্বন্ধে কথা বলা ভালো।

মজুন্দারকে কি ফ্যাকাশে দেখাল? সে বলল, তোমার কি মনে হয় আমাদের কথা কেউ শুনছে। আর তা ছাড়া এটা তো বিখ্যাত কোনো কফিহাউসও নয়।

অনেক লোক কফি হাউসে। দেখলে বরং আগের চাইতে উজ্জ্বল, স্বচ্ছল, চটুল বলে মনে হয় বিভিন্ন টেবলের নরনারীদের। কিন্তু এ বা কি সত্যি-সত্যি একপাশে বসা এই তিন মাঝবয়সীর আলাপ থেকে একটা-দুটো বাক্য শুনে, কি বলছেন মশাই। চামড়া খুলে নেব না, বলে চ্যালেঞ্জ করতে পারে?

অনেক ভাবনা আছে যার ইঙ্গিত মাত্রেই এর থেকে ওর মনে চলে যায়। ভটচায বলল, কথাটা যখন উঠেছে তখন বরং নাম বাদ দিয়েই চলুক।

মজুন্দার রুমাল দিয়ে কপাল ও ঘাড় মুছল! আর সে জন্যই যেন তার গোটা মুখটা টকটকে লাল হয়ে ছিল। কপালের শিরাটা দপ্‌দপ্‌ করছে যেন। সে হেসে বলল, রাজীবলোচন তার চেম্বারে ছিল। অ্যাকাউন্টের কাজ। কাজেই মাঝে-মাঝেই লেজার, স্টেটমেণ্ট, এবং ফাইল নিয়ে দুরন্ত প্যাণ্ট-শার্ট পরা কেরানিরা যাওয়া-আসা করছে। সে কোনো ফাইল রাখছে, কোনো স্টেটমেণ্টে তখনই সই করে দিচ্ছে। তখন বেলা প্রায় দুটো হবে। লাঞ্চের পরে আবার অফিস শুরু হচ্ছে। রাজীবলোচন তার চেম্বারে লাঞ্চ করে। তার গৃহিণীর তৈরি কিন্তু তার টিপিনের বাক্সে বরং সাহেবি খানা থাকে অন্য অনেক সাহেব রেস্তোরায় যা খায় তার নিরিখে। হ্যাঁ, সে তার গৃহিণীকে ভালোবাসে বই কি। ঠিক এমন সময়েই তার সেকশানের চার-পাঁচজন ফাইল ইত্যাদি হাতে করেই বটে, কিন্তু পরের-পর নয়, একসঙ্গে ঢুকল এবং কাজ চলতে-চলতে, কাজের কথা হতে-হতেই, রাজীব যে-রকমটা আন্দাজ করেছিল, খেলার কথা শুরু হলো। ইডেনে সেদিন ভারি মূল্যবান একটা খেলা। তাদের ফার্ম খেলাধূলার ব্যাপারে একটু উদার, বিশেষ করে এ-রকম এক থিয়োরি তাদের আছে যে এসব ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া উচিত। যারা এসেছিলেন তাদের মধ্যে বয়স্ক একজন বলল; যাচ্ছেন তো সবাই বুম্‌বাম্‌ হবে না তো।

রাজীবলোচন বলল, সেটা আবার কি হলো?

—বোম্‌।

—আরে সে তো আছেই বোম্‌কালী কলকাত্তেওয়ালী। কলকেতা আর বোম্‌।—

—কি যে হলো দেশের!

কয়েকটা সই বাকি ছিল। তা করে দিয়ে উপস্থিত কর্মচারীদের দিকে চাইল। সই করবার কলমটাকে জলের পটটায় ডুবিয়ে পেনর‍্যাকে রাখল। এ-অবস্থায় ভারি কর্মচারী অর্থাৎ অফিসার যেমন করে থাকে তেমনভাবে

নিঃশব্দে হাসল।

একজন বলল, তা খবরের কাগজে মশাই যা দেখছি।—খবরের কাগজ কেন, আমাদের পাড়ার গলির মুখেই তো এক জলজ্যান্ত যুবককে রক্তে ভিজে পড়ে থাকতে দেখলাম। কি আশ্চর্য তখনও সে ড্যাব্‌ড্যাব্‌ করে চাইছে। কেউ এগোচ্ছে না। পুলিশও না।

ঠিক তখন, ঠিক তখনই, নিজের ঘাড়টাকে টাই বাঁধা কলারের মধ্যে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে (এটা অনেকেই জানে রাজীবলোচনের এই ম্যানারিজম গভীর বা ইম্‌পরট্যাণ্ট কিছু বলার সময়ে দেখা দেয়) রাজীবলোচন বলল ঃ এসবই শুরু অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীরূপে যেদিন খুনি আসামীদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো তুলে নিলেন। কেন না এই আশা করা গেল রাজনীতির নামে খুন; সেটাইতো ব্যক্তির বিরুদ্ধে জঘন্যতম অপরাধ, তা করেও তুমি বেকসুর খালাস পেতে পার।

রেওয়াজ মতোই ব্যাপারটা ঘটল। যা-যার অভ্যাস মতো কাজ করল। হেঁহেঁ করে হাসল কেউ, কেউ বলল যা বলেছেন স্যার, একেবারে জুনিআরদের মধ্যে কেউ মুচকে হাসল, কেউ যেন অফিসারের এ-ধরনের আনঅফিসিয়াল কথাবার্তায় লাল হয়ে উঠল। তারপর তারা চলে গেল ইডেনের উদ্দেশ্যে কিংবা সেই ছুতায় বাড়িতে।

রাজীবলোচন খানিকটা চুপ করে বসে রইল। সে তো আর ইডেনে যাবে না। দোয়াতদানের পাশে নেইলক্লিপটা চোখে পড়ল। সেটা তুলে নিয়ে নিজের ডান-হাতের নখ কয়েকটির কোনো কোনোটিকে সে ঘসল। নখগুলো ম্যানিকিউর করাই। এটাকে কি ম্যানারিজম বলা চলে? মুদ্রাদোষ বলা ভালো এই নখ কাটার ব্যাপারটা। রাজীবলোচন উঠল। ক্লজেটে যাওয়ার পাশেই হ্যাট্‌স্ট্যাণ্ড। বড় আয়নাটাও বেশ ঝক্‌ঝকে। সিগারেট ধরাল রাজীবলোচন আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। ডানহাতে সিগারেট, বাঁহাত দিয়ে টাইটাকে ঠিক করে জমানোর ভঙ্গি করল সে। হাসি দেখা দিল তার মুখে। বেশ বলছে এখন রোজ পারে না। মাঝে-মাঝে কিন্তু এমন লাগসই কথা সে যে কোথা থেকে বলে দেয়। যেন পিতার শক্তিটা কখনো কখনো দেখা দেয় এর মধ্যে—স্বনামধন্য জজসাহেবের সঠিক রায় দেন। কি?—না—এইসবই শুরু অজয় মুখোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে খুনি আসামীদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো তুলে নিলেন। ভারি খুশি হলো। রাজীবলোচন নিজের ঘরে গাল ফুলিয়ে ঠোঁট

গোল করে আরসিতে নিজের ছায়ার মুখে নিজের মুখের ধোঁয়া ছেড়ে দিল একটু পাশ ফিরে যেন বা কিছুটা টুইস্ট করে দাঁড়িয়ে। না; বেশ বলেছে সে কথাটা। আর ছোকরারাও তারাই তো আজকাল সব কথায় বক্ বকম্ করে তাদেরই দুএকজনের মুখ লাল হয়ে গিয়েছিল? তাই নয়।

খুশি মেজাজে রাজীবলোচন ক্লজেটের দরজা খুলল। এখন সেও বাড়ি যেতে পারে। খেলার নাম করেই, আবার কি। অবশ্য সে তার আগে মার্কেটটা ঘুরে যাবে। কেন-না কিছু হাতে করে গেলে সবাইত খুশি হয়ে ওঠে। সে কি মাংস কিনবে? মন্দ হয় না। চেম্বারপটের কাছে অনেকটা দেরী করল সে। আর তখন তার মাথায় এলো সেই পিংপ্যান্টি কিনবার এই সুযোগ কিন্তু। এখন তা কিনে অনায়াসে বাড়ি যাওয়া যায়। ছেলে মেয়ে দুটিই এখন স্কুলে। ত্রিশ বছর বয়স হলো এবার তার স্ত্রীর।

চাটুয্যে বলল চেম্বারপট, পিংকপ্যান্টি, ত্রিশ বছর ইত্যাদি সংযুক্ত করছ, মজুমদার; উদ্দেশ্যটা কি মোপাসাঁর সেই পিকনিকের গল্পের শ্লথ উদর ইত্যাদি নিয়ে হাসাহাসি।

মজুমদার একটু চিন্তা করল। এটাকে আমার প্রথমে আধুনিকতা মনে হয়েছিল। বই পড়ার ফল। কারণ ইদানিং বাঙলাদেশে ওটা হয়তো ব্যবহার হয়। পরে আমার মনে হয়েছে নিজের স্ত্রী তো। ওটা হয়তো শোবার ঘরের ইচ্ছা; একটা সুন্দর রঙীন নতুন বাধা। প্রায় প্রৌঢ় হতে চলেছে এমন টাক্‌মাথা রাজীবলোচনের কথাটা বেশ বড়ই শান্তির হেতুস্বরূপ। যাকগে সে কথা, মজুমদার বলল, কফি আনছে দেখছি। তা রাজীবলোচন বাজারে গেল (যাকে সে মার্কেট বলে) এবং আধ-কেজি পোর্ক কিনল এবং পিঙ্কপ্যান্টি কোয়ার্টার ডজন সিল্কের। পোর্ক কেন? এটা নতুন ব্যাপার। এখনও আউট অফ দি অর্ডিনারি বলে এক অর্থে প্রগ্রেসিভ। বাজার থেকে বেরোনোর মুখে হঠাৎ নেমে দাঁড়াল রাজীবলোচন। কি যেন একটা গোলমাল হচ্ছে গলির মুখে। নাঃ মুস্কিল তো এই বলল সে নিজের মনে। কোথাও-না-কোথাও লেগেই আছে। হয়তো কেউ আবার খুন হয়ে গেল। অন্য গলি ধরল রাজীবলোচন কারণ সেই পথে তার মতো অনেকে যেন ছুটছে। কিছু দূর যেতেই ছোটার ভাবটায় কমতি দেখা দিল। রাজীবলোচনও ধীরে হাঁটতে লাগল। হ্যাঁ, সামনেই ট্রাম স্টপেজ। অনেক সময় যেমন হয়; বড় রাস্তায় প্রায় পৌছে রাজীবলোচন আপনাকে বলল, আরে এ দেখো, নার্গিশ যে। বেশ বড় একঝাড় রজনীগন্ধা কিনল সে। ভটচাজ

কফি গিলছিল, এদিকে দিল। বলল, অর্থাৎ পিঙ্ক প্যানটি, পোর্ক নয় শুধু। রজনীগন্ধাও।

মজুন্দার বলল, হ্যাঁ ঠিক তখন অর্থাৎ রজনীগন্ধার পর রাজীবলোচন যখন হাঁটছে তখন সে শিষ দিচ্ছে মনে হলো। এখন হয় কি, যে রীতিমাফিক গান না করে এক স্বর ধরলে তার সে-স্বরে অন্য স্বর মিশে যায়। রাজীবেরও তা হচ্ছে। আধুনিক গানের টানই কিন্তু একটু কান পাতলে অন্য কিছু যেন বোঝা যাচ্ছে। যেন রবীন্দ্রনাথের কিছু, যেন তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা আমার সাধের সাধনা এমন স্বরটা ধরতে চাইছে।

১২৭।২ লাউডেন স্ট্রিটের এমন কারবার যে দোতলার করিডর দিয়ে চলে তিনটে ফ্ল্যাটের যে-কোনোটায় একইসঙ্গে পৌছাতে পার। রাজীবলোচন হঠাৎ যেন নিজেকে অবিষ্কার করল তাঁর বড়দার ফ্ল্যাটের দরজায়।

কে?

রাজীবলোচন অকুতোভয়ে প্রবেশ করল। দেখল তার বড় বউদি টেবিলে বসে কিছু লিখছে। কেনাকাটার ফর্দ ছাড়া আর কি হবে এই দুপুরে। আর যে রকম গিন্নী মানুষ, যদিও চেহারাটা এখনও হালকা। আর তার টেবলের কিছু দূরে বড়দার নতুন সোফার। ধরে নেয়া যায় সে এখন রাইটার্সে যাচ্ছে সাহেবকে আনতে এবং ফেরার পথে বাজার করতে। এখানে কি সোফারকে পরিচিত করব কফি বলতে-বলতে?

চাটুয্যে বলল, তুমি কোনদিকে চলেছ ধরতে পারছি না। যা করার তাড়াতাড়ি কর। আবার নতুন চরিত্র কেন? মজুন্দার বলল, নতুন নয়। গত ছ-মাস থেকে তো লোকটাকে দেখা যাচ্ছে রাইটার্সের সাহেবের ফ্ল্যাটে। কাজের লোক। দেখ এক কথায় পরিচয় সারতে পারি যদি রাগ না কর। সে যেন রবিঠাকুরের গোরা। শুধু পরনে সাহেবি পোশাক, আর কপালে চন্দন টন্দন নেই। তেমনি গায়ের রং। নর্ডিক চোখ নাক, মাথার চুলগুলো লালচে, চোখ কিছু পিঙ্গল। এক কথায় তাকে সুন্দর বলতে পার। আকর্ষণীয় বলতে পার। গায়ে টেরিলিনের হাফসার্ট, পরনে টেরিলিনের আধুনিক প্যাণ্ট।

ভটচাজ বলল, মশায়, রবীন্দ্রনাথের সিপাহীবিদ্রোহের সুযোগ ছিল আইরিশ-সন্তান গোরাকে আনার। মজুন্দার বলল, কোনো সুযোগ নিতে দরকার কি। তবে তাকে দেখে সম্ভাব্যতার কথা ভেবেছি। বয়সের দিক দিয়ে সম্ভব মনে হয়েছে। তখন সেই ৪৩।৪৪ এ-দেশে খাদ্যাভাব ছিল, আমেরিকান

সৈনিকরা ছিল। কোনো বস্তিবাসিনীর কোলে এমন একজনের জন্ম নেয়া সম্ভব ছিল।

চাটুয্যে বলল, অর্থাৎ তুমি তার মধ্যে আমেরিকান সংস্কৃতির ইঙ্গিত করছ?

মজুন্দার বলল, আমি কিন্তু সম্ভাব্যতার কথাই বলেছি মাত্র। আর তা ছাড়া সে সোফার তো বটে। অতদূর যেতেই হবে কেন তার বিষয়ে। আমাদের দেশেও সাদা ধবধবে গায়ের রং হয়। আর তেমন রঙের বলিষ্ঠ পুরুষ হয়তো কোনো কোনো চোখে বিশেষ ভালো লাগতে পারে। ভালো ড্রাইভ করে গাড়ি। সাহেবকে গাড়ি করে রাইটার্সে পৌঁছে দিয়ে ফ্ল্যাটে আসে। মেমসাহেব যদি বেরোন বাইরে নিয়ে যায়। ছেলে-মেয়েরা হাওয়া খেতে চাইলেও তাই। নতুন ফ্ল্যাটের বৈঠকখানায় বসে পত্রিকা পড়ে। তারপর আবার সাহেবকে নিয়ে আসে রাইটার্স থেকে। ওভারটাইমও খাটে। যেমন সন্ধ্যায় যদি সাহেব ক্লাবে যান; কিংবা মেমসাহেব পার্টিতে, অথবা মেমসাহেব ও মেয়েরা সিনেমায়। সে অবশ্য লিভারি পড়ে না। এবং সে যখন গাড়ি নিয়ে আসে তখন কে সাহেব, কে সোফার তা অপরিচিত লোক ধরতে পারে না। বা হাঁতে স্টিয়ারিং করে। এটা একটা মুদ্রা দোষ সব সময়ে ডান হাত পকেটে আছে।

ফর্দ নিয়ে সোফার চলে গেল, কফির কাপে চুমুক দিয়ে বলল, মজুন্দার, আর তখন রাজীবলোচন এগিয়ে রজনীগন্ধাকে এগিয়ে ধরল বউদির সামনে। এ কেন? আর এ কেন! ততক্ষণ রাজীবলোচন তার করিডর দিয়ে হাঁটতে শুরু করেছে এ রকম ভঙ্গি যেন সে মাত্র একতলা থেকে উঠছে। এবং নিজের অজ্ঞাতসারে খুব নিচু কিন্তু মোটা গলায়, যেমন যতটা একজন প্রায় প্রৌঢ়ের পক্ষে সম্ভব, গাইছে, কেহ বুঝিবে না, কেহ জানিবে না গভীরো প্রণয়ো।

সে রাতে ডিনারটার কেন্দ্র-কোর্স ছিল পোর্ক। ছেলে মেয়েকে নিয়ে খেতে বলেছে রাজীব। খুব খুসি লাগছে তার। বেশ দেখায় না তার ছেলেমেয়ে দুটিকে। স্কুলের পড়ার খবর, খেলাধুলারখবর ইত্যাদি নেয়ার পর খবরের কাগজের ও রেডিওর খবরের কথা উঠল। আর তখন বলল রাজীবলোচন, আজ ভারি মজা হয়েছে। এটা একটা ইন্টেলেক্চুয়াল ব্যাপার। এই বলে সে অফিসের সেই পরিবেশটাকে বর্ণনা করে বলল, কেমন কথাটা ঠিক নয়—সেই প্রথম বুঝিয়ে দেয়া হলো না—রাজনীতির নামে মানুষ খুন করলে মামলা করে শাস্তি দেওয়া দূরের কথা মামলা না করলেও চলে। ছেলে আর মেয়ে কথা শুনে অবাক।

রাজীবগৃহিণী অবশ্য তার স্বামীকে লক্ষ্য করছিল। এবং সেই স্বামী যখন টাই বাঁধা কলার তখন না থাকলেও তবু কলারের মধ্যে ঘাড়টাকে ঘুরিয়ে নিল কথাটা বলে. সে ভাবল বেশ দেখায় কিন্তু টাক্ থাকলেও, বেশ সক্ষম অভিজ্ঞ, পুরুষ। সুন্দর, সুন্দর ! সে অবশ্য বুঝতে পারল না এই সুন্দর কথাটাকে তার মনে যে অস্পষ্ট একটা রং আর কারুকার্যময় আবেগ ধরে দিচ্ছে তা পিঙ্ক প্যান্টির। তার গালটা বরং লাল হলো। সে বলল, কেমন আজ পোর্কটা ভালো হয় নি ? দেখো তোমাদের বাবা তোমাদের জন্য কত ভাবেন। অতঃপর ছেলে এবং মেয়ের কি দরকার। কি এখনও কেনা যায়, কি মাস কাবারে কিনতে হবে এসবের সুখকর আলোচনার মধ্যে ডিনারটা শেষ হলো।

শোবার ঘরে রাজীবগৃহিণী আয়নার সামনে চুল ব্রাশ করছে। না সে চুল বাঁধবে না। কিছু বুকে লুটিয়ে দেবে, কিছু থাকবে পিঠে। বিছানায় শুয়ে রাজীব-লোচন সিগারেট টানছে। রাজীবগৃহিণী উজ্জ্বল আলো নিবিয়ে রাতের আলো জ্বালল আর সঙ্গে সঙ্গে শাড়ি শায়া থেকে বেরিয়ে এল। সেই পিঙ্কপ্যান্টির একটি বটে যা রাজীব আজ কিনে এনেছে। আয়নাটার কাছে সোফা। সিগারেট সমেত রাজীব সেখানে গিয়ে বসল।

রাজীব বলল, কতদিন বলি সিগারেট খাও।

—নঃ

রাজীব বলল, কি সুন্দর দেখাচ্ছে এখন।

—যাও।

রাজীব বুকের উপর থেকে একগোছা চুল তুলে নিয়ে নিজের গালের উপরে চেপে ধরল।

রাজীবগৃহিণী বলল, একটা কথা কিন্তু ভাবছি।

—কি ? পিল খাও নি ?

—না। ভাবছি কথাটা ঠিকই। তবে তোমার ছেলেমেয়ে তো। আর তোমার মুখেরই কথা। ওটাকে ওরা ফলাও করে বলে না বেড়ায়।

—কোন কথাটা ? পোর্ক খাওয়ার ?

—না অজয় মুখুয্যের।

—তাতে কি হবে ?

—শত্রু তৈরি হয় না।

রাজীবলোচন পিঙ্কপ্যান্টির ফাস্‌নারে হাত রাখল—কি যে বলো।

পরে যখন রাজীব শয্যায়, রাজীবগৃহিণী গায়ে শাড়ি জড়িয়ে আধশোয়া অবস্থায়, রাজীব জিজ্ঞাসা করল গৃহিণীর দিকে চেয়ে (সে লক্ষ্য করল গৃহিণীকে ক্লান্তই দেখাচ্ছে বটে) কেমন কথাটা ঠিক বলিনি ?

—নিশ্চয় ঠিক বলেছ। পুরুষকে তো অমন করেই বলতে হয়।

—কেমন, তা হলে পুরুষ বলে মনে হয়তো আমাকে ?

—যাও।

মজুন্দার ও চাটুয্যে সিগারেট ধরাল।

দু একটা টান দিয়ে মজুন্দার বলল আবার, দেখো আমরা অনেক কথা তৈরি করে, তার কোনটা কাজে লাগাই, কোনটা অকেজো হয়ে পড়ে থাকতে থাকতে এক সময়ে হারিয়ে যায়। এর কারণ বোধহয় এক রকমের প্রাচুর্য। কিন্তু দেখা গিয়েছে কথা তৈরি করার মধ্যে একটা মোহ থাকে যার ফলে যারা রাজীবলোচনের মতো দু একবারই তা তৈরি করে তারা সহজে তা ভুলতে পারে না। ব্যাপারটা তো বুধবারে হয়েছিল প্রথম আবার শনিবারে তা নিয়ে আলোচনা হলো।

রাজীবের সামনে তখন সেক্‌শনের বড়ো বাবু একজন যুবক ক্লার্ক। সই করার কাজ শেষ করে দিয়ে দুখানা ফাইল পরে দেখব বলে কাছে রেখে রাজীব দুখানা হাত টেবলে রেখে গল্প করার ভঙ্গি নিল। বলল, কেমন সেদিন যে কথাটা হচ্ছিল। আজও কাগজে দেখছেন তো একজন ব্যবসায়ী, একজন পুলিশ এবং তিনজন ছাত্রের মৃতদেহ এই কলকেতা সহরেই পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। কেমন এসবের মূলেই কি খুনিদের বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়া নয় ?

বড়োবাবু বললেন, তা সার, আপনি যা বলেছেন।

রাজীবলোচন অভ্যাসমতো যুবক কেরানিটির দিকে চাইল। এটা সাহেবদের একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় সকলের কাছেই সমর্থন পাওয়া। কিন্তু যুবকটি মাথা পর্যন্ত নাড়ল না, এমনকি অর্থহীন ভাবেও হাসল না। বরং টেবল থেকে ফাইল কয়েকটি নিয়ে চলে গেল। আর তার চেহারা ভালো বলেই যেন মনে হলো, তার মুখটা লাল হয়ে উঠেছিল।

চাটুয্যে জিজ্ঞাসা করল, তার মানে ? এ কেরানিটির কি এ রকম মন্তব্যে আপত্তি ছিল। মুখ লাল হয়ে ওঠা সহজ কথা নয়।

মজুন্দার হেসে বলল, এই তো বিপদ। এখনও গল্পওয়ালাকে তুমি সব-জান্তা মনে করো। এমন তো হতে পারে কিছুক্ষণ আগেই ফাইল দেখার সময়ে

কেরানিটি অপটুতার জন্য তিরস্কৃত হয়েছিল।

ভটচায বলল, এমন কি সে হয়তো কোনো কারণে অসুস্থ বোধ করছিল। কিন্তু আমরা যেহেতু সবজান্তা নই সে ছেলেটি যে সেই দলেরই একজন নয় যাদের রাজীবলোচন খুনি বলছে—তা বলা যাচ্ছে না।

মজুন্দার বলল, সেই যাই হোক, এটা একটা বে-আদবি বটে সাহেবদের কথা বলার সময়ে না-হেসে কিংবা মাথা না-নুইয়ে তেমন মুখ লাল করে থাকা। ফলে রাজীবলোচন যখন বাড়ি যেতে তৈরি হচ্ছে তখনও তার এই কেরানিটিকে মনে থাকল।

বুধবার থেকে শনিবার অনেকটা সময় কথাটা তৈরি হয়েছে বলেই তার জন্য এতটা সময় দেয়া গেল। রাজীবলোচনের মনেও কথাটার নতুনের নেশা কেটে যাবে মনে হলো। সে বরং পুজোয় এবার বাইরে যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে নতুন কথা তুলল সে-রাতে ডিনারে বসে। কিন্তু দুদিন বাদে সে যখন বাসায় ফিরছে দেখতে পেলো ১২৭।২ লাউডেন স্ট্রিটের সব কয়েকটি ছেলে-মেয়ে সেকালের সেই হল ঘরে জমা হয়েছে। কাকা হিসাবে তার একটা মৃদু জনপ্রিয়তা আছে। নিজের ছেলেমেয়ে দুটিও তাকে ভালোবাসে। রাজীব সুতরাং বলল, কি ব্যাপার? মিটিং, না কনফারেন্স। মেজভাই-এর ছেলে টুবলু বলল—কলেজ ছুটি হলো আজ।

রাজীব বলল, সে তো রোজই হয়।

না না কাকা, বড়ভাই এর ছেলে বাবু বলল, এটা বিশেষ। ফার্স্ট ইয়ারের একটা ছাত্র কলেজ কম্পাউণ্ডে প্রফেসরদের কমনরুমের সামনেই খুন হলো কিনা?

তুই দেখলি?

খুনটা দেখিনি লাশটা দেখেছি। আর তাকে যখন ক্লাস থেকে চার পাঁচজন মিলে টেনে বাড় করছিলো, আর সে যখন বেঞ্চ, দরজা এসব চেপে ধরে বাঁচাও বাঁচাও করছিল তখন কাছাকাছি ছিলাম।

এ সংবাদ শুনবার পর? কিছু বলা কিছু করার একটা তাগাদা আসে না ভিতরে? রাজীবলোচন বলতে পারল,—আমি, মানে, সকলের সামনে।

তখনই কথাটা আবার উঠল। ওদেরই একজন জিজ্ঞাসা করল, কাকা তুমি নাকি বলেছ এসবের জন্যই পলেটিক্যাল সুবিধাবাদের জন্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া দায়ী।

সে কি, সে আবার কবে বললুম?

মানে অজয়বাবু যে খুনীদের ছেড়ে দিলেন—

রাজীবলোচন হেসে উঠল, যা, যা, খেলতে যা। না হয় সিনেমায় দেখ কি ভালো বই আছে।

মেজভাই-এর ছেলে শঙ্কর, সেইসব চেয়ে ছোট, বলল, তুমি খবর রাখ না কাকা; আমরা স্কুল থেকে এসে আর বাইরে যাই না।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে-উঠতে রাজীবলোচনের অবাক লাগল সে যা বলেছে তার অর্থ কি এরকমই হয় নাকি? আর এ-অর্থটা কি এরাই আলোচনা করে বার করেছে। বেশ চালাক চতুর হয়েই বাড়ছে দেখি।

কিন্তু এরই একটা অন্যদিক ছিল। ভাইয়ে-ভাইয়ে, বিশেষ করে বলতে মেজ আর ছোটতে বই বিনিময় হয়। এটা প্রায় চার-পাঁচ বছর চালু আছে। মেজভাই কেনে আয়ান ফ্লেমিং আর ছোট রাজীবলোচন স্ট্যানলি গার্ডনার। এ-নিয়ে তর্কও হয়। সেদিন বেশ তর্ক জমে উঠল। মেজভাই বলল—মতটা কার তা বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ব্যাপারটা ফ্রয়েডীয়। বিশেষ কারুকার্য করা পিস্তল ব্যবহার করছে সেই খুনীটি আর তাতে ধরে নেয়া হচ্ছে আসলে লোকটা সেকেলের দিকে দুর্বল। রাজীব বলল, তুমি কি বলতে চাও এত যে পাইপগান্ আর পিস্তল এ-সবেই ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা হয়? মানে পৌরুষ নয়; ওটার অভাব। মেজভাই-এর বউ এসে পড়ায় আলোচনা বন্ধ হলো। কিন্তু একটু পরেই মেজভাই বলল, তোমার কিন্তু তেমন সব বলা ভালো হচ্ছে না, হে রাজু। কি সব? রাজীব বেশ খানিকটা অবাকই। ওই যে অজয় মুখুয্যে। ও! রাজীব আরও অবাক। তুমি আবার তা শুনলে কোথায়। মেজভাই-এর অভ্যাসই অর্থহীন হাসির আড়ালে চুপ করে যাওয়া। বলল সে—দেখ এটায় আয়ান ফ্লেমিং সম্বন্ধে তোমার মত বদলায় কি না।

বই নিয়ে নিজের ফ্ল্যাটের দিকে ফিরতে-ফিরতে রাজীবলোচন অবাক হয়ে ভাবল—মেজদার অফিস আর তার অফিস প্রায় পাশাপাশি, আর তা ছাড়া দুটোর ডাইরেক্টর বোর্ডে কিছু কমন ফ্যাক্টর আছে। তাতেই কি মেজদার কানে পৌঁছেছে। রাজীব আপন মনে হাসল—মন্দ নয় তো!

কিন্তু বড়দার ব্যাপারটা অন্যরকম। দিন আট-দশ পরে—এক বিকেলে বাড়িতে ফিরেই রাজীব জানতে পারল বড়দার ফ্ল্যাটে চায়ের নিমন্ত্রণ। রাজীব গিয়ে দেখল বড়ভাই তার অপেক্ষা করছে চায়ের টেবিলে। বড়বৌদি নিজেই খাবার দিতে সুরু করল। আর কেমন সুন্দর লাগছে না তাকে। অর্থাৎ এ

ফ্ল্যাটে অনেক মূল্যবান জিনিসের মধ্যে এখনও কিন্তু বউদির হাসি-হাসি মুখই সব চাইতে মূল্যবান মনে হয়। আরে বাপস এত কি বলে সুরু করল রাজীব। আর নীল ভয়েল পড়া বউদিকে দেখে মনে-মনে সে এক মুহূর্তের অর্ধেকটা চেখে নিল—কি সেই কান্না বিয়ের কয়েকদিন পরে।

বড়ভাই চিরদিনই কাজের লোক এবং চট করে কাজের কথায় আসার ন্যাক্ আছে। বলল সে। দেখ ওসব বলে কোনো লাভ হয় না রাজীব। তোমার আলোচনায় তো রাজনীতির পরিবর্তন হয় না। কে যে কি করে তা আমরা কেউ জানি না। হয়ে যায় হঠাৎ একটা এই দেখি। তুমি সরকারী কর্মচারী নও। আমি কিন্তু—তা তো জানই। আর লোকে জানে আমরা ভাই। একজন থেকে অন্যের বিপদ। উপরন্তু সরকারী কর্মচারী হিসাবে আমাদের এসব ব্যাপারে নিউট্রাল থাকা উচিত। কে কবে মন্ত্রী হবে তা বলা যায়? মন্ত্রী হলেই চাকরী যাবে তা নয়—হুঁ, সে বড় কঠিন ব্যাপার। এবং অন্যদিকে যেই মন্ত্রী হও সেই আমাদেরই দরকার হবে। কিন্তু আর কিছু না হোক মফস্বলে তো একটা বদলির ফেরে ফেলতে পারে। অন্যদিকে তোমার অফিসও দেখ। তোমার ডাইরেক্টর বোর্ডের যেকোনো একজনের সঙ্গে কথা বলে দেখ। তারাও নিউট্রাল। কোনো ঝুট্-ঝামেলায় কেউ যায়? তারা বেশ জানে যতদিন কাজ চলবে, চলবে। বেশি মাতন সুরু করে তো ধীরে-ধীরে কোম্পানিকে বাঙলা-দেশে অচল করে সুরাটে চলে যাবে। সে যে কি ডুব-সাঁতার। বল এ-অবস্থায় কি এমন সব মতামত দেয়া ভালো।

রাজীব ভাবল এযে দেখছি ভারি মজা। কথাটা চাউর হয়ে গিয়েছে দেখছি। কিন্তু সে লক্ষ্য করল এমনকি বউদিও তার দিকে লক্ষ্য রাখছে জবাব কি দেয় শুনতে।

হেসে রাজীব বলল, আমি আবার কবে কি বললুম? তবে কথাটা কি মিথ্যে? ছেলেমেয়েরাও বোঝে মামলা-টামলা তুলে নেয়া রাজনৈতিক সুবিধাবাদ।

বড়ভাই-এর প্রায় এক তরফা আলাপের মধ্যে চা শেষ হয়েছিল। সেই বলল আবার হেসে—চুরুট নাও রাজু, ও তুমিও খাও আমিও এবং দুজনেই জানি। সেকালের কায়দাগুলো বাদ দেওয়া ভালো। হাঁ, আমি অনেকদিন থেকেই ভাবছি। জান তো বিলেতে বাপ-ছেলে একসঙ্গে খায়। আজ থেকেই এসো। আমরা সেকালের এক সেকেলিমি বাদ দিই। তা হলে তুমি নিশ্চয়

কনভেনসড্। আর তা ছাড়া নরম্যালসি কি করে আনবে যদি আমরা নিজেদের নরম্যাল চালচলন বন্ধ করি। তুমি কি লক্ষ্য করেছ আমি নিজে যে কোনো সময়ে রাইটার্সে যাই-আসি। আমি তোমার ভাইঝিকেও তার বন্ধুদের বাড়ি যেতে উৎসাহ দিই যেমন আগে যেত। এই তো কাল সে ফিরল বালিগঞ্জ থেকে তখন সন্ধ্যা সাতটা তো বটেই। তোমার বউদি তাঁর সোস্যাল বাজার-টাজার আগে যেমন যেতেন এখনও তেমন যাচ্ছেন। এমনকি এখন যদি, এই গরম পড়ছে, নাইট শোতে সিনেমা দেখে আসেন তাতেই বা ক্ষতি কি? তুমি ভেবে দেখ।

সেদিন চায়ের আসর থেকে ফিরতে-ফিরতে ভাবল রাজীব, আচ্ছা চাউর হয়েছে তো কথাটা। নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকতে-ঢুকতে তার মনে পড়ল হঠাৎ—কেন মনে এলো তা সে বুঝল না। দাদার নতুন সোফারটা যেন পালোয়ানই।

এই পর্যন্ত বলে মজুন্দার বলল—এবার চাটুয্যে একটা কাকতালীয় ব্যাপার বলতে হবে। একেবারে কয়েনসিডেন্স ছাড়া কিছু না।

তা তুমি বল, গল্পটা আর থামিও না।

মজুন্দার বলল, ১২৭।২ থেকে প্রায় একশ গজ হেঁটে গেলে একটা নিরিবিলি ট্রাম স্টপেজ। সেখানে ট্রামে ওঠে রাজীব। সেদিন অফিসে যেতে সেদিকে এগোতে ভাবছিল সে বোধহয় ওটা আর দেরি করা উচিত হয় না। হাঁ ডাক্তারকে দিয়ে ব্লাডপ্রেসার মাপিয়ে না নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত সহজভাবে। কথাটা কাল রাত্রিতে শোবার ঘরে হয়েছেঃ পিল খেলে ব্লাডপ্রেশার বাড়তে পারে কিনা বিপজ্জনকভাবে। ট্রামস্টপেজের একেবারে কাছে এসে রাজীবের মন যেন আধ মুহূর্তের জন্য ফাঁকা হয়ে গেল, কিংবা কথা বন্ধ হলো মনের এবং সেখানে সাদা ধবধবে লেস বসানো একটা প্যান্টি ফুটে উঠল। ট্রামস্টপে দুজন মাত্র মাঝবয়সী লোক, স্যুট পরা। এই প্যান্টি নিশ্চয় গৃহিণী নিজে কিনেছে। কৌতূহলের ব্যাপার নয়। এসব ব্যাপারে তা হলে দেখ গৃহিণী তাকে কিছু গোপন করতে পারে। ট্রামস্টপে দাঁড়াল রাজীব আর ঠিক তখন শুনতে পেল লোক দুটি বলছে অজয় মুখুয্যে মুখ্যমন্ত্রীরূপে—। কি জন্য, কেন, তা বুঝতে না পারলেও রাজীবলোচন জ্যা-মুক্ত তীরের মতো ছুটতে সুরু করল। আর পিছনে সেই দুই ভদ্রলোক যেন ঠা ঠা করে হেসে উঠল।

অফিসে পৌঁছে, তখনও সে হাঁপাচ্ছে, সে স্থির করল এটা একটা কাক-

তালীয় ব্যাপার। অজয় মুখুয্যে তো গোটা দেশটারই মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিল। অন্য অনেকেরই তার সম্বন্ধে আলোচনার আছে। নতুবা কে ছড়াবে এমনভাবে কবে সে কি বলেছে? সেই কেরানিটা যে কথা বললেও মুখ গোমড়া করে থাকে।

সেদিন সে ট্যাক্সিতে বাসায় ফিরল।

রাত্রিতে ডিনারে বসে স্ত্রীকে বলল আমি ভাবছি এখন থেকে ট্যাক্সিতে অফিস যাওয়া আসা করব।

মন্দ কি যদি কর। কিন্তু রোজ যে পরিচিত ট্যাক্সি পাবে তার বিশ্বাস কি। এখন হলো কি—এই "পরিচিত" শব্দটা শুনে রাজীবলোচনের গা শির শির করে উঠল।

তার ছেলে বলল, আসলে তোমার গাড়ি কেনা দরকার একটা।

মেয়ে বলল, সেটাই সুবিধা। তাতে আমাদের স্কুলে যাওয়ারও সুবিধা হবে।

ছেলে বলল, একটা সমস্যা আছে কিন্তু, সোফার কিন্তু তেমন রাখতে হবে যেমন জ্যেঠামশাই রেখেছেন।

সে কি রকম, হেসে জিজ্ঞাসা করল রাজীব। দেখতে সুন্দর?

শুধু কি তাই? ছেলে বলল। জান ও দুহাতেই পারে, তবে ডান হাতে ভালো। সেজন্যই বাঁ হাতে স্টিয়ারিং করে, ডান হাতে—।

চাটুয্যে বলল দেখা যাচ্ছে রাজীবের ছেলেমেয়েরাও বুঝতে পেরেছে এখন আর ট্যাক্‌সি সব সময় নিরাপদ নয়। অথবা নিরাপত্তার জন্য এখন চিন্তা করতে হয়।

তাই স্বাভাবিক নয়। তারা কি খবরের কাগজ পড়ে না? মজুন্দার বলল, অল্প-বিস্তর তোমার আমার সকলের মনে কথাটা কোনো-কোনোভাবে আছে —নিরাপত্তার অভাব।

সেদিন রাত্রিতে শোবার ঘরে রাজীবগৃহিণী বলল, এর মধ্যে কিন্তু একটা কথা আছে।

কি? কিসের মধ্যে?

গাড়ি কেনা এবং সোফার রাখা। দাদার সোফার যত হোক সোফার তো বটে। আমার শ্বশুরের সোফার নিচতলার ঘর পর্যন্ত বড়জোর আসত। এতটা প্রশ্রয় দেওয়া কি ভালো বড় গিন্নি যা দিচ্ছেন। মাইনা ওভারটাইম সব দরাজ হাতে দাও, কিন্তু তাই বলে সে কি ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে বসে গল্প করবে? বড়গিন্নি নিজের হাতে তাকে চা করে দেন। সেদিন আমার মনে

হলো বড়গিন্নির সামনে সিগারেট টানে। রাজীবের মনে হলো এটা একটা দুর্বলতা তার স্ত্রীর, কিংবা বোধহয় সব স্ত্রীলোকেরই যে জায়েদের কাজকর্মের বক্র সমালোচনা করে থাকে। রাজীব বলল—তোমার ছেলেমেয়েরা ওকে পছন্দ করে দেখলুম। ডান হাতে কি বলছিল গো?

সে আর বিশেষ কি? শুনে মনে হয় ডান হাতে। ব্যাপারটা জটিল হয়ে উঠল না। রাজীবের মুখে ছায়া পড়ল। তার আয়নফ্লেমিং-এর চরিত্রগুলোর কথা যেন মনে পড়বে। পিস্তল চালায় না কি? রাজীব বলল, পিস্তল-টিস্তল, কিন্তু দুর্বলতার লক্ষণ হতে পারে পুরুষের?

তার মানে?

ওটা একটা ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা। মানে নিজের শরীরের কোনো ফাংশন সম্বন্ধে সন্দেহ বা অতৃপ্তি। আ-ছি। সোফারের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা কে করে? তুমি ওদিকে তাকাও, পোষাক বদলাব।

সেদিন আবার শনিবার। আজ ট্যাক্সিতে অফিসে এসেছে রাজীব। চেয়ারে বসে তাকে বেশ প্রফুল্ল দেখাল। কি যেন? ও হ্যাঁ। ওটা তা হলে ধরো কয়েনসিডেন্সই। আজ ট্রাম্‌স্টপে সে দুজনকেই দেখা গেছে। এবং তেমন করেই হাসছিল তারা। ফাইল এল দু-এক খানা। দেখে দিয়ে সে নেইল পলিশার নিলো। আজ দিনটা বেশ ভালো নয়? বেশ হালকা লাগছে মন আর শরীর আজই তাহলে ডাক্তারকে ফোন করা যেতে পারে। সে যেন চেম্বারে থাকে। জানা দরকার পিলটা সত্যি হাই ব্লাড্‌প্রেসারের সূচনা করছে কি না। না, আজ সে বেশ মন দিয়ে কাজ করবে। আর ওটা একটা কয়েনসিডেন্সই। বেশ খানিকটা সময় সে মন দিয়ে কাজ করল। তারপর সেক্‌শন সুপারিণ্টেনডেণ্ট এল। সঙ্গে দুজন কেরানি। রাজীব বলল, আজ আবার খেলাটেলা নেই তো?

—না, স্যার।

রাজীব বলল, আচ্ছা সে দিনকার কথাটা।

কোন কথাটা, স্যার?

রাজীব ভাবল, আবার বলবে? সে বলল, সেই যে ইয়ে মানে।

সেই রাজনীতির কথা।

ও সেই অজয়বাবুর কথা যা বলেছিলেন।

রাজীব বলল, তা হলে ভোলেন নি? খুব গুরুত্ব দিচ্ছেন নাকি!

ও আর এমন কি, স্যার। তবে আপনি বলেছিলেন ভালো।

রাজীব হো হো করে হাসল। হেসে সব উড়িয়ে দিল যেন। কেরানিদের দিকে ফিরল, কিংবা মুখ তুলে চাইল, বলল তোমাদের কি মত? দু-একজন বলল, ওতো আকছার। তারপর ওরা চলে গেল কিছু ফাইল রেখে।

কিন্তু সবাই তেমন হাসেনি। সেই কেরানিটিকে আজ টকটকে লাল দেখা গেল। ফাইলে আজ কাজগুলো বেশ ভালো। টেবলের তলে পা একটা মৃদু-মৃদু দুলাচ্ছিল রাজীবের। আধ মুহূর্তের জন্য একটা প্রীতিপ্রদ রঙিন কিছুর আভাস লাগল মনে; হ্যাঁ কোয়ার্টার ডজন কিনেছিল সে। ডাক্তারকে এই ফাইলটা দেখেই ফোন করতে হবে।

কিন্তু হঠাৎ যেন চমকে উঠল রাজীব। পায়ে কি কিছু লাগল? লেগে সরে গেল। লাফ দিয়ে উঠে চেয়ার ঠেলে পিছু হঠে গেল। না টেবলের তলে কিছু দেখা যাচ্ছে না? তারের মতো কিছু যেন, যেন একটা পার্সেলের মতো। ভুল না কি? ভুল তার? বিন্ বিন্ করে ঘাম ছুটছে সারা গায়ে। টাইএর দুপাশে শার্টের বুক ভিজে গিয়েছে। ক্লজেটে গেল সে। অবশেষে শার্ট খুলে, গেঞ্জি খুলে, তোয়ালে দিয়ে সারা গা মুছল। আবার সেগুলো পরে চেম্বারে এল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজেকে যেন ফ্যাকাশে মনে হলো। খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। নিজের প্রতিবিম্বকে যেন বলল তেমন ভয় পাওয়া কি উচিত। আর তা ছাড়া কার কেন মুখ ভার তা তুমি কি করে বন্ধ করো। বেল বাজাল টেবলের। পিওন এসে বলল, সুইপার কে ডাক তো।

সুইপার এল, ঝাঁটা দিয়ে, কাঠি দিয়ে সেক্রেটারিয়েটের নিচের ধুলো, কাগজপত্তর, যা যেমন অনেকদিন ধরে অলক্ষ্যে জমে, সাফ্ করে দিয়ে চলে গেল।

অফিস ফেরৎ কেউ-কেউ আবার খবরের কাগজ পড়ে থাকে। রাজীব কখনও-কখনও তা পড়ত। কিছুক্ষণ আগে রাজীবগৃহিণী বলে গিয়েছে কাগজ পড়ছ। আজকাল সন্ধ্যেটা কাগজেই কাটছে। সেটা কি হাল্কা অভিমানের আধখানা? এটা সত্য হলে দিন সাতেক হলো নিয়মিত অনেকটা সময় ধরে সন্ধ্যাতেও কাগজ পড়ছে নাকি রাজীবলোচন। স্ত্রী চলে গেলে প্রায় অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে সে নিজের চিবুক ধরে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইল। এটা কি এক রকমের ভালো লাগা?

কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তার ছেলে ও মেয়ে হৈ হৈ করে সে-ঘরে ঢুকল।

বোঝা যায় তখনই তারা বাড়ির বাইরে থেকে আসছে। মেয়েই আগুরে। সে বলল, একি বাবা, তুমি অন্ধকারে, এমন করে বসে ?

সে কিছু নয়। তোরা এতক্ষণ কোথায় ছিলি। আমি জানতুম তোরা পড়ার ঘরে।

পার্কে। মেয়ে হাসল বেণী দুলিয়ে।

সে কি ? এখন বাইরে সন্ধ্যা নয় ?

তাতে কি হয়েছে টুক্‌সাডো ছিল।

সে কে ? সে কি ?

বড়জ্যেঠামশায়ের সোফার। আমরা কিন্তু দাদা বলি।

দাদা ?

জান, বাবা, বিকুদার বাঁ-হাতে কনুইএর থেকে কব্জি পর্যন্ত প্রায় একটা দাগ আছে। মনে হয় এখনই ঘা শুকাল মাত্র।

সে কি সোফারই বিকুদা নাকি ? কি বলছিস।

বড়দি বলছিল ঠিক কাউ বয়দের মতো। বড়দি কিন্তু পার্কে যায়নি।

এখন বেড়াতে যাবে। এখন সব নর্ম্যাল হওয়া উচিত তাই নয়।

এই সময়ে রাজীবগৃহিণী এসে পড়েছিল। সে বলল, হয়েছে, হয়েছে তোরা এখন পোশাক বদলে পড়তে যা।

ছেলেমেয়ে চলে গেলে গৃহিণী বলল, মাথা ধরেছে ?

না।

না, আবার কি। মুখ দেখলে বুঝি না।

বসো।

গৃহিণী রাজীবের সোফাতেই বসে বলল, তা ভয়-ভয় করলেও আজই তো কতদিন পরে ওরা আবার পার্কে যেতে পারল বিকাশের জন্য।

আমি ভাবছি।

কি ভাবছ।

না, তেমন কিছু নয়।

কিন্তু একটা কথা কি জান, ছেলেমেয়েদের দাদা হয়ে বসা আমার ভালো লাগে না।

কোনো-কোনো রাতে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ঘুম না হতে পারে। পাঁচ সাতদিন পরে এক রাতে রাজীব তার শোবার ঘরের লাগোয়া ঝুল বারান্দায়

গিয়ে দাঁড়াল। সেখানে শোবার ঘরের মৃদু আলোর চাইতেও আলো কম। নিচে মাঝরাতের লাউডেন স্ট্রিট্। কোথায় রাত একটা বাজল। বা বেশ গাড়িটাতো। আর এদিকেই থামল। কারা যেন নামল। তারা চলে গেলে, কিছু পরে গাড়িটার আলো নিবল। রাজীব আবার শোবার ঘরে এল।

পরদিন অফিস্ যাওয়ার মুখে রাজীব বলল, এটা তো তখন ঠাহর করি নি। এখন মনে হচ্ছে বউদিই বোধহয় কাল রাতে ফিরলেন তখন। এখন ভাবতে গিয়ে মনে হচ্ছে। দেখো কি অদ্ভুত সাহস ওঁর। বোধহয় কোনো মহিলা সংগঠনের কাজ।

চাটুয্যে বলল, এটা কেমন হলো, মজুন্দার। নিজেদের গেটে গাড়ি থামল ১২৭।২ এই নিশ্চয়। তা তখন কেন চিনতে পারল না। মজুন্দার বলল, নিশ্চয়ই ছদ্মবেশ নয়। হয়ত রাজীব তখন অন্যমনস্ক ছিল।

বেশ, বলো তারপর।

মজুন্দার বলল, এ-রকম করে কিন্তু দিন চলে যাচ্ছিল। রোজনামচার মতো তো চলা যায় না তা হলেও আর একটা ঘটনা শোন। একদিন সেদিন শুক্রবার হবে। মেয়ে এসে বলল রেডিও শুনবে না বাবা আজ। শুক্রবারেই এই সময়টা রাজীবের বিশেষ প্রিয় একটা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। রাজীব হেসে বলল, রোজ কি ভালো লাগে। তার চাইতে তোরা কাছে আয় গল্প করি। গল্পের নামে ছেলেমেয়েরা কাছে আসবেই।

রাজীব বলল, আজ তোমাদের আমি কতগুলো মজার খবর দেব। তোমরা কি জান আমাদের কোথায় কি আছে? মনে কর আমার লাইফ-ইনসিওরের কথা। কাগজপত্র সব আমার হলদে চামড়ার পোর্টফোলেওতে সাজিয়ে রাখা দেখতে পাবে। লাইফ-ইনসিওরে ত্রিশ হাজার আছে। বোনাস সমেত ছত্রিশ বলতে পার। তারপরে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড—সেখানে সাতাশ হাজার হয়েছে লাস্ট ব্যালান্স সীটে। এইভাবে কোথায় কোন কোম্পানির শেয়ার কটা আছে, তার বর্তমান বাজার দর কেমন এসব বলতে লাগল রাজীব বেশ গুছিয়ে। এসব কৌতূহলের ব্যাপারও বটে। শুনতে খারাপ লাগে না কেউ যদি বলে। কিন্তু বাদ সাধল তার গৃহিণী। হঠাৎ সে বেশ রেগেই উঠল—এসব কি তোমার গল্প? যা তোরা পড়তে যা। ছেলেমেয়েরা মায়ের রাগ দেখে চলে গেল।

গৃহিণী তখন বলল, তার রাগ তখনো আছে, তুমি আমাদের কি ভাব

বল তো ? বাঙলা উপন্যাস পড়েছ, কলকাতার রকবাজ ছেলেরা এ ওর গল্প শুনে যেমন মেয়েদের কথা লেখে। তুমি কি মনে কর—

রাজীব খুবই বোকা বনে গেল। সে যাকে ব্যাটিং আই লিডস্ তা করা ছাড়া আর কিছু করার পেল না।

গৃহিণী বলল, তুমি শোবার ঘরে যাও। আমি তোমার জন্য একটু সরবৎ করে আনি।

রাজীব উঠল, সিগারেট ধরাল। তার এই চামড়ার কেসটা সুদৃশ্য। বিলেতি বলেই নয়। বিলেতেও উপহার দেওয়ার জন্য তৈরি। সবাই, অর্থাৎ যেই দেখে, প্রশংসা করে।

সিগারেট হাতে আয়নার দিকে হাঁটল। যেন সে মোগল কোনো রইস, এমনভাবে চিবুক ধরল নিজের। বেশ মুঠো করে। আর তখন তার মনে হলো : ওটা কিন্তু একেবারে কয়েনসিডেন্স হতে পারে। মার্কেটের দরজার কাছে সেই ট্রাম স্টপেজের দুজনকে দেখা, এবং তাদের থেকে আর খানিকটা দূরে ফুটপাতের উপরে তার সেই লাল হয়ে ওঠা কেরানিকে।

প্রায় দিন-পনেরো পরে একদিন অফিস যাওয়ার মুখে রাজীব বলল, আচ্ছা, তোমার কি মনে আছে সেবার আমার জন্য একটা ইবি স্টীলের সিগারেট কেস কিনেছিলে।

গৃহিণী বলল, কেমন, সেটা ভালো নয় ? এতদিন পরে মনে পড়ল, মশাই। অমন প্লেন, সিম্পল অথচ কেমন মজবুত। কি আপত্তি ? না, একটু বড় ; পকেটে রাখতে অসুবিধা। দেব ?

গৃহিণী সিগারেট কেসটা বার করল, সিগারেট ভরে দিল। হেসে বলল, এই টাইটাও কিন্তু আমারই পছন্দ করে কেনা। বুক পকেটে রাখলে একটু বেরিয়ে থাকে বটে।

চাটুয্যে হাসল। বলল, মজুন্দার, আমাদের আজকের আড্ডাটা জমল না। তুমি লোকজনের আসাযাওয়া দেখছ আর সেজন্যই অন্যমনস্ক। গল্পটাকে গার্হস্থ্য-বিজ্ঞান করবে নাকি ?

মজুন্দার সত্যি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। যেন সে একটা সিগারেট কেসই দেখছে।

ভটচাজ বলল, একটা সিগারেট ধরান, মজুন্দার মশাই, সেজন্যই সিগারেট কেসের কথা মনে এসেছে।

মজুন্দার বলল, একদিন অফিস থেকে ফিরতে-ফিরতে লাউডেন স্ট্রিটে হাঁটতে-হাঁটতে রাজীবলোচন পুরনো লোহার সব চাইতে বড় ডাম্পাটার কাছে এসে পড়ল। আর থেমেও দাঁড়াল। একটা ছোট পাত সে সেই ডাম্পাটা থেকে কুড়িয়ে নিল। খানিকটা চলে একটা একটু নিরিবিলি জায়গা দেখে ইবি স্টিলের সিগারেট কেসটা খুলল। সিগারেটগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে লোহার টুকরোটাকে সিগারেট কেসে ভরে বুক পকেটে রাখল স্রেটাকে।

চাটুয্যে বলল, এই দেখ, মজুন্দার তুমি ভুলে গিয়েছ রাজীব ট্যাক্সি করে যাতায়াত স্থরু করেছিল।

ভট্চাজ বলল, এটা কোনো মূল্যবান বিষয় নয়। ট্যাকসি যেমন মাঝপথে ধরা যায়, তেমন মাঝপথে ছাড়াও যায়। কিংবা…(একটু ভাবল যেন সে) কিংবা মজুন্দার মশাই এটা কি এমন হতে পারে যে আজকালকার দিনে যেমন প্রমিনেন্ট হওয়ার ভয়ে অনেকে ভালো পোশাক আর পরে না, তেমন ট্যাক্সি ছাড়ার ব্যাপার নাকি?

চাটুয্যে বলল, কিন্তু মজুন্দার, কিছু যেন তুমি বলে নিলে। অর্থাৎ, রসো, ও আচ্ছা। একে কি তুমি বই পড়ার ফল বলবে।

ভটচাজ বলল, কোন্‌টা? মজুন্দার মশাই, আপনি কিন্তু বিষণ্ণ হয়েছেন কিংবা চটে গিয়েছেন মনে হচ্ছে।

মজুন্দার বলল, বইপড়ার ফল নেই? না থাকলে কোনো কোনো লোকে লেখক তার নিজের ইচ্ছামত বই লিখলে আপত্তি করে কেন?

চাটুয্যে বলল, তা নয়। বলছিলুম এটা কি আয়ানফ্লেমিং গার্ডনার, কিংবা সাধারণভাবে ডিটেকটিভ্ উপন্যাস পড়ার ফল বুক পকেটে এই ইবি স্টিলের সিগারেট কেস রাখা মধ্যে লোহার পাতের রেইনফোর্সমেন্ট? কিন্তু সবক্ষেত্রেই কি গুলিটুলি সিগারেট কেসে আটকায়?

মজুন্দার বলল, চান্স নিই না আমরা। ওয়ান ইন থাউজেণ্ড হলেও।

ভটচাজ বলল, আঃ এটা তো আমি ভাবছিলুম না। কিন্তু তাই যদি হয় এ কি অকারণ হচ্ছে না। ভয়টা কি লজিক্যাল হচ্ছে?

মজুন্দার ভাবতে লাগল যেন।

চাটুয্যে বলল, নাও কয়ে ফেল। কিন্তু সব কিছুতেই যেন সেন্সলেসনেসের ভাবটা থেকে যাচ্ছে।

মজুন্দার বলল, একদিন রাজীবের খুব ক্লান্ত বোধ হলো অফিস থেকে ফেরার

সময়ে। তবু মার্কেট তো। পোর্ক কিনল সে আজও। আর বেরনোর মুখে এক গোছা ল্যাভেণ্ডার। হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব অনুভূতি হলো তার, সে যেন পিছনের দিকে হাঁটছে। আর তা যেন ভালো লাগছে। আর তা যেন সময়ের মতো নরম কিছুর উপর দিয়ে, যেন গুতোগাতার ভয় নেই।

১২৭।২ এ ফিরে সে বড় ভাই-এর ফ্ল্যাটের দরজার কড়া নাড়ল।

দরজা খুলল।

কে? বউদি। ধন্যবাদ।

হঠাৎ ধন্যবাদ যে?

এই নীল সিফনের জন্য। এই নাও।

এ কি? এ যে ল্যাভেণ্ডার!

আচ্ছা তোমার কি মনে পড়ে তুমি এক সময়ে ল্যাভেণ্ডার ব্যবহার করতে। সেই কবে, কত পিছিয়ে গিয়ে।

এসো বসবে না?

না। আচ্ছা তোমার মনে পড়ে? ছ-মাস হলো প্রায়, তাই নয়?

কি (বউদি কি চমকে উঠল।)

না, সে কিছু নয়। রাজীব হাসল।

পরদিন, মজুন্দার বলল, ১২৭।২এর এক নম্বর ফ্ল্যাটে রাজীবকে ডাকা হলো।

কেন আবার রাইটার্সের উপদেশ নাকি? চাটুয্যে বলল, তা হলে রিপিট কর না।

না। কথাটা কি করে বলব আমি বুঝতে পারছি না। মজুন্দার যেন চিন্তিত।

সে কি হে, তোমার মত মুখপোড়া লোক।

ঠিক তা তো নয়। কথাটা রাজীবের বউদিও তিনটে শব্দের মধ্যে কোনো দুটিকে দিয়ে প্রকাশ করলে ভালো হয় তা ভাবছিল। থম্‌থম্‌ করছে তার মুখ।

অবশেষে যে বলল, কিংবা চাপা গলায় হাহাকার করল, তুমি ছাড়া আর কেউ আমাকে সাহায্য করবে না। জান তো এ-ব্যাপারে তোমার দাদার সাহায্য নেয়া যায় না। ছ-মাস নয় ঠিক, তাহলে তার কাছেই এগিয়ে যাচ্ছে। তুমি আমাকে সাহায্য কর এই শেষবারের মতো।

ব্যাপারটা তো বুঝিয়ে বলবে।

আমাকে অ্যাবর্শনের ব্যবস্থা করে দাও।

কেঁদে ফেলল মুখে কাপড় দিয়ে রাজীবের বউদি।

চাটুয্যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। ভাষা পেতেই বলল আ ছি মজুন্দার। এই নাকি গল্প।

ভটচাজের কান পর্যন্ত লজ্জায় লাল হয়ে উঠেছে। সে বলল, কিন্তু এ তো সোফারের সঙ্গে মনিবপত্নীর ব্যাপার—যা রকবাজরা কল্পনা করে।

মজুন্দার কথা বলল না। তার চোখ দুটো যেন বেশ লাল হয়ে উঠেছে।

চাটুয্যে বলল, বেশ, এজন্যই বুঝি তুমি লেডি চ্যাটার্লির কথা আগে বলে নিয়েছ। অর্থাৎ বই-এর প্রভাব।

ভটচাজ বলল, রাইটার্সের সাহেবের চাইতে গোরা চেহারার সোফার হয় তো বা দেখতে সুন্দর এবং বলিষ্ঠতর।

মজুন্দার সিগারেট ধরাল। বলল, আমাদের গল্প থেকে ডিটাচড্ হয়ে চিন্তা করলে নানা কৈফিয়ৎ পাওয়া যাবে। আচ্ছা সেই সোফার দেখতে যতই একজন সাদা আমেরিকান হোক, পোষাকে, ম্যানর্সেও তা হতে পারে, কিন্তু বস্তির তো। সংস্কৃতির দিক দিয়ে কি এক দুস্তর ব্যবধান নেই। আর তাকে যদি নিরুপায় হয়ে চা করে খাওয়াতে হয়, সামনে সিগারেট খাওয়ার স্বাধীনতা দিতে হয়, তবে নিরুপায় অবস্থার জন্য মেয়েদের কার উপরে রাগ হবে প্রথম? আমার তো মনে হয় সেই পুরুষের উপরেই যে সবরকম অপমান ও হীনতা থেকে রক্ষা করতে নীতিগতভাবে বাধ্য।

চাটুয্যে বলল, অর্থাৎ এটা পৌরুষের বা সৌন্দর্যের অথবা কম বয়সের আকর্ষণ নয়। নিজেকে মলিন করে কারো উপর শোধ নেয়া? হয়তো বলবে শুরু সেটা। কিন্তু পরে নেশা ধরে যায়, যেমন আঁবসাতের তিক্ততা।

মজুন্দার বলল, যাক সে কথা। উপায় ছিল না রাজীবের এ-ব্যাপারে সাহায্য করা ছাড়া। কারণ তার ভয় হলো সে তবু ভালো ডাক্তার ব্যবস্থা করতে পারবে। বউদি নিজে চেষ্টা করতে গেলে প্রাণ দেবেন আনাড়ির হাতে। সুতরাং সে সাহায্য করতে অগ্রসর হলো। এটা সৌভাগ্যই বলতে হবে বউদিকে নিয়ে সে নিরাপদে দিল্লীভ্রমণ শেষ করে ফিরে এল।

ভটচাজ বলল, গল্প শেষ তো।

মজুন্দার হাসল। বলল, নতুবা ১২৭।২ এর গার্হস্থ্য আলাপে ফিরতে হয়। একদিন রাজীব নিজের ছেলেদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কাটিয়ে তারা পড়তে গেলে বলল স্ত্রীকে—একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছ? আমাদের এই বংশের সকলেরই কিন্তু কানের গড়নে একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যাকে নতি বলে সেটা একটু

লক্ষ্যণীয়ভাবে বড়। তাই নয়।

তা বটে, স্ত্রী. বলল, ওটা ঠিকই, তোমার সদ্যজাতটির কানও লক্ষ্য করে দেখেছি—সকলেরই এবংশের সব ছেলেমেয়ের কান, তোমাদের তিনভাইয়ের কান—

ওটা নাকি আমার ঠাকুর্দার থেকে পাওয়া। তাহলে সদ্যজাতটি দেখলেও এ বংশের বোঝা যায়?

তা হোক। তোমাকে কিছুদিন আরও ছুটি নিতে হবে। মেয়ে আগেই বলেছিল। এখন আমিও দেখছি তোমার চুলগুলো যেন ধাঁ ধাঁ করে পেকে যাচ্ছে।

বাহ্ চল্লিশ হলো না।

রাজীব যথারীতি অফিস করতে লাগল।

একদিন যখন সে লাউডেন স্ট্রিটে ঢুকছে ট্রাম স্টপেজ থেকে কয়েক পা এসেছে ডুম করে একটা শব্দ হলো। সে চম্‌কে উঠল। আবার শব্দ হলো। কিন্তু সেটা সে শুনতে পেল না।

চাটুয্যে বলল, সে কি হে, কি ব্যাপার?

ভটচাজ বলল, এটার লজিক কোথায়?

আপনি আগেও একবার এ প্রশ্ন করেছেন মনে করুন। মজুন্দার বলল।

চাটুয্যে একেবারে গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বলল, এটা যখন বাস্তব ১২৭২ এর কথা বলছ, তখন জেনে নেই, মৃতদেহটা কি রাজীবের?

—বাহ্, রাজীব মরলে আর কার মৃতদেহ হবে সেটা। যাক সে কথা মৃতদেহর পাশ পকেটে ইবি স্টিলের একটা সিগারেট কেস পাওয়া গেল। আর একখানা চিঠি। পুলিশই পড়ল প্রথম।

রাজীব লিখেছে বাপা, পুলিশ, আমার এই দেহের জন্য, পুষ্টি, তৃপ্তি, ইত্যাদি সমেত অনেক কিছু করিয়াছি। তুমি কিন্তু ইহার জন্য চিন্তা করিয়া নিজেকে বিপন্ন করিও না। কেন না, দেখিলাম, সর্বংসহা পৃথিবীও আমাদের বীজ বাহিরে নিক্ষেপ করে।

চিঠিখানা দিল্লী ফেরার পরে লেখা, তার স্ত্রী চোখের জল মুছে বলল।

কিছুদিন থেকে পকেটে পকেটে ছিল, ময়লা হওয়া কাগজ থেকে মনে হয়। পুলিশ বলল।

ভটচাজ বলল, আপনি কি মনে করেন ভ্রষ্টভ্রূণটা হঠাৎ চোখে পড়েছিল রাজীবের? চিনতে পেরেছিল? কিংবা একি শুধু অনেক বয়সে আবার এসেছিল তাই?

চাটুয্যে বলল, সিগারেট কেসটা তো বুক পকেটে থাকার কথা।

মজুন্দার বলল, পাশ পকেটে ছিল। তাই মেলে না চিঠির ভাবের সঙ্গে?

রাজনীতি না কূটনীতি

বাসব সরকার

'রাজনীতি' শব্দটির সঙ্গে পরিচয় নেই, পশ্চিম বাঙলায় এমন মানুষ শতকরা হিসেবে নিশ্চয়ই সংখ্যালঘু। এমন কথা সাহস করে কেউ কবুল করলে, ভারতের অন্য রাজ্যের মানুষরা তো বিশ্বাসই করবেন না, আমরাও তাকে একটি জীব বিশেষ মনে করতে কুণ্ঠিত হব না। বাঙালি জীবনে রাজনীতি শব্দটি প্রায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। রাজনীতির সঙ্গে বাঙালির একটা নাড়ীর টান আছে, এমন ধারণাটাই আমাদের কাছে স্বাভাবিক। কোনো এক মহৎ প্রাণ ভারতীয় নেতার বাঙালির মননশীলতা সম্পর্কে যে উক্তিকে আমরা কয়েক দশক ধরে গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছি প্রশংসাপত্রের মতো, (হালে যা নিতান্তই কষ্ট কল্পনা বলে প্রমাণিত হয়েছে) তাকে আমরা প্রায়শই ব্যবহার করতে চেয়েছি আমাদের রাজনৈতিক পরিপক্কতার ক্ষেত্রে। সুতরাং বাঙালি রাজনীতি করে, রাজনীতি বোঝে, এটা আমাদের কাছে একটা স্বতঃসিদ্ধের মতো।

"রাজনীতি-প্রাণ" বাঙালি কি রাজনৈতিক মানুষ? রাজনৈতিক মানুষ বলতে বোঝায় সমাজ-সচেতন মানুষকে। রাজনৈতিক মানুষ নিয়েই সব দেশের রাজনৈতিক তত্ত্ববিদ্দের চিন্তা-ভাবনা। সমকাল গণতন্ত্রের কাল বলে এ-নিয়ে চিন্তা-ভাবনা আরো বেড়ে গেছে। আমরা অবিশ্যি গণতন্ত্র বলতে একেবারে সার কথা বুঝে গেছি যে, গণতন্ত্র মানে নির্বাচন। ভোট ফর্'এর ব্যাপার। সুতরাং রাজনীতিপ্রাণ বাঙালি মানে হলো ভোটার বাঙালি। সে যাদের জেতায়, তারা তাকে সচেতন মানুষ বলে, গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন বলে, কখনও বা বিপ্লবীও বলে থাকে। যারা হারে তাদের কাছে এই ভোটার স্থূলবুদ্ধি, স্বার্থপর, লোভী ইত্যাদি বলে নিন্দিত হয়। নির্বাচনী রাজনীতিতে দলগত হারজিতের নিরিখে বাঙালি ভোটারের রাজনৈতিক মানুষ হিসেবে মূল্যায়ন হয়ে যায়।

সমাজ-সচেতনতা একটি ইতিবাচক ধারণা। এর মূলকথা হলো চলতি সমাজের কাঠামোর আন্তর দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা।

এই ধারণাকে সম্বল করে সমাজের কাঠামোটাকে বদলে দেওয়ারও উদ্যোগ করা যায় আবার স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্যেও সচেষ্ট থাকা যায়। সমাজ সচেতনতা কোন কাজে লাগানো হচ্ছে, কারা তার উদ্যোক্তা, কতোটা তাদের শক্তি, কোন-কোন শক্তির আনুকূল্য তারা পেয়েছে, এই সবের সমষ্টিগত চেহারার নামই হলো রাজনীতি।

যে-কোনো সমাজই তার প্রচলিত নিয়ম-কানুনের অবস্থার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে, তাদের একটি স্থায়ী রূপ দিতে চায়। সমাজে এদের সম্পর্কে একটা মমত্ববোধই কেবল নয়, একটা অপরিহার্যতার ধারণা গড়ে ওঠে। যেমন দেখা যায় যে, পিছিয়ে পড়ে থাকা সমাজেও, চলতি নিয়ম-কানুনের জন্যে, সাধারণ মানুষের দরদের অভাব নেই। অথচ অপেক্ষাকৃত উন্নত সামাজিক চেতনার কাছে এর বাস্তব অবস্থা, অচল, অসহনীয়, জরুরি পরিবর্তনযোগ্য বলে মনে হয়। নিশ্চয়ই এই দুই দেশের সাধারণ মানুষ আপেক্ষিক বিচারে সমান "সাধারণ" নয়। যেমন বলা যায় যে, সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে একজন সাধারণ ভারতবাসী ও একজন সাধারণ পাকিস্তানবাসীর পার্থক্যের কথা। যে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা অতিক্রম করতে পারার জন্যে আজ বাঙলাদেশে মুক্তি সংগ্রাম চলছে, পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ মানুষের মানসিকতায় সেই সাম্প্রদায়িক চেতনা দীর্ঘদিন অনুপস্থিত। তার মানে কি এই যে একজন সাধারণ পশ্চিমবঙ্গবাসী, একজন সাধারণ বাঙলাদেশবাসীর তুলনায়, বেশিমাত্রায় সমাজ সচেতন ও রাজনৈতিক মানুষ?

সমাজে স্থিতাবস্থার জন্যে দরদ, মানুষের এক স্বাভাবিক মানসিক প্রক্রিয়া। 'চলছে চলবে'র মানসিকতা যেমন পরিবর্তনের দাবির গতিকে নির্দেশিত করতে মুখর, তেমনই স্থিতাবস্থার অনুকূলেও সে নীরবে সক্রিয়। স্থিতাবস্থাও একটা সমাজ-সচেতনতার জন্ম দেয় যা তারই অনুকূলে কাজ করে। পৃথিবীতে কোনো সমাজই শতকরা একশ ভাগ মানুষের নিছক চিন্তাশূন্য, ভাবনাহীন অভ্যাসের, গতানুগতিকতার ফলশ্রুতি নয়। মানুষ যেহেতু যুক্তিবাদী, তাই স্বভাবধর্মেই সে তার কাজের, কথার সপক্ষে যুক্তি খাড়া করে, চূড়ান্ত বিচারে তা সে যতো অসার, অর্থহীনই হোক না কেন। কারণ নিজের কাজের, কথার অসারতা ও অর্থহীনতা বুঝতে পেরেও, তাকে আঁকড়ে থাকার মতো নির্বোধ মানুষ নয়, ছিলও না কোনোদিন। যদি স্বার্থপরতা মানুষের সহজাত বলেই ধরে নেওয়া যায়, তাহলে এটুকু স্বীকার করতে অসুবিধা নেই যে, রুটির মাখন

মাথানো দিকটা চিরদিন পেতে গেলে, তাকে কোথায়-কোথায় কি-কতোটা বদলাতে হবে, সে-ব্যাপারে মানুষ বেহিসাবী নয়।

স্থিতাবস্থা কথাটার মধ্যে একটা কায়েমী স্বার্থের হিসেব আছে। স্থিতাবস্থার পক্ষে যা তাই তাকে আমরা প্রতিক্রিয়ার শরিক বলেই মনে করি। কিন্তু চলতি অবস্থাকে বদলে দেওয়ার জন্যে উদ্যোগ আয়োজনে যতক্ষণ পর্যন্ত না অধিকাংশ মানুষ সমবেত হচ্ছেন, যতক্ষণ তারা পরিবর্তনে অনীহা দেখাচ্ছেন, অনাগ্রহ প্রকাশ করছেন, ততক্ষণ কিন্তু কার্যত স্থিতাবস্থাই বজায় থাকছে। তাহলে সাধারণ মানুষও কি প্রতিক্রিয়ার শরিক? নিশ্চয়ই এমন মূর্খ সিদ্ধান্ত কেউ করবেন না। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতায় এই ধরনের পীড়াদায়ক বৈপরীত্য যে নেই তা নয়। তাহলে এর কারণ কি? সেই কারণ খুঁজতে গেলে আবার রাজনীতির আলোচনায় ফিরে আসতে হয়।

রাজনীতি কথাটির সঙ্গে সাধারণ শিক্ষিত বাঙালির পরিচয় একটা ব্যর্থ প্রত্যাশার নেতিবাচক মানসিকতা থেকে। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমাদের রাজনৈতিকতার যে বাড়-বাড়ন্ত দেখা গেছে তা হলো প্রধানত মধ্যবিত্ত মানুষের আর্থিক স্বাচ্ছল্যলাভের ব্যর্থতাসঞ্জাত। পশ্চিমবাঙলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্ত মানুষের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। তার প্রাণকেন্দ্র শহর কলকাতা। এখানে নানা আন্দোলনের যে জোয়ার জাগে তাই নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে গ্রাম বাঙলায়। শহর কলকাতা থেকে যে জেলার দূরত্ব যতো বেশি এবং যার জীবনে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য যতো কম, সাধারণভাবে সেখানে রাজনৈতিক চাঞ্চল্যও ততো কম।

মধ্যবিত্তরা বাঙালি সমাজের ঐতিহাসিক কারণে সবচেয়ে রাজনৈতিক অংশ। কিন্তু মধ্যবিত্তের রাজনৈতিক চেতনা আবর্তিত হয় তাদের সমস্যাজর্জর জীবনের নানা চাওয়া-পাওয়াকে কেন্দ্র করে। স্বাধীনতার পূর্বকাল থেকেই বাঙালি মধ্যবিত্তের মনে দেশের তদানীন্তন জাতীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে মানসিক প্রতিকূলতা জন্মেছিল। ফলে স্বাধীনতা উত্তরকালে বাঙালি মধ্যবিত্ত মানসিক দিক থেকে যে মুহূর্তে তীব্র হতাশাবোধ করলেন, তাঁদের শাসকদল বিরোধিতাও সেই থেকে তীব্র হয়ে উঠল। সঙ্গেসঙ্গেই যাঁরা শাসকদল বিরোধী, তাঁদের মধ্যবিত্তের অনুকূলে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল, যাতে মধ্যবিত্তের মনে ভরসা জাগল যে তাদের প্রত্যাশার পূরণ হবে বিরোধী দলের কাছে। পশ্চিম-বাঙলায় পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতির

জয় জরকার এর থেকেই স্বরু। বামপন্থী দলগুলো নিজেদের বিবেক দংশন মুক্ত রাখার জন্যে বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, সংগ্রাম, শোষণ প্রভৃতি কথাগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে চলতি হাওয়ার পন্থী হওয়াকেই রাজনৈতিক মোক্ষলাভের পথ বলে ধরে নিলেন। যার পরিণতি হলো বামপন্থী স্ববিধাবাদে।

পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতিরই অপর নাম অর্থনীতিবাদ। যে মধ্যবিত্তের সমর্থন বামপন্থী রাজনীতির পুঁজি, তাকে সর্বহারার রাজনীতি বলে গায়ের জোরে চালানো হয়তো যায়। কিন্তু তার আন্তর দুর্বলতা আরো জঙ্গী কারো কাছ থেকে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে গিয়ে নিজেকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে ফেলে। আমরা ভুলে যাই যে সর্বহারার রাজনীতি যে শ্রেণীচেতনা নির্ভর আজকের রিক্ত, অসহায়, আত্মস্বার্থপরায়ণ মধ্যবিত্তের মধ্যে তার অভাব তীব্র। মধ্যবিত্ত মানুষ সহজ পথে, নিজের পাওনা গণ্ডা আদায় করার জন্যে সব থেকে কম ঝুঁকি নিয়ে, হিসেবী মানসিকতা দেখে আন্দোলন করে। সর্ব হারার শ্রেণীচেতনাসম্ভূত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার মতো বলিষ্ঠ সাহসের অভাব তাদের পদে পদে। এমনকি তর্কের খাতিরে যদি এই মধ্য-বিত্তের রাজনীতির প্রাথমিক ধাপ বলে মেনে নেওয়া যায়, তাহলেও এই প্রশ্ন থেকে যায় যে, সর্বহারার শ্রেণী চেতনায় যা সবচেয়ে ক্ষতিকারক, সেই অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক সংগ্রামের পৃথকীকরণ, তার থেকে এই সর্বহারা শ্রেণীকে কতটা মুক্ত রাখা সম্ভব হয়েছে? মরা মরা বলতে বলতে কোন এক ত্রেতা যুগে দস্যু রত্নাকরের পথে মহর্ষি বাল্মীকিতে রূপান্তর সম্ভব হয়ে থাকলেও, বিংশ শতকের সত্তরের দশকে অর্থনৈতিক দাবি দাওয়ার জন্যে লড়াই করতে করতে আমরা রাজনৈতিক সংগ্রামের স্তরে পৌঁছে যাব, এ-মত নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়।

অনেকেরই মনে হতে পারে '৬৭ সালের পর থেকে যে জাগরণ গ্রাম বাঙলার জীবনকে স্পর্শ করেছে, তার পরেও পশ্চিম বাঙলার রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য বর্তমান বলা অন্যায়। কিন্তু বিভিন্ন দলের সল্পসংখ্যক সচেতন কর্মীদের বাদ দিলে যে বিরাট জনসমর্থন তাঁদের পড়ে থাকে, সেই জনগণ যে কোনো সংগ্রামে সামিল হওয়ার সময়ে কি রাজনৈতিক সংগ্রামের মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হন? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার দিন আজ এসেছে। পশ্চিম বাঙলায় আজ রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য হলো পশ্চিম বাঙলার শাসন ক্ষমতা দখল করা। সেই অর্থে রাজনৈতিক সংগ্রাম সব দলই করতে চায় এবং করে।

কিন্তু পশ্চিম বাঙলার শাসন-ক্ষমতা সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে কার্যকরী শক্তি হিসেবে নগণ্য। কিন্তু এই সাদা সত্যি কথাটা জনগণের সামনে খোলাখুলি বলার চেয়ে আমরা বেছে নিই কৌশলের পথ। ফলে রাজনীতিও তার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কৌশলের নীতি হয়ে যায়। বিপ্লবী রাজনীতির প্রবক্তাদের কাছে প্রশ্ন যে, এটা কি অস্বীকার করা যায় আজকের পশ্চিম বাঙলায় সব স্তরের মানুষ নানা সুযোগ সুবিধা চাইছেন, উপরের স্তরে উঠবার জন্যে দরিদ্র মানুষের লক্ষ্য মধ্যবিত্ত হওয়ায় আর মধ্যবিত্ত চায় স্বাচ্ছল্যময় উচ্চবিত্তের জীবন। এর মধ্যে জঙ্গীভাব থাকতে পারে দাবি আদায়ের জন্যে, কিন্তু বিপ্লবী মানসিকতার ছিটে ফোঁটাও নেই।

পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি যেহেতু সমাজের কাঠমোয় আঘাত না করে, নানা কূটকৌশলে দাবি আদায় করতে চায়, মনে রাখা দরকার দেশের বৃহত্তম দলও সেই একই পথ নিতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজের কাঠামোটাকে অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টায় তার কর্মপদ্ধতিতে, কৌশলের হেরফের হবে না, হওয়া সম্ভব নয় এই মত অবৈজ্ঞানিক। বরং রাষ্ট্র ক্ষমতা হাতে থাকায় এবং দেশের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ সম্পর্কে সজাগ থাকায়, তাদের পক্ষে একাজে উৎসাহী হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি বা অর্থনীতিবাদ মানুষের তাৎক্ষণিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। এই দাবি আদায় হলে তখনকার মতো জঙ্গী কর্মতৎপরতায় ভাঁটা পড়ে। ফলে এর চরিত্রই হলো মরশুমি। বছরে বছরে নির্দিষ্ট সময়ে এর শুরু এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে পৌঁছে বা পৌঁছানো অসম্ভব হলে কিঞ্চিৎ রফা করে এর শেষ। দীর্ঘদিন ধরে এই আন্দোলনের পৌনঃপুনিকতায় আমরা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি। সন্দেহ নেই যে এই আন্দোলনে দলের গণসমর্থন বাড়ে। কিন্তু সেই গণসমর্থনের সার্থকতা তো শুধু নির্বাচনের জন্যে। আমরাও তা জানি এবং নানা কথার ফাঁকে বিপ্লবীসুলভ সজাগ, সতর্কতা হঠাৎ একটু ঝিমিয়ে পড়লে বলেই ফেলি অমুক অমুক জায়গায় আমার দলের শক্তি বেশি, নির্বাচনে জেতার সম্ভাবনা বেশি কারণ ওখানে অমুক অমুক আন্দোলনে আমরা নেতৃত্ব করেছি। অর্থাৎ গণ-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে তার সাফল্যে বিফলতার মাপকাঠিতে দলীয় নির্বাচনী সম্ভাবনা বিচার করাটাই আমাদের রীতি। মানুষের তাৎক্ষণিক স্বার্থের জন্যে যে সংগ্রাম সেটা যে, তার চূড়ান্ত লক্ষ্যকে আড়াল করে দিতে পারে, তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে সমাজ সচেতনতার সঙ্গে যুক্ত না করলে, একথা প্রায়ই বিস্মৃত। অন্ততঃ বাস্তবতার সাক্ষ্য তাই।

যে কোনো সমাজের মৌল পরিবর্তন আনতে যাঁরা উৎসাহী, নাম জপের মতো নিয়ত উচ্চারণ না করলে সেই লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভবনা আছে, একথা বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে অচল। আসলে চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং তা সফল করার জন্যে আশু কর্মসূচির মধ্যে যদি যুক্তিগ্রাহ্য সম্পর্ক থাকে এবং তা যদি জনগণের সামনে খোলাখুলি উপস্থিত করা যায় তাহলে জনগণের আশাভঙ্গের দায় পোহাতে হয় না। সমাজও সেখানে মরীয়া মনোভাব থেকে হঠকারিতার পথ গ্রহণ করতে আগ্রহী হয় না। বিপ্লবী রাজনীতির অর্থ এই নয় যে নিজেকে সাচ্চা বিপ্লবী হিসেবে জাহির করার জন্যে অবাস্তব অর্থহীন কথায় কোনো সত্যকে আড়াল করতে হবে। তাতে রাজনীতি আর রাজনীতি থাকে না তা কৌশলসর্বস্ব কূটনীতি হয়ে দাঁড়ায়। যেহেতু কূটনীতির লক্ষ্যই হলো বাস্তবকে যথাসম্ভব আড়ালে রেখে স্বার্থসিদ্ধি করা, তাই কূটনীতি বিপ্লবী রাজনীতির জায়গা দখল করলে রাজনীতিই আড়ালে পড়ে যায়। অথচ শ্রেণীসচেতন মানুষের রাজনীতিক সক্রিয়তা ছাড়া সমাজের মৌল পরিবর্তন যেহেতু সম্ভব নয়, সেখানে রাজনীতির বদলে কূটনীতির দাপট চলতে থাকলে বিপ্লবীপনা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। কৌশলসর্বস্ব রাজনীতি মধ্যবিত্ত মানুষের পরম আদরের বস্তু। তাতে বুদ্ধির খেলা, চমক, চটকদার জিনিসের মাহাত্ম্য সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু তাতে সমাজ সচেতনতার প্রকাশ নেই। পশ্চিম বাঙলায় চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পর থেকে রাজনীতির নামে সেই কূটনীতির খেলা চলছে অন্তহীনভাবে। এর লক্ষ্য সমাজ নয় দল, আর হাতিয়ার সমাজের সবচেয়ে আত্মসচেতন অংশের সংগঠিত চাপ।

আমরা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

আমরা শুধু চেঁচিয়ে গলা ফাটাই
তোমরা কথা বলবে জনান্তিকে।
মিছিল হয়ে লক্ষ পায়ে হাঁটি,
তোমরা যাতে পাও সে নিভৃতিকে।
যে সাধনায় কুণ্ডলিনী জাগে
অমারাতে আমরা তারই শব।
যাঁরা বুকের আসন পেতেই কাল
ভাবী যুগের ধেয়ায় মহোৎসব।

বাঙলাদেশ আর আমরা ভিয়েৎনাম,
আমরা যেথায় যত বিস্ফোরণ ;
ছিন্নমস্তা এই শতাব্দী শুধু
জাগছে বুকে আরেক উত্তরণ।

ঝলমলানো ইতিহাসের পাতা
একদা যা খুলবে ভাবীকাল,
আমরা তারি বাতিল পাণ্ডুলিপি
কালির ছোপে এবং রক্তে লাল।

১৯৪৭-৭১, অনুজের গান

বিষ্ণু দে

আত্মীয়, এসো দুর্গতদেরও ঘরে
তোমাদের উষা আমাদেরও সন্ধ্যায়।
দুঃসহ জ্বালা শৈশব যৌবন,
আমাদের কাল দুর্বহ অনুখন।
কত দুর্যোগ কত দুর্ভোগ যায়।
বিরাট কালের বিপুল তেপান্তরে
তোমার প্রাণের হাজার ঝুরির বরে
হাতছানি দেখি তোমারই পিপুলছায়ে—
প্রাণ পায় মৃত কৈশোর যৌবন।

মোহিনীর নয়, মানুষেরই নির্মাণ—
মাটির মানুষ, মানুষেরই সম্মান!
একাগ্র চোখে সদাসতর্ক কাজ,
প্রখর হৃদয়, লেনিনের মনপ্রাণ
আকাশস্বচ্ছ করে দিলে যৌবন।

তাই সব শুনি সে নক্ষত্র-গান,
গঙ্গায় পাই ভল্‌গার প্রতিমান!
আমাদের রাত আমাদেরই দিন মানি,
কুহক তো নয়, সহোদর হাতে আনি
তোমাদের হাতে অনুজের যৌবন!

জ্যেষ্ঠ! তোমরা গড়ে দিলে প্রতিভাস,
তাই আমাদের গঙ্গার চরে চরে,
মেঘনার স্রোতে গড়ে তুলি ইতিহাস
উজ্জীবনের দগ্ধ তেপান্তরে।
দস্থ দগ্ধ হোক্ না বর্তমান,
এক নীলাকাশ দুই দেশে করে গান।
মৈত্রীতে বাঁধো আমাদেরও যৌবন॥

পরিক্রমা

বিমলচন্দ্র ঘোষ

জীবন বাঁচেনা মারমুখো বাঙালিত্বে,
হায়রে, ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ বঙ্গসন্তান!
সাম্য অসাড় বাচালের পাণ্ডিত্যে
বিবরে মুখর প্রাদেশিকতার স্তবগান।
লোকায়নী মহাসমাজের ধৃতিশক্তি
স্বরাট ভারতচেতনা সার্বভৌম।
ক্রোধে প্রগতির স্তব্ধ অভিব্যক্তি
বিলুপ্ত প্রেম দীপ্ত সুষম সৌম্য।

কৃপা কৃপণের কলুষ কৃপাণপানি
এনেছে করাল অপঘাত নৈরাজ্য;
বিপ্লবী কবে খুনোখুনি হানাহানি
মেনেছে জগতে? প্রজ্ঞা পরিত্যাজ্য
যদি হয় তবে সে 'যদি' রক্তনদীর
দুকূলে বানাবে জোঁকের ঘুঘুর বাসা,
গণইতিহাস ভ্রান্তিতে মূক বধির
হারাবে ব্যর্থসংগ্রামে গণভাষা।

দ্যাখো এই আমি এলাম

অরুণ মিত্র

তোমরা কখন আমাকে ডেকেছিলে
সময়ের কোন্ চূড়ায় দাঁড়িয়ে?
আমার বুকের ভিতরে
কত বছরের বিদায় বিদায়,
আমি কান পাতলে
আমার দু'পায়ের সেই বিদায় বিদায়,

এক টুকরো জমির উপর
আওয়াজ থেকে স'রে স'রে পশ্চিমে
ক্রমে সন্ধে রাত্তির
ক্রমে হৃৎপিণ্ডের আলাদা স্তব্ধতার কাছে

তোমরা কেউ আমাকে ডেকেছিলে
পূর্বকোণে দাঁড়িয়ে ?
পর্দাটা ভীষণভাবে ন'ড়ে গেল
যেন শব্দকে আর ঠেকাতে পারছে না
আমি ধোঁয়ার লণ্ঠন উঠিয়ে আতিপাতি
আমার হাতের আধগজ আলো
কোনো মুখ পর্যন্ত পৌঁছল না
আবার আমি হলদে পাতার উপর,
কিন্তু আকাশ দপদপ ক'রে উঠল
আমি আর নড়িনি
তবু টের পেলাম এবার ফিরতি টান
পূর্বপশ্চিম আলোয় ভাসল ব'লে
এবং আমার নাম উজান স্রোতে।

দ্যাখো এই আমি এলাম
তোমাদের মেলায়,
এই পাকাচুল মানুষটা
পঁচিশটা শীতের বরফ ঢাকা
গ্রীষ্মের তুষে পুড়তে পুড়তে পুড়তে পুড়তে।
চিনতে পারো ?
রাত্তিরের চোখ দিয়ে আমি তোমাদের মেলাই
সেই কবেকার সকালে,
তোমাদের মুখের ডৌলে বুঝি
প্রথম সবুজের ঘের রয়েছে।
ছোটরা আমাকে ছুঁয়ে দেখুক

কিম্বদন্তী কই এতো রক্তমাংসের মানুষ ;
তোমরা আমাকে ছোঁও
আমি আমার শৈশবের নদীকে পাব,
আমাকে শুইয়ে দেবার মাটি তারই দুই ধারে।

কলিজায় দুটো ঘর

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

সীসে-ঢালা রাশি রাশি মেঘচাপা আকাশে বুক
জীবনের গায়ে লেপা ছাইরঙা দুর্দশা চাদর :
নিচেও কুয়াসা ধোঁয়া, কোনমতে শ্বাস টানে শ্রমিক-কৃষক।

দাঁতে দাঁত ঘসে চাষী হেঁকে বলে—হে মজদুর ভাই
পাশে এসো, হাতে হাত রাখো—বলো আমরা যে মিতে
দারিদ্র্যের কালো রাত দূর-করা আগুন পোহাই।

তুমি নাও কাস্তে আর হাতুড়ি আমার হাতে দাও···
কলিজায় দুটো ঘর, একই রক্ত বিভক্ত শিরায়।

সবাই চালায় হায় সবাই শেখায়···
পৃথক নাকি সে পন্থা, অদ্বিতীয় স্বতন্ত্র টেকনিক।
মালিকরা শয়তান মানি, কিন্তু অই দলপতিদল
কাগজে মিছিলে যারা গর্জে ওঠে—এই পথে হবেই বিপ্লব!

কৌশলী সবাই ব্যস্ত জোটবাঁধা শক্তির চর্চায় :
তুমি আমি জেনেছি কি—পদপল্লব ছোঁয়া কেবা কার গোপন বল্লভ?

আমি যাবো না

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

কে যেন আমাকে বারবার
ঠেলে নিয়ে যেতে চায়
মৃত্যুর মতো শীতল অন্ধকারের দিকে,
আমি যাবো না।

সে কি জানে না
আমি শিশুকাল থেকে
অন্য এক ঘনিষ্ঠ দৃশ্যের উষ্ণতায় লালিত
যেখানে
ভোর হলেই মাথার ওপরে প্রতিদিন
ঝলমল করে রৌদ্র,
আলোয় ক্রমশ ভরে যায় মাঠ
সবুজ পাতায়
শাখা প্রশাখায়
সারি সারি গাছের উন্মুখতা।
নদী
রাতের নক্ষত্রের হাতছানিতে উচ্ছল,
হাওয়া
মাঝ দরিয়ার মাঝির মতো অতন্দ্র,
আর জ্যোৎস্না
রূপসী যুবতীর সৌন্দর্যের মতো নির্মল…

কে আমাকে অন্ধকারের দিকে
ঠেলে দিতে চায়?
আমার ক্লান্ত দুই চোখে
আড়াল থেকে
মড়ার খুলির দুঃস্বপ্ন মাখিয়ে দিতে চায়!

আমি যাবো না॥

ঘুমন্ত পুত্রের শিয়রে দাঁড়িয়ে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাধ হয় তোর
বুকের মধ্যে
ঘুমাই, যেমন
ঘুমাতেন তিনি

কিন্তু এখন
পরমেশ্বর
কারও বুকে মুখ
রাখেন না আর

পুত্র আমার,
আমি অসহায়…

তোমার মৃত্যুর কাছে

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

আমার শৈশব তুমি
তোমার শৈশবে ঢেকেছিলে।
অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত তোমার সে-বালিকাবেলা
মা, আমার দিন-এনে-দিন-খাওয়া
কায়ক্লেশে ভাসমান শৈশবের
নাভিকেন্দ্রে আলো ফেলেছিল।

এমন অনেক গল্প, অনেক সঙ্গীতের কথামালা
যা আমার কানে বলে তৃপ্তি পেয়েছিলে
নিতান্ত মাতৃসুলভ।

মহামূল্য স্বনির্মিত সিন্দুকের জঠরে আমার শৈশব
চাবি দিয়ে রেখেছিলে ; ভেবেছিলে সম্ভবত
শৈশব হারাবে না, হারাতে পারে না, যদি কেউ
ডালা ভেঙে সিন্দুকের সঙ্গোপনে লুণ্ঠন করে অন্যথায়।

বহু ক্ষয়ক্ষতি মেনে নিয়ে এযাবৎ
কপালে রক্তাক্ত ফেট্টি বেঁধেছি এখন
এবং বুঝেছি :
শৈশব হারানোর ক্ষতিতুল্য ক্ষতি কোথা আর !
আমার শৈশব কবে রেখে গেছ সিন্দুকের জঠরে তোমার।

মা, তোমার মৃত্যুর কাছে সিন্দুকের চাবি পড়ে আছে।

বিকেলবেলা

শঙ্খ ঘোষ

সারা দিনের পর অবসন্ন হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি আজ বিকেলবেলা
আর স্বপ্ন দেখেছি যে-স্বপ্ন দেখার কোনো কথা ছিল না আমার
যে, একটা নয় দুটো নয় তিন-তিনটে রুপোলি গোলক ঝকঝক
করছে ঢালু আকাশে

তার নিশ্বাস যতদূর পৌঁছয় ততোদূর টলে পড়ছে মানুষ

সবার মুখ তাই থমথমে আমি জিজ্ঞেস করি ওখানে কী, কী হয়েছে ওখানে
একজন বলে ও কিছু নয় মা বলল জলের রঙে আগুন
অনেকদিন আগে এ-রকমই হয়েছিল একবার, ঘরদুয়োর সব বন্ধ ক'রে দাও
সেবার আর বাঁচে নি কেউ মড়কে ছেয়ে গিয়েছিল দেশ

রুপোলি আলো পারদের মতো ঘন হয়ে এগিয়ে আসে আমার মুখের ওপর
যেন জল থেকে গাঢ়তর জলে ডুবে যায় সমস্ত শরীর
কাগজে তৈরি আমার ভাইয়ের মুখ ঝুলে পড়ে কার্নিশ থেকে বাইরের
হাওয়ায়

আর দেখতে দেখতে অবেলার ঘুম ভেঙে যায়, দুচোখ ভার।

সিঁড়ির প্রথম ধাপ এবং তারপর

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

শেকলকে রঙিন হলে চ'লে যায়, বিকল্প হিসেবে
শৃঙ্খলের ধ্বনি সেও ভালো।
এরকমই সিঁড়ির প্রথম ধাপ, একপা পেছনে
খড়্গ ও শেকল, লাল বেলুনের ভাষা…
গাঁটছড়া-সমেত দীর্ঘ বিবাহের
শব্দার্থ, অথবা বাক্
প্রতিমা কি?
সবকিছু মিলিয়ে দেখি, উত্তরেদক্ষিণে, নীল মলাটের প্রান্তরেখায়
আত্মক্ষর স্মৃতি ও সরলরেখা।
তাহোক। জীবনকে আরো সহজ, চিত্রযুক্ত ছন্দে ও বিন্যাসে
ভুলে যাওয়া…এবং মনে-পড়ার আচমকা বাতাস
চারদিকে তুলেছে ফণা,
কিংবা সে আগুনই, তার লকলকে জিভের মধ্যে জিভ
যেভাবে নড়ছে, তাতে উড়ন্ত পর্দারই
তরল জীবন।

এইভাবে জীবনে আজ নিঃশর্ত, গেলাস-ভর্তি জলের চুম্বন
মেনে নিই।
মনে হয়, জেগে উঠছি, যেভাবে কাঠের মধ্যে ক্রুর
হাত-পা, কাঠের নিচে বুক তলপেট,
শ্রেণীবদ্ধ আঙুলের কাছে হাঁটু—যা আজো গোপনে ঠিক ভাঙা যায়।
ভেঙে দেখি, কোন্‌খানে শেকল তার রঙিনতা
শৃঙ্খলধ্বনির দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে…

সবকিছু মেলানো সেকি শ্রমিক-মধ্যবিত্ত-রাজামহারাজাদের
পাবলিক মিটিঙে ওড়ানো হয়নি?

হয়েছে, যেমন হতো প্রস্রাবের বেগে ও গভীর প্রেমে দু'দশ বছর।
মনে হয়, আরো হতে পারে, যদি সিঁড়ির বুক থেকে ঐ কল্পনাপ্রবণ ধাপগুলি
চোখ-বাঁধা বালিকাদের বুকের মতন ফাঁকা
অবারিত
আহ্লাদসমান হয়ে উঠে।

তোতন ঘুমিয়ে আছে

শিবশম্ভু পাল

আমার সামনে পিছে দক্ষিণে ও বামে
সমান বিবর্ণ ছেঁড়া দৃশ্যপটে উল্টোপাল্টা চলচ্ছবি, স্রোত
যেন আমি নৌকারোহী, সহযাত্রীদের সঙ্গে, নিহিত পর্বত
বাঁচিয়ে অনেক কষ্টে পৌঁছে যাব আমাদের ছেড়ে আসা গ্রামে…
এখন বেজেছে রাত সাড়ে দশ, বাড়ি ফিরে এসেছি অনেক
আগে, সেই সন্ধে হয়ে গেলে ;
গন্তব্যে হয়নি যাওয়া স্ববিরোধী স্রোতের বিকেলে
প্রত্যাবর্তনের দায় মাঝপথে শিরোধার্য করেছে বিবেক।

সেইসব কলরোল, প্রতারক আবর্তের নেপথ্য ভূমিকা
এখনও কানের মধ্যে, কান থেকে ক্রমে
মর্মের ভেতর রাস্তা খুঁড়ে যায় প্রকল্পের স্বাধিকারপ্রমত্ত বিক্রমে
অরণ্যউচ্ছেদে মরে প্রথম কলিটি মেলা আদুরে মল্লিকা।
আমার চোখের সামনে প্রসারিত চুক্তিপত্র, খাপখোলা উদ্যত কলম
দাঁড়িয়ে রয়েছে রাজদূত
অন্ধকারে লেখা পড়তে আলো দেয় পরিহাসপ্রবণ বিদ্যুৎ
সই নিয়ে উঠে বসবে অ্যামবাসাডারের কালো গদিতে নরম !

এইসব যথারীতি সাঙ্গ হলো, এখন অনেক রাত, সাড়ে দশটা বাজে।
অস্থিপঞ্জরের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে কিছু বনস্পতি
আমার ঘরের পর্দা দুলে ওঠে এলোমেলো, লাভ-ক্ষয় ক্ষতি

উদাসীন, অনভিজ্ঞ, সুতোর নকল ফুলে গরীয়ান বাহারি সমাজে
অবিকল প্রতিবিম্ব তুলে ধরে, দেখতে পাই বেশ।
আর দেখি ছেঁড়া দৃশ্যপটে
বুলডোজারের শব্দে থরথর কলকাতার করুণ সংকটে
কেমন সুন্দর করে তোতন ঘুমিয়ে আছে সাড়ে তিনবছর বয়েস!

আশ্চর্য হবার ছড়া

তুষার চট্টোপাধ্যায়

রক্ত, কত রক্ত নিলাম, রক্ত
তবুও কেউ হলোনা ভয়ের ভক্ত!
দিল দরিয়া লুটের টাকা ছড়িয়ে দিলাম কত
শক্ত ঘাড় মানুষ গুলো কেউ হলোনা নত।—কি আশ্চর্য!

হাত ঝুম ঝুম পা ঝুম ঝুম নাদির শাহের চেলা
উল্টো মটাশ ভুট্টোপটাশ ইয়া-ইয়ার খেলা।
বন্দুক দিলাম, কামান দিলাম, বোমা দিলাম দানে
সব ভেসে যায় ভরাডুবি বাঙলা দেশের বানে।—কি আশ্চর্য!
হাট ভেসেছে মাঠ ভেসেছে কোথায় রাখি কি
দেশশুদ্ধ দেশদ্রোহী আ মরে যাই ছি।
করাচী আর পিকিং কাঁদে গণতন্ত্রের শোকে
সামনে-পিছে ওয়াশিংটন রটায় মন্দ লোকে।—কি আশ্চর্য!

ভো বন্ বন্ ওয়াশিংটন বিনি স্থতোর টান
বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর বঙ্গে এল বান
ইস্তি বিস্তি চ্যাক চুঁই
যাকে পাই তাকে ছুঁই
আসমানেতে কালোমেঘ চমকে উঠে পিলে
বাঙলাদেশের ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে।—কি আশ্চর্য!

এবার আশ্বিনে

শান্তিকুমার ঘোষ

এবার আশ্বিনে গলে পড়ে বিষাদ সঙ্গীত
সকলি আচ্ছন্ন ধূমে
কোথাও একটি পুষ্প নাহি—আছে কি অন্তরে
কুমোরটুলির ওই হৃদয়-প্রতিমা ভাঙছে সবলে

আগুন ধরল শেষে আস্তাবলে
উপদ্রুত অশ্বগুলি দিক্‌বিদিকহারা
কলকাতার চেস্‌নাট বাঙ্গালোরে জ্বলে যায়—দহে নাকো তবু

মন আর চলে কই জাহাজ সাম্পান বেয়ে—অবরুদ্ধ স্রোত
ছায়াপথ স্বপ্ন রচে সেতুবন্ধনের
সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে

মুক্তি নেই···মুক্তি কোথা আন্দোলন বিনা
সুপবন বহিতেছে
গৌড়জন আন্দোলনে মাতে নিরবিধ

কে তুমি ধরেছ তান কিরণ মণ্ডলে বসি
নির্ঝর নামছে নদী মানবকরুণা
বাঁশির মতন ছেলে কিংবা সুরূপসী

উচ্চৈঃশ্রবা উঠে আসে অগ্নিশয্যা হ'তে
এয়োরোড্রমে বিমানের পক্ষ বিধূনন
ছিল শমন-দমন রাজা আপন শক্তিতে
তার শাসন পড়ল ধসে আঁখি পালটিতে

ওখানে পাহাড়তলে, এখানে গাঙ্গেয় তটে
বীরগণ ক্ষত্রকর্ম সাধে ভুজবলে

চাঁড়াল-ও ছোঁয় না

অমিতাভ দাশগুপ্ত

প্রথম আগুনে ভালোবেসেছিলে—তাই
দ্বিতীয় আগুনে পুড়েছে তোমার ঘর।
লহমায় জ্বলে ঘন ধুস্তুরি-মায়া,
গিঁঠে গিঁঠে ঘোরে গূঢ় পচনের কীট
ব্যথা দিলে বাজে ফাঁপা দস্তার বাক্স
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় ছিঁড়ে ফুঁড়ে ঢোকে শীত ;
এখন নামাও বালাপোষ, আঙরাখা,
ডেক্ চেয়ারের বাহুতে হেলান দিয়ে
অলস দুচোখে নাচাও অস্তরবি—
যা একটু আগে জ্বলেছে ঘরের চালে।
আসলে তোমার উদাসীনতার পিছে
দীর্ঘ দিনের বেলা-অবেলার কাজে
ঘুরেছে সুবিধাবাদী চৈনিক মুখ
দাম্ভে লাস্যে যখন যেখানে যেমন
সেজেছো সহজে আচাভুয়া কাকাতুয়া।
সে কি খেলা সে কি দহন না কি সে ভস্ম
হয়েছো তোমার মুকুল ফোটার আগে
গাছে গাছে শুধু ফোটালে বিষের গোটা,
বিপ্লব—সেই একটি কুমীর-ছানা
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও লোকসমাজে!
দীর্ঘ বেলায় খোলাচুলে বাতায়নে
ঝড় দিয়েছিল উদ্বেগ, আকুলতা.
কতো অনায়াসে তাকে ভুলে যাওয়া যায়
জলে ভেসে যায় মিনা করা দুরাশার
সে অপাপ-মুখ—এখন জেদি চাঁড়াল
ভস্ম, পিণ্ড নিয়ে দু দগ্ধ হাতে
প্রেততর্পণে মাতাল—বাজাও বাজাও
খড়ি ওঠা ঠোঁটে সর্বনাশের শিঙা।
বাসনার শব শঙ্খমালায় সাজাও।

মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতার তত্ত্ব

ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

১৯৩২ সালে কার্ল মার্কস-এর 'ইকনমিক এ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপটস্' একযোগে জার্মান, রুশ, ও ফরাসি ভাষায় প্রকাশিত হয়; তারপর থেকে এই বইটিকে কেন্দ্র করে তর্ক-স্রোতের আর বিরাম নেই। এই শ'দুয়েক পাতার পুস্তিকাটির অসংখ্য ব্যাখ্যা ও সমালোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সমালোচক ও ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে কমিউনিস্টদের চেয়ে কমিউনিস্ট-বিরোধীদের সংখ্যা বোধহয় বেশি। মার্কস-এর এই 'ম্যানাসক্রিপ্‌টস্'-এর প্রধান আলোচ্য বিষয় বিচ্ছিন্নতা ও বিচ্ছিন্নতা থেকে উত্তরণের বা বিচ্ছিন্নতা-অতিক্রমের ধারণা ও কল্পনা। গত কয়েক বছরে ঐতিহাসিক কারণেই এই আলোচনার গুরুত্ব বেড়েছে। আমার মনে হয় বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের ধারণা সংক্রান্ত সব আলোচনাই অতিমাত্রায় 'টেক্‌নিকাল' ও জটিল হওয়ার দরুণ অনেকক্ষেত্রে দুর্বোধ্যতার পর্যায়ে রয়ে গেছে; এবং তারই সুযোগ নিয়ে কিছু সংখ্যক তাত্ত্বিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে সহজবোধ্য করার নামে 'ভালগারাইজ' করেছেন। আমাদের সমালোচ্য পুস্তকটি[১] সহজপাঠ্য নয়, কিন্তু দুর্বোধ্যতার পর্যায়েও পড়ে না। বিচ্ছিন্নতা-সংক্রান্ত আলোচনায় মার্কস-এর 'ম্যানাসক্রিপটস্'-এর প্রধান বক্তব্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা নেই। গ্রন্থকার প্রথমেই বলেছেন যে মার্কস-এর বহুমাত্রিক সংক্ষিপ্ত সূত্র আপাতদৃষ্টিতে সরল, কিন্তু বোধগম্যতার দিক থেকে দুরূহ[২]; কাজেই ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ ও বিপদ

১। Marx's Theory of Alienation: I. Mészáros: The Merlin Press; London; 1970.

২। The enormous complexity of the closely inter-related theoretical levels is often hidden by formulations which look deceivingly simple. Paradoxically enough, Marx's great powers of expression...make an adequate understanding of his work more, rather than less, difficult.…the dangers of misinterpretation are acute.

দুইই দেখা দিয়েছে। কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত অংশের উদ্ধৃতি থেকে কোনো কোনো তাত্ত্বিক 'র‍্যাডিক্যালি নিউ মার্কস'-এর সন্ধান পেয়েছেন। এই 'মার্কস'-এর সঙ্গে পরবর্তীকালের 'মার্কস'-এর মৌলিক তত্ত্বগত বিরোধ দেখা দিয়েছে। আবার কেউবা মার্কসকে বিকৃত করার উদ্দেশ্য নিয়েই অংশবিশেষকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। আর. সি. টাকার-এর নাম এই সূত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য।[৩]

আলোচ্য গ্রন্থলেখক এদেশে খুব বেশি পরিচিত নন। হাঙ্গেরিতে জন্ম। লুকাকস-এর অধীনে গবেষণা করেছেন। 'স্যাটায়ার' নিয়ে গবেষণা-মূলক গ্রন্থ লিখে তাঁর লেখকজীবনের আরম্ভ। ১৯৫৬ সালের নভেম্বর মাসে টুরিনে সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করে তিনি হাঙ্গেরি ত্যাগ করেন। বর্তমানে ইংলণ্ডের সাসেক্সে অধ্যাপনায় নিযুক্ত রয়েছেন। সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধও লিখেছেন। হাঙ্গেরি ইতালি ইংলণ্ড ফ্রান্স আমেরিকার নামকরা পত্রপত্রিকায় এইসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থকার তাঁর শিক্ষক জর্জ লুকাকস-এর মতোই দর্শন-অর্থশাস্ত্র-সমাজবিদ্যা-সাহিত্যে সুপণ্ডিত। কাজেই তাঁর গ্রন্থে মার্কসীয় ব্যাখ্যার বিচ্ছিন্নতার আলোচনা অনেকখানি অখণ্ডিত রূপ পেয়েছে।

মানুষ প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন, অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন, মানব প্রজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন—এসবই শ্রম-বিচ্ছিন্নতার ফল। মার্কসীয় মূলসূত্রের এই চারটি অবয়ব প্রথম পঠনে খুবই সহজবোধ্য মনে হয়। আসলে ব্যাপারটি বেশ জটিল। ভূমিকাতে গ্রন্থকার এই অবয়বগুলির জটিলতার আভাস দিয়েছেন এবং পরে ব্যাখ্যার সাহায্যে জটিলতা দূর করার চেষ্টা করেছেন। বিচ্ছিন্নতা অতিক্রমের তত্ত্বটিও যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছে। বস্তুত গ্রন্থকার এই কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, বিচ্ছিন্ন অবস্থা থেকে উত্তরণ, বিচ্ছিন্নতার সীমা অতিক্রমই বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য।[৪] যাঁরা কেবলমাত্র

৩। Tucker R. C. Philosophy and Myth in Karl Marx (1961) (Mészáros I. Marx's Theory of Alienation : Pp 11)

৪। ···The key to understanding Marx's theory of alienation is his concept of "Aufhebung" (transcendence), and not the other way round···The concept of "Aufhebung" must be in the centre of our attention for three main reasons :

(1) It is as we have seen, crucial for the understanding

বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে মার্কস-এর বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে ধারণা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন তাঁরা মার্কস-এর প্রতি অবিচার করেছেন, মার্কসবাদকে বিকৃত করেছেন। আবার অন্যদিকে যাঁরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা করছেন বা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁরা যদি বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে অবহেলা করে এখনও দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তবে মার্কস ও মার্কসবাদের প্রতি সমান অবিচার করা হবে। ইতিহাসে এই প্রথম ধনতন্ত্রের একেবারে বনিয়াদে পৃথিবীব্যাপী কাঁপন লেগেছে; শ্রম থেকে, সত্তা থেকে, প্রজাতি থেকে, অন্য মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দিন শেষ হয়ে আসছে। এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে, এমনকি তিরিশের দশক পর্যন্ত যে-আলোচনাকে বুদ্ধিজীবীদের 'ব্যায়াম' নাম দিয়ে দূরে সরিয়ে রাখা চলত, আজ আর সে-আলোচনাকে শ্রমিক আন্দোলনের বিষয়-সূচির বাহিরে রাখা চলছে না। যতদিন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা আংশিকভাবে বা এক-আধটি দেশে প্রতিষ্ঠিত ছিল, ততদিন সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা বিমোচনের,—"পজেটিভ্ ট্রান্সেনডেন্স অফ্ লেবার'স সেল্ফ্ এ্যালিয়েনেশন"-ধারণার অবস্থান ছিল পশ্চাদ্ভূমিতে।[৫] তখনও ধনতন্ত্রে দুনিয়াজোড়া সঙ্কট দেখা দেয়নি, সারা পৃথিবীর সামাজিক আর্থনীতিক ব্যবস্থার আশু আমূল পরিবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হয়নি, তাই বিচ্ছিন্নতা ও তার নিরসনের সমস্যা সাধারণকে পীড়িত করেনি। জগৎজোড়া সর্বাত্মক সঙ্কটের সমাধানে সামগ্রিক ভাবে প্রযোজ্য প্রতিকারবিধির প্রয়োজন। তা বলে, এ-কথা যেন মনে করা না হয় যে এই প্রয়োগে রাতারাতি কোনো ফল পাওয়া যাবে অথবা মার্কস-এর

---

of the Economic and Philosophic Manuscripts of 1844 whose analysis constitutes the major part of this study ;

(2) The concept of the "transcendence (Aufhebung) of labour's self-alienation "provides the essential link with the totality of Marx's work, including the last works of the so-called "mature Marx".

(3) in the development of Marxism after the death of its founders the issue was greatly neglected and, for understandable historical reasons, Marxism was given a more directly instrumental orientation. Mészáros : Marx's Theory of Alienation, Pp 2.

৫। Ibid Pp 21.

এই বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব ত্রাণকর্তার অমোঘ অব্যর্থ ত্রাণমন্ত্র। গ্রন্থকারের বক্তব্য এই যে, এ যুগের প্রতিটি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের দৈনন্দিন সমস্যা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিচ্ছিন্নতাবোধ ও বিচ্ছিন্নতা নিরসনের প্রচেষ্টার সঙ্গে জড়িত।

বছর-পাঁচেক আগে পোলাণ্ডের অ্যাডাম সাফ্ এই প্রসঙ্গে প্রায় একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, যদিও মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বের বিচারে তিনি ছিলেন ফ্রয়েডীয় মনস্তাত্ত্বিক এরিক ফ্রমের অস্তিবাদী ধ্যান-ধারণার দ্বারা প্রভাবিত। তিনিও বলেছিলেন যে, মার্কস-এর প্রথম দিককার লেখা দুটি গুরুত্বপূর্ণ রচনার (ইকনমিক অ্যাণ্ড ফিলজফিক ম্যানাসক্রিপটস্, ১৮৪৪ এবং দি জার্মান ইডিওলজি) সঙ্গে কমিউনিস্টদের পরিচয় ঘটেছে একান্ত হালে। প্লেখানভ ও লেনিন এবং কাউটস্কি ও রোজা লুক্সেমবুর্গ যদি এই দুটি পুস্তকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত থাকতেন, তাহলে তাঁরা মার্কস-এর পরবর্তীকালের তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা হয়তো ভিন্নভাবে করতেন। স্তালিনযুগে তরুণ মার্কস-এর রচনাবলীর দিকে নজর দেবার রেওয়াজ ছিল না। ব্যক্তিগত সমস্যা অথবা মানবতাবাদ চর্চার আবহাওয়া তিরিশের যুগে তৈরি হয়নি।[৬] তাই পশ্চিমী পণ্ডিতদের কাছে সমাদৃত হলো তরুণ মার্কস-এর 'ম্যানাসক্রিপটস্' ও 'ইডিওলজি'। আর মার্কস-এর মানবতা সম্পর্কিত দার্শনিক বক্তব্যের ভক্ত হলেন পূর্বজার্মানির আর্নস্ট ব্লক ও পোলাণ্ডের লেসজেক কোলাকোস্কির মতো শোধনবাদী কমিউনিস্ট। তরুণ মার্কস-এর বক্তব্য আর পরিণত মার্কস-এর বক্তব্যের মধ্যে বিপরীত মতাবলম্বীরা নিজেদের বিপরীত মতের সমর্থন খুঁজে পেলেন। পশ্চিমী পণ্ডিত আর ঐসব শোধনবাদীরা তরুণ মার্কসকে নিয়ে পরিণত মার্কস-এর ক্যাপিট্যাল ও এঙ্গেলস-এর 'অ্যান্টি ডুরিং'-এর মতবাদকে খণ্ডন করার চেষ্টা করলেন। শুধু তাই নয়, তাঁদের কাছে তরুণ মার্কসই হলেন খাঁটি মার্কস আর পরিণত মার্কস হলেন একজন গোঁড়া পার্টি-সমর্থক। টাকার[৭] বললেন, মার্কসকে অর্থনীতি রাজনীতি বা সমাজবিদ্যার পণ্ডিত মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়, তিনি আসলে ধর্মনীতির

৬। In the atmosphere of the nineteen thirties Schaff wrote 'there was no room in official Marxism for the problems of the individual, the philosophy of man and humanism' [Jordan, Z. A : Survey : July 1966, Pp 123]

৭। Tucker R. C., Philosophy and Myth in Karl Marx. (Cambridge University Press—1961)

প্রচারক। কথাগুলো অদ্ভুত শোনালেও সত্যি। টাকার[৮] সত্যিই এইরকম লিখেছেন। পরিণত মার্কস টাকারের মতে মৌলিকত্ব হারিয়ে নিজের সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। আবার অন্যদিকে, সরকারী মার্কসবাদের সমর্থকরা (যাঁরা দুই মার্কসকে ভিন্ন মন্তব্যের প্রবক্তা বলে মনে করেন) তরুণ মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে কাঁচা হাতের লেখা বলে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে পরবর্তী কালের লেখার মধ্যেই খাঁটি মার্কসবাদের সারবস্তু খুঁজে পেয়েছেন। অ্যাডম সাফ্ (১৯৬৬) এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে—মার্কস এক, মার্কসবাদও একটি। মার্কস-এর চিন্তাধারা ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে, মতবাদ ক্রমশ পুষ্ট, প্রসারিত হয়েছে। তাঁর ধারণার কোনো গুণগত মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি। অর্থাৎ বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব ও পরবর্তীকালের পুঁজিকেন্দ্রিক তত্ত্বের মধ্যে মৌলিক কোনো বিরোধ নেই। প্রমাণ হিসেবে তিনি ও তাঁর সমর্থকরা মার্কস-এর পরবর্তীকালের রচনা থেকে দু'একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন। বলার ভঙ্গি, ভাষা, স্টাইল ইত্যাদির পরিবর্তন ঘটলেও মানুষ সম্পর্কিত দার্শনিক মতবাদের পরিবর্তন ঘটেনি। সাফ মনে করেন বরং তাঁর তরুণ বয়সের রচনা তাঁর পরিণত ভাবধারা ও মতবাদকে বুঝতে সহায়তা করে। অ্যাডাম সাফ ও তাঁর সমর্থকরা (সমর্থকদের মধ্যে বেশির ভাগ হলেন পশ্চিমী বুর্জোয়া পণ্ডিত ও তথাকথিত শোধনবাদী) 'ম্যানাসক্রিপটস্' ও 'জার্মান ইডিওলজি' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে[৯]

৮। 'Marx's main work in an inner drama projected as a social drama (Ibid Pp 21). Just like Feurbach as Hegel before him—who did not realise that when he analysed religion he was in fact talking about the neurotic phenomenon of human self-glorification or pride, and the estrangement of the self that results from it (Pp 93). Marx had no idea that in his presumed analysis of capitalism he unconsciously painted something resembling R. L. Stevenson's, Dr. Jekyll and Mr. Hyde; a purely psychological problem, related to an entirely individual matter (Pp 240). Being a suffering individual himself, who had projected upon the outer world an inner drama of oppression, he saw suffering everywhere (Pp 237).

৯। মার্কস-এর পরবর্তীকালের লেখার মধ্যে তরুণ মার্কস-এর সুসম্মত প্রথার ও পরিণতির প্রমাণ সাফ ও সমর্থকরা খুব বেশি দেখাতে পেরেছেন বলে মনে

দেখালেন যে, মার্কসবাদীদের পক্ষে সব থেকে বড় ও বাধ্যতামূলক কাজ হলো মানুষকে মানুষ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া, মনুষ্যোচিত গুণবর্জিত পৃথিবীর ক্লেদ থেকে মানুষকে মুক্ত করা।

অ্যাডাম সাফ-এর প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে বিচ্ছিন্নতা আলোচনায় এসে পড়ল। মেসজারোসের আলোচ্য পুস্তকটির বছর চারেক আগে সাফ-এর 'মার্কসিজম্ অ্যাণ্ড দি ইন্ডিভিজুয়াল' বইটি প্রকাশিত হয়। পোলিশ পার্টির তাত্ত্বিকদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় সাফ এর আগে কখনও সরকারী পার্টির সমালোচনা করেননি। এই প্রথম তিনি সমালোচকের ভূমিকা নিলেন। কমিউনিস্ট নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপের ফলে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটছে না, আন্ত-র্মানবিক সম্পর্কের, রাষ্ট্র ও পার্টির সঙ্গে ব্যক্তিসাধারণ ও কেডারসাধারণের সম্পর্কের উন্নতি ঘটছে না। এক অন্ধ গলিতে এসে প্রগতির স্রোত যেন স্তব্ধ হয়ে গেছে। এর মূলে, সাফ মনে করলেন, আছে মার্কস-এর সঠিক শিক্ষার প্রতি অবহেলা, তরুণ মার্কস-এর 'সমাজবাদী মানবতার' প্রতি অশ্রদ্ধা ও বিচ্ছিন্নতা তত্ত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা। বিমূর্ত মানুষ নয়, ব্যক্তিমানুষের জন্যই সমাজতন্ত্র। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি ব্যক্তিমানুষের সুখ-দুঃখে উদাসীন থাকে তবে সমাজ-তন্ত্রের উদ্দেশ্য বিফল হতে বাধ্য। বিপ্লব সামাজিক অন্যায়-অবিচারের প্রতি-বিধান কল্পে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে (পোল্যাণ্ডে) অন্যায় অবিচার রয়েই গেছে। মার্কস লিখেছিলেন, ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপের

হয় না। Me´sza´ros তাঁর পুস্তকের একটি অধ্যায়ে নানা উদ্ধৃতি ও বিচার-বিতর্কের সাহায্যে তরুণ মার্কসকে পরিণত মার্কস-এর মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমাদের আলোচনা সেই দিকে যাবার আগে সাফ্-সমর্থকদের একটি উদ্ধৃতির উল্লেখ প্রয়োজন :

"In Grundisse der Kritik der politischen Okonomie (Outlines of a Critique of Political Economy) composed by Marx in 1857/58, we find a passage which conbines the socialist humanism of the young Marx with the evolutionary sociological holism of later years and thus corroborates the hypothesis of continuity : See E. J. Hobsbawm (ed); Karl Marx : Pre-Capitalist Economic Formations (London, 1964) p. 84.

সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটবে[১০] কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অভিজ্ঞতা অন্য কথা বলছে। মার্কস-এর ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়নি।[১১] কেবলমাত্র ব্যক্তি-সম্পত্তির বিলোপ বিচ্ছিন্নতার নিরসন ঘটায় না, এমনকি অর্থনৈতিক বিচ্ছিন্নতাও এর ফলে বিলুপ্ত হয় না। [মার্কস-এর বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যা করেননি সাফ। তরুণ মার্কস-এর বক্তব্যকে পরিণত মার্কস-এর ধারণা ও বিচ্ছিন্নতানিরসনের সার্বিক উপায়-পদ্ধতি থেকে পৃথক করে দেখে সাফ সেই ভুলই করেছেন, যা তাঁর মতে বুর্জোয়া পণ্ডিত ও শোধনবাদীরা করেছিলেন: ধী. গ.] মানুষেরই স্বষ্ট বস্তু প্রতিষ্ঠান যখন মানুষের প্রভাব মুক্ত হয়ে নিজস্ব নিয়মে চলে ও নিজের শক্তিতে ব্যক্তিমানুষকে শৃঙ্খলিত করে, তখন বিচ্ছিন্নতার বিকাশ ঘটে। সমাজের স্রষ্টা মানুষ যদি সামাজিক আইন-কানুনের নিগড়ে বাঁধা পড়ে সত্তা ও স্বাধীনতা থেকে বিযুক্ত হয়, যদি অন্ধ সামাজিক শক্তির নিষ্পেষণে তাঁর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তাহলে তার উচিত যেকরেই হোক সমাজের উপর, সামাজিক শক্তির উপর নিজের প্রভাব ফিরিয়ে আনা। বিচ্ছিন্নতার নিরসনের চেষ্টা মানে মানবমুক্তির সংগ্রাম, সত্যিকারের ব্যক্তি-স্বাধীনতার সংগ্রাম। সাফের পুস্তক প্রকাশের বেশ কিছুদিন আগে (১৯৫৭) সার্ত্র একটি পত্রিকায় লেখেন যে, অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতার সমস্যা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রেও বিদ্যমান[১২]। আসলে বিচ্ছিন্নতার সমস্যা

১০। "The positive transcendence of private property as the appropriation of human life is the positive transcendence of all estrangement, that is to say, the return of man...to his human, ie. social mode of existence. (Marx: Economic and Philosophical Manuscripts 1844)

১১। I. Mészáros এ-সম্পর্কে অন্যমত পোষণ করেন। আলোচ্য পুস্তকের 244—252 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১২। সার্ত্র লিখেছিলেন যে, অস্তিত্বের মৌলিক সমস্যাগুলো সর্বদেশেই সর্বকালে বিদ্যমান। ভয় উদ্বেগ অশান্তি নিরাপত্তার অভাব থেকে ব্যক্তিমানুষের মুক্তি নেই। "The desire for happiness, the fear of death, the experience of solitude, the dread of life or the sense of its meaninglessness—remain unresolved as much under socialism as under capitalism. But the main cause of the persisting disillusionment with and unsatisfactoriness of life is alienation which socialism has not managed to overcome." সোভিয়েত লেখকেরা এর প্রতিবাদ করেছিলেন এবং সেই সময় সাফ এই বাদ-প্রতিবাদে সোভিয়েত পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন। A Philosophy of of Man (N. Y. 1963) p102.

অস্তিত্বের সমস্যা, ধনতন্ত্রের সমস্যা নয়। মার্কসীয় তত্ত্বের এই বিরোধিতা সে সময় সাফ সহ্য করেননি। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে সাফ্‌ও সার্ত্রের বিরুদ্ধে তর্কযুদ্ধে নেমেছিলেন। যদিও তখনও তিনি ব্যক্তিস্বাধীনতার স্বপক্ষে ওকালতি করছিলেন, কিন্তু সরাসরিভাবে পার্টি বা সরকারের বিরুদ্ধে কোনো কিছু লেখেননি।[১৩] বুর্জোয়া পত্রিকার মতে তিনিও ছিলেন শোধনবাদী, কিন্তু গোঁড়া ধরনের। তাঁর সমালোচনার উদ্দেশ্য ছিল পার্টির শক্তি বাড়ানো ও পার্টির আধিপত্যকে আরো সুদৃঢ় করা[১৪]। পরবর্তী সময়ে সরকারী সমালোচনায় যখন তিনি মুখর হয়ে উঠলেন তখন অল্পসংখ্যক সমালোচক তাঁর স্বপক্ষে এলেন, বেশিরভাগই গেলেন বিপক্ষে। তাঁর পুস্তকের মধ্যে যেসব ঘটনার উল্লেখ ছিল (পার্টি ও রাষ্ট্র পরিচালনার ত্রুটি বিষয়ক) সেইগুলো নিয়েই খুব হৈচৈ উঠলো ; তত্ত্বগত বক্তব্য সম্পর্কে বেশি উচ্চবাচ্য করা হলো না[১৫]।

১৩। The trumph card of anti-communist and anti-marxist propaganda has been the question of the rights of the individual under socialism. Our opponents argue that they have a democracy and we a dictatorship, that the rights of the individual are respected in their countries and not in ours. This is an argument that does appeal to many people and can for a time effectively frighten them away from socialism. (Ibid. pp 103)

১৪। Schaff's revisionism can be called orthodox because he subordinated it to the supreme objective of keeping the party in power and of making its hold on the country secure and effective·········He was successful so long as he dealt with theoretical or philosophical problems regarded by his more practically-minded comrades with condescending indifference.······But when he crossed this line and took up matters directly affecting the reputation and politics of the party, as he did in 'Marxism and the Individual', the party turned against him with anger and fury. (Jordon B.A. : Survey : July 1966, Pp 120)

১৫। "While some problems of substance, for instance Schaff's use of the term "alienation" or affinity of his views with existentialist philosophy were raised,...the main objection was his "long list of exaggerated and often groundless complaints against socialism." (Ibid. Pp 133)

অ্যাডাম সাফ্-এর বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কিত ধারণা অস্তিবাদ প্রভাবিত। সাফ্-এর সমালোচকরা সে-সম্বন্ধে খুব বেশি সজাগ নন। তাঁদের প্রধান আপত্তি তথ্যমূলক ভুলত্রুটির উল্লেখে। এ-থেকে আমার মতো সীমিত জ্ঞানের লোক যদি মনে করে যে সমাজতান্ত্রিক দেশে তাত্ত্বিক আলোচনায় ক্রমশ ভাঁটা পড়ে আসছে, তত্ত্ব ও তথ্যের ডায়েলেক্‌টিক সম্পর্কে ছেদ পড়ছে, সুযোগবাদ মার্কসবাদকে হ্রাস করতে চলেছে, তাহলে তাদের খুব দোষ দেওয়া যায় না। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতার অস্তিত্ব তাত্ত্বিকরা অস্বীকার করতে পারেন না, তাই হয়তো অনেকে বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকেই অস্বীকার করতে চান।

নিও-ফ্রয়েডিয়ান ও অস্তিবাদী দার্শনিকদের বস্তুবাদবিরোধী সুকৌশলী আক্রমণের উপযুক্ত ধারালো কোনো উত্তর কমিউনিস্ট তাত্ত্বিকরা দিতে চান না বোধহয়, তাই পার্টির শিল্পী-সাহিত্যকরা নিজেদের অজ্ঞাতে মনে মনে ভাববাদাশ্রিত ধারণা পোষণ করেন। অনেক সময় তাঁদের শিল্পকৃতির মধ্যে সেটা প্রকাশ হয়ে পড়ে। ব্যক্তি-সম্পর্কের ব্যাপারে অস্তিবাদী বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বকে অথবা ফ্রয়েডীয় লিবিডোতত্ত্বকে মেনে নেবার ফলে এদের নিজের জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে সহাবস্থান নীতি গ্রহণ করার অতিউৎসাহে অথবা মার্কসীয় তত্ত্বের আলোচনার উপর গুরুত্বের অভাবে অনেক বিপর্যয়ের সৃষ্টি হয়েছে ও আরও হবার সম্ভাবনা রয়েছে। চেকোশ্লোভাকিয়ায় কাফকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরবর্তী অধ্যায়ে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা, এইরূপ এক বিপর্যয়ের নিদর্শন। এই অবস্থায় মেসজারোস-এর বিচ্ছিন্নতা বিষয়ক সুদীর্ঘ তাত্ত্বিক আলোচনার এই গ্রন্থটি আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ মূল্যবান মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

বইটি তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে তিনটি অধ্যায়ে আছে মার্কসীয় তত্ত্বের উদ্ভব ও গঠন সম্পর্কে আলোচনা। দ্বিতীয় খণ্ডে চারটি অধ্যায়: বিচ্ছিন্নতার বিভিন্ন দিক নিয়ে বিচার। তৃতীয় খণ্ডে আবার তিনটি অধ্যায়: বিচ্ছিন্নতার সমকালীন তাৎপর্য এই খণ্ডে বিশেষভাবে আলোচিত। সার্ত্র, সাফ বা ফিশারের মতো আলোচ্য লেখক কোথাও মার্কসীয় তত্ত্বের ব্যাখ্যায় অস্তিবাদী দর্শন বা ফ্রয়েডীয় নির্জ্ঞানের শরণাপন্ন হননি; এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি বজায় রেখেই তিনি বিচার করেছেন।

প্রথম দুটি খণ্ডের চেয়ে তৃতীয় খণ্ড অপেক্ষাকৃত সরল ও বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। প্রথম অধ্যায়ে তরুণ ও পরিণত মার্কস-প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যক্তি

ও সমাজ-প্রসঙ্গ ও তৃতীয় অধ্যায়ে শিক্ষাসঙ্কট-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। সব পাঠকই শেষের অধ্যায় তিনটি পড়ে বিশেষভাবে উপকৃত হবেন। অষ্টম অধ্যায়টিতে তরুণ বনাম পরিণত মার্কস-এর বিতর্কটি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অ্যাডাম সাফের মতো অস্তিবাদের দ্বারস্থ না হয়েই লেখক সপ্রমাণ করেছেন যে বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব মার্কস কোনোদিনই পরিত্যাগ করেননি। পরিণত মার্কস-এর মধ্যেই তরুণ মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি।

তিনি প্রথমে জন ম্যাকমারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন[১৬] তরুণ ও পরিণত মার্কসকে পৃথক করে দেখা দ্বন্দ্বমূলক বিচারসম্মত নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, রাজনীতির দিক থেকে দুই বিপরীত আদর্শের পণ্ডিতরা এই ভুল করেছেন। একদল তরুণ মার্কসকে মাথায় তুলে নিয়েছেন, অন্যদল পরিণত মার্কসকেই শুধু গ্রাহ্য করেছেন। ম্যাকমারে এই মন্তব্য করেছেন ১৯৩৫ সালে। তারপর এই প্রবণতা কমে গেছে মনে করলে ভুল হবে। বরং দুই মার্কস-এর মধ্যেকার এই বিচ্ছেদকে এখন যেন মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়াই হয়েছে। এ-কথা লিখেছেন মেসজারোস। আমাদের দেশে বিচ্ছিন্নতা নিয়ে আলোচনা বোধহয়

১৬। "Communists are rather liable to misinterpret this early stage even if they do not entirely discount it. They are naturally apt to read these writings in order to find in them the reflection of their own theory as it stand today, and therefore, to dismiss as youthful aberrations those elements which do not square with the final outcome. This is, of course, highly undialectical. It would be equally a misunderstanding of Marx to separate the early stages of his thought from their conclusion, though not to the same extent. For they are earlier stages, and though they can only be fully understood in terms of the theory which is their final outcome, they are historically earlier and the conclusion was not explicitly in the mind of Marx when his earlier works were written. (MacMurray John: "The Early Development of Karl Marx's Thought," in Christinanity and Social Revolution: Victor Gollanez, London: 1935; Pp 209-10)

খুব বেশি হয়নি। বছর পাঁচেক আগে পাভলভ ইনষ্টিটিউটের উদ্যোগে যে-আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়, তাতে এইরকম মতবাদেরই প্রাধান্য দেখেছিলাম। আলোচনা বেশির ভাগই অবশ্য বিশৃঙ্খলভাবে চলেছিল এবং মার্ক্স-এর, 'ম্যানস্ক্রিপটস্'-এর কথা খুব কম বক্তাই মনে রেখেছিলেন। কিছুদিন আগে মূল্যায়ন পত্রিকার আয়োজিত সভায় আগের দিনের মতোই দুই মার্ক্সকে একেবারে পৃথক করে দেখা না হলেও, তরুণ মার্ক্স-এর তারুণ্যকে যেন একটু অনুকম্পার সঙ্গে বিচার করার চেষ্টা হয়েছে। ঐ পত্রিকায় প্রদত্ত বিবরণী থেকে আমি এইরকমই বুঝেছি।[১৭]

তরুণ মার্ক্সকে 'অমার্ক্সবাদী মার্ক্স' বলা, আবার তাঁকে 'বিপ্লবী হিসেবে চিনে নিতে কষ্ট না হওয়ার' মধ্যে আমি অনুকম্পার ভাব লক্ষ্য করেছি। এক জায়গায় লেখা হয়েছে 'দুই মার্ক্স-এর' তত্ত্বটা যেন বুর্জোয়াদের আমদানি, আবার অন্য জায়গায় দেখছি লেখা হয়েছে "তারা (ঐ বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা-ধী. গ.)

১৭। "এই সব পূর্ববর্তী রচনায় যদিও মার্কসকে বিপ্লবী হিসেবে চিনে নিতে কোনো কষ্ট হয় না, কিন্তু তখনো অর্ধস্ফুট বিপ্লবী চেতনার পরিপূর্ণ বিকাশ না ঘটায় তাঁর রচনায় সেই অপরিণত চিন্তার অনেক ছাপ রয়েছে—মার্কস নিজেও সেই সময় পুরোপুরি মার্কসবাদী হয়ে ওঠেননি···মার্কসবাদ যখন পরিণত হয়ে ওঠেনি সে সময়কার রচনায় পরিণত মার্কসবাদী মার্কস থেকে অনেকাংশে অমার্কসবাদী মার্কসকেই বেশী পাওয়া যায়। কেননা তখনো বিশেষ করে উনিশ শতকের চল্লিশের দশকের লেখাগুলিতে মার্কস প্রধানতঃ তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের তত্ত্বের আলোচনা ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে নিজস্ব দর্শন-সৃষ্টির প্রয়াস পাচ্ছেন। মার্কসের সেই অমার্কসবাদী রূপটাই বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের কাছে পরম লোভনীয় হয়ে উঠল।···কিন্তু হেগেল ও ফয়েরবাখ সম্পর্কিত আলোচনা ও সমালোচনায় তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছিলেন—'ক্যাপিটাল'-এর মার্কসের চিন্তার সঙ্গে তার বিরাট পার্থক্য ছিল।···তারা (বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা ধী. গ.) দুই মার্কসের মূলগত পার্থক্যটাই ভুলে যান বা অস্বীকার করেন···আরো একটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—মার্কসবাদের বিকাশের প্রাথমিক স্তরে ধনতন্ত্রের প্রতি মার্কস যে অসীম ঘৃণা ও বিরোধিতা পোষণ করতেন তার অনেকটাই ছিল নৈতিক ও বিমূর্ত।" [মূল্যায়ন ঃ ৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃষ্ঠা ১১১-১১৩]

'দুই মার্কস'-এর মূলগত পার্থক্যটা ভুলে যান বা অস্বীকার করেন"। রিপোর্টার আবার শেষের দিকে লিখেছেন "কিন্তু আমরা জানি তরুণ মার্কসকে পরিণত মার্কসের বিরুদ্ধে দাঁড় করানোর চেষ্টা মার্কসকে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার নামান্তর।" আমার কাছে রিপোর্টটি একটু গোলমেলে মনে হয়েছে। পাঠকদের অবগতির জন্য তাই রিপোর্টের অনেকখানি তুলে ধরেছি।

কেন এই তরুণ-পরিণত বিরোধ? আলোচ্য গ্রন্থের লেখক বলেছেন যে, কারণটা নিহিত রয়েছে 'দি জার্মান ইডিওলজি' ও 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'র দুটি উদ্ধৃতর মধ্যে—যেখানে মনে হয়, মার্কস যেন নিজেকে তাঁর অতীত থেকে, দার্শনিকের ভূমিকা থেকে সরিয়ে আনতে চেয়েছেন। সত্যিই কি তাই? গ্রন্থকার তা মনে করেন না।[১৮] 'জার্মান ইডিওলজি'র অনুবাদক ও ভাষ্যকারের সঙ্গে তিনি একমত নন। 'সেলফ্ এস্ট্রেঞ্জমেন্ট' কথাটা তিনি পরবর্তীকালে অস্বীকার বা বর্জন করতে চাননি। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর' যে-লাইনগুলো উদ্ধৃত করে 'ম্যানাসক্রিপট'-এর বিরুদ্ধে খাড়া করা হয়[১৯] সেগুলোর তাৎপর্য সঠিকভাবে অনুধাবন করা হয়নি—গ্রন্থকার এই মত পোষণ করেন। সমগ্র আলোচনা তুলে ধরা সম্ভব নয়। পাঠক ঔৎসুক্যবোধ করলে আলোচ্য পুস্তকের ২১৮-২২২ পৃষ্ঠা পড়ে দেখবেন। আমার মনে হয়েছে মেসজারেসের যুক্তি গ্রহণযোগ্য। পরবর্তীকালের রচনায় মার্কস তাঁর বিচ্ছিন্নতাতত্ত্বের বিরোধিতা করেননি; বিচ্ছিন্নতার ভাববাদী ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে পাঠকদের সতর্ক করে দিয়েছেন। 'ইকোয়ালি হোয়াট্ ইজ্ এ্যাটাকৃড্ হিয়ার ইজ নট দি নোশন অফ 'ম্যান' ডিফাইণ্ড বাই মার্কস ইন ১৮৪৪ এ্যাজ দি সোশ্যাল ইনডিভিজুয়াল, বাট দি এ্যাবস্ট্রাকশন 'হিউম্যান নেচার' এ্যাণ্ড "ম্যান ইন জেনারেল"। গ্রন্থকার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন যে, ১৮৪৪এর লেখায় মার্কস নৈতিক ও বিমূর্ত আদর্শের প্রচার করতে চেয়েছেন এই ধারণা ঠিক নয়। এবং এ-যুক্তিও গ্রন্থকার খণ্ডন করতে চেয়েছেন যে, ১৮৪৫ থেকে মার্কস মানুষ ও তার বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে অনাগ্রহী নিরাসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। গ্রন্থকার কতদূর সফল হয়েছেন ও তাঁর বক্তব্য কতটা তর্কাতীত সেটা পাঠকেরা বিচার করবেন। আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে

১৮। Mészáros : Marx's Theory of Alienation : Pp 218-220
১৯। Marx-Engels : Manifesto of the Communist Party, in selected works edition. vol. 1, p 58.

তাঁর অভিগমন (এ্যাপ্রোচ) আমার কাছে বিজ্ঞানসম্মত মনে হয়েছে। 'শ্রেণী' ও 'সর্বহারার' ধারণা তাঁকে বিচ্ছিন্নতাতত্ত্ব থেকে দূরে নিয়ে যায়নি। বিরোধী পক্ষের 'সমাজ-সম্পর্করহিত' 'বিমূর্ত মানুষ' নিয়ে তিনি ১৮৪৪এর আগেও কোনোদিন ঔৎসুক্য প্রকাশ করেননি।[২০] যদি তাই হয় তবে 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি তাঁর পরবর্তী রচনায় এত বিরল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন গ্রন্থকার মার্কস-এর মূল রচনা থেকে উদ্ধৃতি তুলে ধরে। 'দি হোলি ফ্যামিলি', 'দি জার্মান ইডিওলজি' 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো', 'ওয়েজ, লেবার এ্যাণ্ড ক্যাপিটাল', 'আউটলাইনস্ অফ্ এ ক্রিটিক অফ পলিটিকাল ইকনমি', 'থিওরিজ অফ সারপ্লাস ভ্যালু' ও 'ক্যাপিটাল' থেকে অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে গ্রন্থকার প্রমাণ করেছেন যে, 'বিচ্ছিন্নতা' বা সমার্থবাচক শব্দ পরবর্তী রচনায় খুব বিরল নয়। এই 'ড্রপ-আউট থিয়রি' অচল।[২১]

২০। He was, in fact, never interested in this "Man", not even before 1843, let alone at the time of writing the Economic and philosophic manuscripts of 1844. On the other hand "real man" the self-mediating being of nature, the 'social individual' never disappeared from his horizon. Even towards the end of his life when he was working on the third volume of Capital, Marx advocated for human beings the "conditions most favourable to and worthy of their human nature". Thus his concern with classes and the proletariat in particular always remained to him identical with the concern for "the general human emancipation". (Ibid pp 221) কোটেশন চিহ্নিত অংশ দুটি যথাক্রমে Marx, Capital ed. cit vol III p 8003 Marx-Engels : On Religion ; ed. cit p 53 থেকে গৃহীত)

২১। It should be clear by now that none of the meanings of alienation as used by Marx in the Manuscripts of 1844 dropped out from his later writings. And no wonder. For the concept of alienation, as grasped by Marx in 1844, with all its complex ramifications, is not a concept which could be dropped. As we have seen in various parts of this study, the concept of alienation is a vitally important pillar of the Marxian system as a whole, and not merely one brick of it. To drop, or to translate it onesidedly, would therefore, amount to nothing short of the complete demolition of the building itself······(Ibid p 227)

যাঁরা মনে করেন তরুণ মার্কস দার্শনিক আর পরিণত মার্কস বৈজ্ঞানিক 'পলিটিক্যাল ইকনমিস্ট'—তাঁরাও দ্বান্দ্বিক বিচারপদ্ধতি থেকে বিচ্যুত। ব্যক্তি ও স্বাধীনতার দার্শনিক নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামাতে চান না, তাঁরা তরুণ মার্কস-এর রচনা দূরকল্পী জ্ঞানে এড়িয়ে চলেন। আর যাঁরা মার্কসবাদের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের শক্তিকে ভয় পান, তাঁরা পরিণত মার্কসকে তাচ্ছিল্য করেন। যুক্তিবিচারে এই দুই দলের বক্তব্যই অচল ও অসম্পূর্ণ। 'ম্যানাসক্রিপটস্'-এর প্রথম লাইন দুটিই নির্ভুলভাবে প্রমাণ করে যে তরুণ বয়সেই মার্কস 'পলিটিক্যাল ইকনমি'তে পরিণত জ্ঞানলাভ করেছেন।[২২] 'ম্যানাসক্রিপটস্'-এর পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় মার্কস তদানীন্তন 'পলিটিক্যাল ইকনমি'কে যেমন বাতিল করতে, তেমনি চেয়েছিলেন ভাববাদী দর্শনের মূলোচ্ছেদ করতে। কাজেই দার্শনিক আর বৈজ্ঞানিকের বিরোধ-তত্ত্ব আমদানি করে—দুই মার্কস-এর পরিকল্পনা জিইয়ে রাখা যায় না। মার্কস দার্শনিকের দৃষ্টিকোণ থেকে দর্শনের বিচার করেননি ; বিচার করেছেন ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে। মানুষের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে শিল্পী-সাহিত্যিকের চিন্তাধারা মিশিয়ে তিনি তাঁর নতুন প্র্যাক্‌টিকাল দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছেন। তেমনি 'পলিটিক্যাল ইকনমি'র ক্ষেত্রেও মানুষের জীবনের সর্বাঙ্গীন অভিজ্ঞতাকে তিনি কাজে লাগিয়েছেন। তাই তাঁর রচনায় সহজ স্বচ্ছন্দভাবে শেক্‌সপীয়র-গ্যেটে-বালজাক প্রবেশ করতে পেরেছেন। 'ম্যানাসক্রিপটস্' রচনায়, ও 'ক্যাপিট্যাল' রচনায় তিনি পলিটিক্যাল ইকনমিতে সমান আগ্রহ দেখিয়েছেন। আবার অন্যদিকে বলা চলে যে, এই দুই পর্বেই তিনি 'দর্শন' সম্পর্কে সমান অনুসন্ধিৎসা প্রকাশ করেছেন ; অবশ্য এ 'দর্শন' তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্নতর। তরুণ মার্কস থেকে পরিণত মার্কস-এ উত্তরণের পথে কোথাও ছেদ পড়েনি।[২৩]

২২। "Wages are determined through the antagonistic struggle between capitalist and worker. Victory goes necessarily to the capitalist." (Marx : Manuscripts 1844 : Moscow, 1961 ; Pp 20)

২৩। "The people who deny this tend to be either those who crudely identify 'human' with 'economic', or those who, in the name of mystifying psychological abstractions, treat with extreme scepticism the relevance of social-economic measures to the solution of human problem" (Mészáros : Theory of Alienation : Pp 232)

শ্রমবিচ্ছিন্নতা সবরকমের বিচ্ছিন্নতার মূল, এই তত্ত্ব উপলব্ধির মধ্যে পরিণত মার্কস-এর মহীরূহের অঙ্কুর নিহিত রয়েছে। 'ম্যানাসক্রিপটস্'-উত্তর সব রচনার কেন্দ্রবিন্দুতে বিচ্ছিন্নতার প্রভাব অনুভূত। পরবর্তী রচনায় 'বিচ্ছিন্নতা' শব্দটি অনেক সময় হয়তো ব্যবহৃত হয়নি ; তার মানে এই নয় যে, বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব পরিত্যক্ত হয়েছে।[২৪]

মার্কসীয় বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্ব বিশ শতকের বুর্জোয়া দার্শনিক-শিল্পী-সাহিত্যিক তাঁদের নিজস্ব শর্তে গ্রহণ করেছেন। হাইডেগার বলেছেন যে, মার্কস-এর ইতিহাসের ধারণা অন্য সব ধারণার তুলনায় শ্রেষ্ঠ, কেননা তিনি আধুনিক মানুষের বিচ্ছিন্নতার কথা জানেন।[২৫] হাইডেগার অস্তিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে মার্কসকে দেখতে চেয়েছেন। অনেক মার্কসবাদী, আগেই বলেছি, অস্তিবাদী ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত। বিচ্ছিন্নতা থেকে মানুষের মুক্তি নেই, হেগেলের এই মত মার্কস কর্তৃক অগ্রাহ্য ও পরিত্যক্ত হয়েছে ; কিন্তু বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা হেগেলের এই একটি মতকেই আঁকড়ে ধরেছেন অভ্রান্ত মনে করে। অস্তিবাদীরা সময় বিশেষে হেগেলকে নিজেদের রহস্যময় মতবাদের সমর্থনে দাঁড় করিয়েছেন।

২৪। One must distinguish between conception and presentation. It is simply unthinkable to conceive the Marxian vision without this fundamental concept of alienation. But once it is conceived in its broadest outline—in the Manuscripts—it becomes possible to let the general term "recede" in the presentation (Ibid Pp 238)

২৫। "Because Marx, through his experience of the alienation of modern man, is aware of a fundamental dimension of history, the Marxist view of history is superior to all other views.' (Pp 243). হাইডেগারের এই উক্তি গ্রন্থকার ৩৩ নং Soviet Survey (July—Sept. 1960) Pp 88 থেকে নিয়েছেন। এই মতের খণ্ডনে গ্রন্থকার মন্তব্য করেছেন : "Needless to say, Marx did not experience alienation as 'the alienation of modern man', but as the alienation of man in capitalist society. Nor did he look upon alienation as a 'fundamental dimension of history' but as the central issue of a given phase of history. Heidegger's interpretation of Marx's conception of alienation is thus revealing not about Marx, but about his own very different approach to the same issue,"

সাফ প্রমুখ তাত্ত্বিকরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্নতার বিলোপ না দেখে মার্কস-এর বিচ্ছিন্নতা অবসানের ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। মার্কসীয় 'ট্রান্সেনডেন্স্' একটা 'মিথ' বলে আজ অনেকে মনে করছেন। কারণ কি ?

নিপীড়িত মানুষ 'ইওটোপিয়ার' স্বপ্ন দেখে থাকে। স্বর্গরাজ্য বা ইওটোপিয়া আনার একমাত্র শর্ত হলো ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপ-সাধন; অনেকে এইরকম ধারণা নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে থাকেন। শিল্পবাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্ত হলেই স্বর্গরাজ্য গড়ে ওঠে না। বিপ্লব পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্র ও প্রতিষ্ঠানগুলোকে একেবারে গুঁড়িয়ে ফেলেনি সোভিয়েতে। পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্র আবার অনেক ক্ষেত্রে বিপ্লব ছাড়াই করায়ত্ত হয়েছে। কাজেই সেসব দেশে বিচ্ছিন্নতার সম্পূর্ণ নিরসন ঘটেনি, স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি বলে বিলাপ করা চলে না। আমার মনে হয় না, কেবলমাত্র সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সাহায্যে ব্যক্তি-সমাজ, পার্টিকেডার-এর বিচ্ছিন্নতা দূর করা যায়। পার্টি ও রাষ্ট্রের সংগঠনের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার বীজ নিহিত থাকতে পারে। ব্যক্তি-মানসিকতা ও আন্ত-র্মানবিক সম্পর্কের জটিলতা বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখতে অনেক সময় সাহায্য করে। রাজনীতি-অর্থনীতির চর্চা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যে-পরিমাণে চলে, মনস্তত্ত্বের চর্চা সে-পরিমাণে হয় না। নেতা-জনতা, শোষক-শোষিতের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক নির্ণয়ে বুর্জোয়া তাত্ত্বিকরা অতিমাত্রায় আগ্রহী; আবার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এইসব ব্যাপারে উৎসাহের অভাব। স্বর্গরাজ্য গড়ার স্বপ্নে বিভোর হলেই চলবে না, বিপ্লবী ভাবধারায় আবিষ্ট হলেই বিপ্লবোত্তর পরিবর্তনগুলো আপনা থেকে ঘটবে না; তার জন্যেও প্রয়োজন হবে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। কেবল মাত্র অর্থনীতির ক্ষেত্রে নয়। মানসিক-আত্মিক ক্ষেত্রের বৈপ্লবিক পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও পরিকল্পনাসাপেক্ষ।

মেসজারোস বিচ্ছিন্নতা বিলোপ বা 'ট্রানসেনডেনস'-এর প্রশ্নে বাস্তবধর্মী আলোচনার সূত্রপাত করেছেন। কিন্তু মনে হয় না যে, মার্কসবাদের বর্তমান সমস্যাগুলোর উপর যথেষ্ট আলোকপাত করতে পেরেছেন।

মানুষের প্রকৃতির মধ্যে, আত্মসচেতনতার মধ্যে বিচ্ছিন্নতা নিহিত আছে, ভাববাদীদের এই ভ্রান্ত ধারণা তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে খণ্ডন করেছেন। শ্রমোৎপন্ন বস্তুমাত্রই বিচ্ছিন্নতার জনক—একথা তিনি স্বীকার করেননি। বস্তু ও মানুষের গড়া প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য তিনি সহজভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটা বড় মেহগনি টেবিলের ওধারে বসে ম্যানেজার এধারে বসা কর্মচারীদের

থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন, কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতাবোধ টেবিলের জন্ম নয়, ম্যানেজারনির্ভর প্রতিষ্ঠানের জন্য। এই কথা বলেছেন গ্রন্থকার (পৃষ্ঠা ২৪৫)।

তিনি মনে করেন, প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা পদ্ধতির পরিবর্তন সম্ভব। তিনি সর্বপ্রকারে প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে নন। নয়াবামদের মতো 'এশটাব-লিশমেণ্ট এ্যালার্জি' তাঁর নেই। সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান ছাড়া কোনোরকম কাজ করা সম্ভব নয়। আর সংগঠন-প্রতিষ্ঠান থাকলেই তার একটা ফর্ম থাকবে, একটা পরিচালনাবিধি থাকবে, খানিকটা আমলাতান্ত্রিক নিয়মকানুন এসে যাবে।[২৬] আদর্শ প্রতিষ্ঠানের ধারণা স্বর্গরাজ্যের মতোই উদ্ভট। আদর্শ প্রতিষ্ঠানের জন্য আদর্শ মানুষের প্রয়োজন। সেরকম মানুষ আবিষ্কার করতে হবে—এমন এক জাতীয় মানুষ যাদের কাজকর্ম চাওয়া-পাওয়ার কোনো পরিবর্তন নেই, অথবা কাজকর্ম চাওয়া-পাওয়ার কোনো বালাই নেই।

তাহলে উপায় কি? এই জটিল সমস্যার কি সমাধান নেই? গ্রন্থকারের মতে, ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যেকার বিরোধ যতই কমিয়ে আনা যাক না কেন, বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা ন্যূনতম হলেও থেকেই যাবে।

গ্রন্থকার কিন্তু এইসব আলোচনার কোথাও রহস্যময়তা, অস্তিত্বের সমস্যা, নির্জ্জন প্রবণতা ইত্যাদি আমদানি করে বাস্তবের সমস্যাসঙ্কট এড়াতে চান না। তাঁর সঙ্গে সব ব্যাপারে একমতাবলম্বী না হয়েও—তাঁর দ্বান্দ্বিকবস্তুবাদী বিচার-পদ্ধতির জন্য তাঁর সঙ্গে বাদানুবাদ ও বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়া যায়। তিনি এই সমস্যার গুরুত্ব অনুধাবন করে সমাধানেরও ইঙ্গিত দিয়েছেন।[২৭]

বিচ্ছিন্নতার সম্ভাব্য কারণগুলো বিশ্লেষণ, যন্ত্র ও প্রতিষ্ঠান যে-মানুষের

২৬। But what the total abolition of human institutions would amount to is, paradoxically, not the abolition of alienation but its maximization in the form of total anarchy, and thus the abolition of humanness. "Humanness" implies the opposite of anarchy : order which, in human society, is inseparable from some organisation (Pp 245).

২৭। All these problems, nevertheless, are capable of a solution, though of course only of a dialectical one. In our assessment of the transcendence of alienation, it is vitally important to keep the "timeless" aspects of this problematics in their proper perspectives. Otherwise they can easily become ammunition for those who want to glorify capitalist alienation as a "tension inseparable de l'existence.—

(ব্যক্তি-মানুষ) জন্য এই উপলব্ধি, এবং ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সজ্ঞান বিচার ঃ এইভাবে বিচ্ছিন্নতাকে কমিয়ে আনা যায়। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত এটা আদৌ সম্ভব নয়। যন্ত্র-প্রতিষ্ঠান ধনতন্ত্রের আওতায় যে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে তার ফলেই বিচ্ছিন্নতার বিস্তার ঘটেছে। সমাজতন্ত্র এই রুগ্ন বৈশিষ্ট্য দূর করতে সক্ষম।[২৮]

বুর্জোয়া তাত্ত্বিকদের অপপ্রচারের শিকার আজ প্রগতিবাদী তরুণ। বিচ্ছিন্নতা যন্ত্রসভ্যতার ফল,—ফ্রম-ফিশারের এই ধরনের প্রচারে অনেকেই বিভ্রান্ত। সমাজতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতা ও ধনতন্ত্রের বিচ্ছিন্নতাকে এরা এক করে দেখছেন। কাজেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনায়করা বিচ্ছিন্নতা-তত্ত্বকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করছেন। মনে রাখা দরকার যে, ধনতন্ত্রে 'এ্যালিয়েনেশন রীইফিকেশন' চরমে উঠেছে যার ফলে মানবজাতির অস্তিত্বই বিপন্ন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা-সমস্যার ব্যাপকতা ও তীব্রতা অনেক কম। বিচ্ছিন্নতা তত্ত্বকে এড়িয়ে না গিয়ে, সমাজতান্ত্রিক দেশের তাত্ত্বিকদের উচিত সমস্যাকে (যতই লঘু ও সামান্য হোক) স্বীকার করে নিয়ে এর নিরসনের চেষ্টা করা। না হলে অ্যাডাম সাফ-হ্যাডম্যান-এর মতো অনেকেই বিভ্রান্ত হবেন, আর সার্ত্র-ফ্রম-ফিশারের দলের পাঠক-সংখ্যা ও প্রতিপত্তি বাড়তেই থাকবে।

২৮। Human instruments are not uncontrollable under capitalism because they are instruments······but because they are instruments—specific, reified second order mediations—of capitalism . As such they cannot possibly function except in a "reified" form ; if, that is, they control man instead of being controlled by him . It is, therefore, not their universal characteristics of being instruments that is directly involved in alienation but their specificity of being instruments of a certain type···Precisely because they are capitalistic second order mediations—the fetish character of commodity, exchange and money ; wage and labour ; antagonistic competition ; internal contradictions mediated by the bourgeois state ; the market ; the reification of culture ; etc—it is necessarily inherent in their "essence" of being "mechanism of control" that they must elude human control .That is why they must be radically superseded : "the expropriators must be expropriated ," the bourgeois state must be overthrown ; antagonistic competition, commodity production, wage labour, the market, money—fetishism must be eliminated ; the bourgeois hegemony of culture must be broken"···Pp 248-249.

তরমুজ

অসীম রায়

অন্ধকারে পাতা সরিয়ে ধবধবে সাদা তিননম্বরি ফুটবলে হাত দেয় গোপাল। এমনি নিষ্কলঙ্ক শ্বেত ফুটবলে তার ক্ষেত ভর্তি। আজ ভোরে গোপাল গুনেছে। অন্তত শ চারেক। পাথুরে বেলেমাটিতে থেবড়ে বসে পড়ে গোপাল। যদি অর্ধেকও বাঁচে তার মানে হেসে-খেলে হাজার টাকা। আর পনেরোটা দিনের ধৈর্য, তারপর ক্ষেতে বসে-বসে সে হাজার টাকার মালিক।

গোপালের জমি পশ্চিম থেকে পুবে ঢাল। বেলেমাটি জলের অভাবে সারা গ্রীষ্ম হাঁ হাঁ করে আর জল নামলে জমির সমস্ত সার পদার্থ জলের সঙ্গে চুইয়ে চুইয়ে নিচের পাথরে নালায়। নালার ধারে তালগাছের সারিই তার ক্ষেতে সবচেয়ে প্রাণবন্ত। তালপাখা বেচে গতবছর তিরিশ টাকা পেয়েছে গোপাল। তার এতবড় জমির একমাত্র ভবিষ্যৎ তালবন হাওয়ায় মড় মড় করে ওঠে। আর সেদিক থেকে জোর করে তার চোখ-কান ফিরিয়ে গোপাল তার নতুন স্বপ্নের দিকে হাত বাড়ায়।

তার কাঁধের কাছেই ঢাল খাড়া। জমি ভাঙছে। জলের অসংখ্য তরল গৈরিক জিভ সারা বর্ষা নেচে-নেচে কুরে-কুরে খেয়েছে তার মাটি, তার ভবিষ্যৎ। পিতৃবিয়োগের পর সে দশবছরের দর্শক এই সাম্বৎসরিক বিপর্যয়ের। দু ফার্লং দূরে 'নীলমাধব লজে' কলকাতা থেকে যে আর্টিস্ট এসেছিল সে রোজ স্কেচ্ করতে আসত গোপালের ক্ষেতে। তারপর জলের ধারায় ক্ষতবিক্ষত এই গৈরিক বিপর্যয়ের ছবি যখন দিল্লী থেকে প্রাইজ পেয়ে হিন্দি খবরের কাগজেও আত্মপ্রকাশিত তখন সে আনন্দ-সংবাদের বিষয়বস্তু চিনে নিতে বিলম্ব হয়নি গোপালের। জলে তার ক্ষেত ভেসে নালায় পড়ছে, তার কলমের আম শুকিয়েছে, ভুট্টার জমিতে দুর্মূল্য সার ভেসে গেছে আর সেই নিরক্ত জমির দেহে পিতল-কাঁসার বাসন বেচা টাকার সারেও আলুর শিকড় জ্বলে গেছে।

সমস্ত আকাশ তারায় জলজল করে। গোপাল চড়াই ভেঙে ওপরে উঠতে থাকে। জমির পাশেই বাবুডি গাঁয়ে রাস্তার মুখে অন্ধকার শিশুগাছ জুড়ে

জলপ্রপাতের শব্দ। সমস্ত মাঠভর্তি হাওয়া আর মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের ঝলক আজ সন্ধ্যের পর থেকেই। যদিও আকাশভর্তি তারা তবু পূবদিকের ত্রিকুটের গায় ক্রমাগত আলো খেলে লাইটহাউসের আলোর যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তিতে। গোপাল সাবধানে পূবের দিকে চায়। তার তামাটে শুকনো মুখে বিজয়ীর হাসি এই বিদ্যুতের আভায় স্পষ্ট। দশবছরের পরাক্রম এই রোদে জলে ব্যর্থ হয়নি। লাঙলের ফালে তার জমি প্রসবিনী হয়নি কিন্তু তার হাড় পাথর বানিয়েছে, তার দম বাড়িয়েছে এই প্রবল খরা। পাথরগাড়া পোস্ট অফিসের পোস্ট মাস্টারের জীবনে কোনো চ্যালেঞ্জ ছিল না। এই খরায় পোড়া আর জলে চাটা জমি তার জীবনে এনেছে সেই চ্যালেঞ্জ।

তার ধানিজমি শুরু হওয়ার আগেই গোপাল থমকে দাঁড়ায়। গন্ধে ভরা দুটো পনেরো কিলো বল আলের গায়েই। এরকম একখানা তৈরি বল আজ সে বেচেছে আট টাকায়। এ-দুটো কাল বেচবে। গোপাল তার স্বপ্নের পাশে ধপ্ করে বসে পড়ে। এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখে তার সমস্ত মন এই হাওয়ার সাথে এই গরমের রাতে নেচে বেড়ায়। আনন্দে জন্তুরমতো হুঁকার দিয়ে ওঠে যদিও মাঠে ধান নেই আর তার স্বপ্ন এখনও অচরিতার্থ। তবু সে পাহারা দিচ্ছে তার ন্যাড়া জমির তালবন নয়, ক্ষেতে সাজানো হাজার টাকার পাহারাদার সে। আর হাজার টাকা মানে? অন্তত দশট্রাক গোবরসার—আশি টাকা প্রতি খেপে আটশো টাকা সবশুদ্ধ আর তার নিজের মজুরির উপরি দুশো টাকার বাঁধ। তার মানে আর কয়েকটা দিনের মধ্যেই যে তার গাঁয়ের পয়লা নম্বর চাষী যে বালিতে ধান ছিটিয়ে বা মজুর ঠকিয়ে চাষ করে না, যার বাহুতে বিপ্লব, পরিবর্তন।

আবার ঝরঝর করে জলের শব্দ শিশুগাছে। ধড়মড় করে একজোড়া ধেড়ে ইঁদুর চারহাত লম্বা কচি আমগাছটার গোড়া থেকে বেরিয়ে আবার অন্ধকারে মিশে যায়! গোয়ালের গায়ে বুনো আতারবন আর বেঁটে তেঁতুল গাছ দুটো থেকে চাপা ভারী ফুলের গন্ধ আসে। এই গরমের গন্ধ গোপাল ছেলেবেলা থেকে ভালোবাসে। এই ফল গাছের ফুলের গন্ধের সঙ্গে গোয়ালের গোবরচোনার গন্ধে বাতাস ভারী। এ-সময় গন্ধ মাটির এক শারীরিক উপস্থিতি সম্পর্কে গোপালকে সচেতন করে এসেছে বরাবর। শীতে গন্ধ মরে যায়। শীতকালে বাঙালি বাবুদের বাড়ির দেয়ালে বোগেনভিলিয়ার ঝাড় অযত্নেও জলে। কিন্তু সে-রঙ টানে না গোপালকে। গোপাল কিসের স্পর্শে তড়াক করে দাঁড়িয়ে ওঠে। এক গোটা

ইঁদুরের পরিবার তার গায়ের ওপর দিয়ে তার নিজের হাতে বসানো আমের কলম গাছগুলোর দিকে চলে যায়। তার উৎক্ষিপ্ত পাথরেও তাদের গতির ভঙ্গিমা সামান্য ত্বরান্বিত হবার লক্ষণ নেই। গোয়ালের ঘুমন্ত গোপালক বালকের পালে শহর থেকে কেনা দুটো বিলিতি ইঁদুরের কল থেকে কাটা ফলের গন্ধ আসে। ইঁদুরের হাবভাব দুর্জ্ঞেয়। তারা কি চায়, কি খায়, কেনই বা এ-ক্ষেত তাদের এত প্রিয় গোপাল তার দশবছরের অভিজ্ঞতাতেও বুঝে উঠতে পারেনি। কলমের আমগাছগুলোর গোড়া কাটবার প্রচণ্ড অধ্যবসায় ও একাগ্রতা থেকে তাদের মুখ ফেরাবার জন্যে গোপাল পাকা আম পেঁপে তার জমিতে যত্রতত্র ছিটিয়েছে; যেগুলো পরদিন কাকের খাদ্য। শহর থেকে কেনা ইঁদুর মারার ভয়ঙ্কর বিষ মাখান আটার গুলি তাদের আরও শ্রীবৃদ্ধির কারণ। দলে-দঙ্গলে ইঁদুর তার ক্ষেতে বাসা বাঁধছে, বংশবৃদ্ধি করছে। এমনকি চাঁদনি রাতে তাদের তালগাছে উঠে নৃত্য এবং গরুর পিঠে ভ্রমণের রিপোর্টও গোপাল পেয়েছে।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠছে। রাত একটা হবে। এ-রাস্তা ধরেই আগাইয়া গাঁয়ের পথ। দুপাশে ইউক্যালিপটাস্ সদ্য চাঁদের কিরণস্নিগ্ধ। বাতাস প্রায় বন্ধ। শিশু গাছে জলপ্রপাতের শব্দ আর নেই। নালা থেকে গোপালের তালবন একবার মড়মড় করেই চুপ। গোপাল এবার মৃত্যুর পথ ধরে হাঁটতে থাকে। মৃত্যুর পথ ছাড়া আর কি বলা যায়! অথচ ছেলেবেলায় এ-রাস্তা দিয়ে হাঁটতে গোপালদের গাঁয়ের লোকদের বাধত। রতন ব্যানার্জির বাড়ির গেটে তখন হ্যাজাকের আলো কলের গান বাজছে, 'যমুনা পুলিনে কুসুমকাননে বাঁশরী বাজাব রাধা রাধা,' মাংসের গন্ধে বাতাস ভারী, কেরোসিন টিনে-টিনে এসেছে কই-মাগুর, পাশের বাড়ির 'আদিত্য লজে' চন্দ্রগুপ্তের রিহার্সাল চলছে। সেবার যুদ্ধের সময় যখন পাঁচ-ছটা ক্ষুদে জাপানী-বোমায় পাঁচ-ছটা লোক মারা গেল এবং গোটা কলকাতা শহর খালি হয়ে গেল তখন এই সাঁওতাল পরগণায় বাঙালি বাবুদের প্রতাপ কয়েক বছরের জন্যে আগুনের ফুলকি কেটে আবার আঁধারে মিলাল। অমিয়বাবু ক্যানসার, সান্যালবাবুর বড়দা হার্ট, মিত্তিরদের ছোট ছেলে যে শেষপর্যন্ত এ-অঞ্চলের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ রাখত সেও বছরপাঁচেক আগে তাদের দমদমের বাড়িতে বিষ খেয়ে বিগত। যে-বাবুদা সমাজ-সংসার মিছে সব করে ফিল্মের অভিনেত্রীর সঙ্গে পালিয়ে যশস্বী হয়েছিলেন তিনিও গতায়ু। এখন কেবল 'লীলালয়ের' পাগলি বুড়ি চেঁচাচ্ছে ছাতে উঠে। তার একমাত্র ছেলে টুনু আমেরিকা না ক্যানাডায় ইঞ্জিনিয়ার।

বাড়িগুলোর সামনে ইউক্যালিপটাসগুলো তাদের নীলাভ সৌন্দর্যে স্থির। গোপাল উঁকি মেরে দেখে ব্যানার্জি বাড়ির আর দুটো দরজা খসেছে। খুব যত্নে প্ল্যান করে তৈরি বাড়িখানার চেহারা এখন কিম্ভুত। জানলা-দরজাগুলো একটার পর একটা অন্তর্হিত হওয়ায় সারা গায়ে ফাঁক বুজানো ইটের উচু-নিচু পাঁচিলে যেন কতগুলো বন্ধ বাক্সের জমায়েত। গোপাল আর একটু নিচু হয়ে দেখলে, যা ভেবেছিল তাই। এবার কাঠের কড়ি-বরগাগুলো সরাবার সরঞ্জাম চলছে। কাজ অর্ধেক সম্পন্ন। কোনো তাড়াহুড়ো নেই। কারণ বাধা দেবার কেউ নেই, বাধা দেবার কোনো মানেও নেই। এ-অঞ্চলের স্থানীয় বাসিন্দারা নিশ্চিত যারা এসেছিল একদা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্যে; বিশ্রামের জন্যে; ফাঁকায় 'নিশ্বাস নেবার জন্যে তারা আর কোনোদিন আসবে না। তাদের জামানা শেষ, তাদের আর পুনরাবৃত্তি নাই। তাই সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়ার জাঁদরেল অফিসার ব্যানার্জি বাড়ির মোজেইক রক এখন ছাগলনাদিতে ভর্তি। আর মাস-দুয়েকের মধ্যেই কড়ি-বরগা শূন্য ছাত ধ্বসবে, খরায় ফাটবে শোওয়ার ঘরের কালো মুক্তাসদৃশ ইটালিয়ান মার্বেল মেঝে।

এই মৃত্যুর পথের পরেই আমের পথ। পথের একদিক জুড়ে বাগানগুলোয় ঝাড়াল কলমের অন্ধকার ত্রিভুজ, কোনোটা আঁধার বৃত্ত। তারার আলোতেও মালুম হয় বোঁটায়-বোঁটায় দোলায়িত ল্যাংড়া, বোম্বাই, অ্যাল্‌ফানসো। এই আম নিয়ে বাঙালি বাবুদের পারিবারিক নাটকের অন্ত নেই। এ-পথ মৃত্যুর পথ নয়, কিন্তু এ-পথ বিবাদের, অশান্তির। সামনে বাড়িটায় সাহাবাবুদের ছোটকর্তা এসেছেন মেজবাবু আসবার আগেই যদিও এখন আমে সামান্য হলুদের আভামাত্র। এবং বাবুর আবির্ভাবের আগেই সপরিবার মালির তৎপরতায় বাগান অর্ধেক শূন্য। যাঁদের সামান্য টান নেই এ-অঞ্চলের জন্যে তাঁরাও গ্রীষ্মের দাবদাহে দুদিনের জন্যে আসেন আম বেচার টানে। এ-পরিস্থিতি গোপালের কাছে এক করুণ কাহিনী, একেবারে বিরক্তির কারণও যে নয় এমন নয়। সাহাদের পাশের বাড়ির নাতি আসে তার হল্লাপার্টি নিয়ে শীতকালে। এখন গ্রীষ্মে খাটিয়া পেতে বসে আম সারা সকাল বস্তাবন্দী করিয়ে ফেরে সন্ধের ট্রেনে। আমগাছ-গুলো কেটে ফেলে পাম্প বসিয়ে রবিশস্যের চাষ দিলে কাজ দিত।

সমস্ত আকাশ আবার থম্‌থমে। বাতাস বন্ধ। গোপাল ভয়ে ভয়ে আকাশের দিকে চায়, পুবদিকে অন্ধকার আকাশে অতিকায় জন্তুর মতো ঘাড় বাঁকিয়ে ত্রিকূট। আরও নিচে দিগন্তে পাহাড়ের ঘোড়ার খুরের মাথায় যান্ত্রিক

পুনরাবৃত্তিতে বিদ্যুতের চমকানি। কিন্তু সামনে পশ্চিমে প্রসারিত টিলায় হাটিয়ার প্রকাণ্ড অশথতলায় মাথায় আকাশ জলজ্বলে তারায়, সপ্তর্ষি জিজ্ঞাসায় জলন্ত। আদিগন্ত পশ্চিম দশমাইল ফাঁকা, বৃক্ষহীন। সরকারী পয়সা মারার ফিকিরে যে কটা বহুবিজ্ঞাপিত বাঁধ বাঁধা হয়েছিল তারই হলদে পাঁকের পাশে দুচারটে খেজুরগাছের ঝোপ। অন্ধকার চোখসওয়া হলে চোখে পড়ে দশমাইল দূরে জসিডি স্টেশনের আলো ডিগ্‌রিয়া পাহাড়ের পাদদেশে। তাল খেজুরের ফাঁকে-ফাঁকে বহুদূরের সেই দীপান্বিতার দিকে চেয়ে একবার গা মোড়ামুড়ি দেয় গোপাল। ভোরে ক্ষেতের কাজ, তারপর কুসমার পথে পাঁচমাইল সাইকেলে সাঁওতাল গ্রাম পেরিয়ে পাথরগাড়া পোস্টঅফিস। সেখান থেকে ফিরে লোড়িয়া গাঁয়ে তার বাড়িতে পারিবারিক কর্তব্য সেরে আবার রাত এগারোটা বাজতে-না-বাজতেই মাঠের আল ভেঙে লণ্ঠন হাতে তার ক্ষেতে প্রবেশ। আর সারারাত ধরে তার জমি আর খোলা আকাশের সঙ্গে কথাবার্তা।

ফসল পাহারা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে এই ক্ষেতের সঙ্গে আকাশের সঙ্গে মিশে থাকা তার নৈশজীবন আরও বেশি জীবন্ত লাগে গোপালের কাছে। অনেক সময় ফসল থাকে না ক্ষেতে। কিন্তু গ্রাম থেকে পালিয়ে আসে গোপাল তার ক্ষেতে। গোয়ালের পাশে ধানসিদ্ধ করার বড়-বড় দুটো মাটির চুল্লির গায়েই তার চালায় শুয়ে-শুয়ে প্রহর গোনে। তার জীবনের সবচেয়ে কর্মিষ্ঠ কাল ঢেলেছে সে এই ক্ষেতের পেছনে। এর পাশে তার পোস্টমাস্টারের জীবন অনেক ক্ষীণ. উদাসীন, প্রায় ফাঁকির নামান্তর। আর গোপাল দেখেছে, ফাঁকিতে তার শুধু মন ফাঁকা থাকে তা নয়, তার শরীর খারাপ হয়ে পড়ে। এই রোদজলা জমির আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধনে তার ছেলেবেলার ফর্সা রঙ এখন তার জমির মতোই কড়া তামাটে। আর প্রত্যেক গ্রীষ্মের দীপ্র খরা যেমন তার পেশী ঘাড় শুকিয়েছে, তার রগের দড়া পাকিয়েছে তেমনি তার হাড়ের গিঁঠে গিঁঠে এনেছে ভারবাহী প্রাণীর সহিষ্ণুতা। দশবছর আগে তার মধ্যবিত্ত সংবেদনশীল হাতের তালু লাঙল ধরেছে আলতোভাবে, হাঁফ ধরেছে সহজেই, রোদে মাথা ধরলে অ্যাসপিরিন খাবে কিনা ভেবেছে। এখন লাঙল রোদ-জল তার হাতে-পিঠে তাপ-অতাপশূন্য মুখের চামড়ায় কেটে বসে গিয়ে খাঁজ বানিয়েছে অজস্র। চোখ লাল টকটকে হতে-হতে এখন নীলচে স্বচ্ছ জলের মতো পরিষ্কার ভাবহীন। আর হাতের আঙুলগুলো পায়ের আঙুলগুলো সে এখন নিজেই চিনতে পারে না। এগুলো এখন পাথুরে মাটিতে নিড়ানির মতো ব্যবহার করা

চলে। বরং লিখতে এখন আঙুলগুলোর আলস্য, জুতো পরলে পায়ের আঙুলের অস্থিরতা।

আকাশ নির্মেঘ। কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ পাংশুবর্ণ। দুটো শেয়াল একই সঙ্গে ডাকতে আরম্ভ করে এবং সঙ্গে-সঙ্গে কোকিল ডেকে ওঠে। কোকিল আর শেয়ালের বিপরীত স্বর এখানে ঠিক বিপরীত নয়, নিঃশব্দ রাত্রির ঐকতান। এবং সেই সঙ্গীত শুরু হতে না হতেই একজোড়া চখা-চখী টি-টি-টি করে ডেকে ওঠে আর নিচু হয়ে ঘুরপাক খায়। এখানে গরম যতো বাড়ে মাঠে-মাঠে ততো বিয়ের ঢাক বাজে আর তেঁতুল-পেয়ারা-আতা-নিম ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী আর ফলের গাছে ফুল ফোটবার সঙ্গে-সঙ্গে অজস্র পাখি বাসা বাঁধে, ডিম পাড়ে। বন্দুক লাইসেন্স দেবার সময় গরমে কয়েকমাস নিষিদ্ধ শিকারের শর্ত গোপালের মনে পড়ে। টিলার মাথায় একচিলতে ঘোলা জল চাঁদের ম্লান আলোয় ঝিকিয়ে ওঠে। পাশের ঝোপের পাখি দুটো ডিম পেড়েছে অথবা টিলার ঢালে লতা-গুল্মের আড়ালে তাদের বাসা। জমির গা ঘেঁষে ঘেঁষে পাক খেয়ে ডাকতে-ডাকতে অনেক ওপরে উঠে যায় আবার নেমে আসে। কলকাতার বাঘা এটর্নি দত্তবাবুর বাড়ির পাঁচিলের ফোকর দিয়ে একজোড়া শেয়াল বেরিয়ে যায়। দত্তবাবু পুজোর চারদিন আসতেন। বাড়ি থেকে হাটিয়া পর্যন্ত রাস্তার অর্ধেকটা যেখানে চিৎকাঠ গাঁয়ের দিকে মোড় নিয়েছে সেটুকু পাকা রাস্তায় ঘিয়েরঙের গরদের পাঞ্জাবী পরা তাঁর পাকা আমের মতো শরীরখানা এদিক-ওদিক করতে দেখা যেত, পেছনে খানিক দূরে চাকর। বছরতিনেক হলো দেহরক্ষা করেছেন। তারপর থেকে চারপাশে ইউক্যালিপ্টাস্ আঁটা মার্বেল মোজেইক সুইমিংপুল টেনিস কোর্ট খচিত তাঁর প্রাসাদ ও বাগান এখন রাখাল-বালকদের ক্রীড়াক্ষেত্র। গোপাল আন্দাজ করে আর বছরপাঁচ-ছয়ের মধ্যে এ-প্রাসাদের দরজা-জানালা পাশের গাঁয়ের কোনো বর্ধিষ্ণু গোয়ালার বাড়িতে শোভা পাবে। দত্তদের বাড়ির পাঁচিলের গায়েই সারা গা-ভর্তি এঁচড় এঁটে দুটো কাঁঠালগাছ। কাঁঠালগাছের সঙ্গে বরাবর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ করে গোপাল। এ-সময় তাদের লোড়িয়া গাঁয়ে কাঁঠাল প্রধান খাদ্য। আর মহুয়ায় তেল উঠছে সম্প্রতি। মহুয়ার তেলে ভাজা এঁচড়ের কোয়ার পকুড়ি তার ছেলেবেলার অন্যতম স্মৃতি। রাস্তার বাঁক থেকে একটানা ক্যাঁচরক্যাঁচ আওয়াজ আসছিল। একসার গরুর গাড়ি চলেছে শহরে বিড়ির পাতার বস্তায় টলমল করতে-করতে। পেছনের গাড়িদুটো ভর্তি কাঁঠাল। একজন বাদে সবকটা গাড়োয়ানই ঘুমন্ত। শহরে পৌছতে ভোর।

একফোঁটা হাওয়া নেই। আম-কাঁঠাল-তেঁতুল-খেজুর-শিশু-ইউক্যালিপ্টাসের একটা পাতাও নড়ে না। গোপাল ফেরে। তার নিয়মমাফিক নৈশ পরিক্রমার শেষ সীমানায় এসে গেছে। এরপর গোয়ালাদের গ্রাম। রাস্তার ওপরেই তাদের খাটাল-উপ্‌চানো মোষের পাল। ফিরতে-ফিরতে আবার পশ্চিমে নীলের মধ্যে ডিগ্‌রিয়ার নীল রেখার দিকে চেয়ে-চেয়ে গোপাল অস্থিরতা বোধ করে। এই খোয়াই আর টিলার গায়ের পাথুরে মাটি আঁচড়ে চাষ করার বদলে রাস্তার ধারে-ধারে হলুদ টিনে বিজ্ঞাপিত সরকারী লঘু সিচাইয়ের ঠিকেদারিতে আরও পয়সা আসত। আশেপাশে অন্তত পাঁচ-ছটা পরিকল্পনা এখন গ্রামবাসীদের জল-শৌচের ডোবা। এরকম দুটো পরিকল্পনার অফারও এসেছিল। হাজার পাঁচ-ছ টাকা খিঁচে নেওয়া যেত। গ্রামবাসীদের অভিশাপ টাটা রোদে কুড়িয়েও এই জলসেচের প্রহসনে সে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হতো। তার মা, তার স্ত্রী, তার জ্ঞাতিভাইদের উপদেশ অগ্রাহ্য করে গোপাল এক ডন্‌ কুইক্সোট হয়ে বসে আছে। তার উন্নত পদ্ধতিতে চাষ এখন তার গাঁয়ে অন্যতম ঠাট্টা। সে ঠাট্টা প্রকাশ্যে অশ্রুত থাকলেও তার তীর্যক ফলা অপ্রকাশ্যে প্রায়শ তাকে আহত করে। তার ভুট্টা তাকে ভাসিয়েছে, আলু নাকাল করেছে, কপি-বেগুন-ঢেড়স ফুল আর কুঁড়িতে অপর্যাপ্ত আত্মপ্রকাশ করে অদৃশ্য। কিন্তু গোপাল তার কোমরবাঁধ খোলেনি। এই সমস্ত ব্যর্থতার প্রয়োজন ছিল। তাতে আগামী দিনের সাফল্যের বৈপরীত্যে সঞ্জীবিত হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। পোকা-খরা-সারের অভাব এই প্রত্যেক বিপত্তি সে কাটিয়ে উঠেছে। পনেরো দিনও নয়, বোধহয় দিন-দশেকের মধ্যেই পয়লা কিস্তির ফলগুলো তৈরি হয়ে যাবে। তখন সে দেখে নেবে বিদ্রূপ কেমনভাবে ফিরিয়ে দিতে হয়। তার একমাত্র ভাবনা, সাফল্য যেন তাকে দুর্বিনীত না করে। কারুর সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই, হাতে টাকা আসবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে জমির চাহিদা মেটাবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠবে। ট্রাকের পর ট্রাক সার ঢালবে তার জমিতে। গাঁয়ের শিশুরা ভিড় করে দেখবে, যারা তার জমির আকর্ষণকে নেশাখোরের খোঁয়াড় বলে বর্ণনা দিত তারা তাদের টিপ্পনীগুলো গিলে ফেলে সার দিয়ে দাঁড়াবে। যে-বিপ্লবের জন্যে সে কাজ করে যাচ্ছে সে বিপ্লব ঘটছে ঘটবে। এই বালি আর পাথরে ভুট্টা গম আর আলুর ক্ষেতের জমাট শ্যামলতা আসন্ন।

দূরের আমবনের মাথা সামান্য দুলতে থাকে। দু-চারটে পাতা নড়ে। দত্তবাবুর পাঁচিলের গা দিয়ে আবার খস খস শব্দ। গোটা এক তিতির পরিবার

ছানাপোনা সমেত গেট গলিয়ে বাগানে ঢোকে। সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া গোপালের মুখে লাগে। ঠাণ্ডা কেন? কোথাও আশেপাশে কি বৃষ্টি হচ্ছে? কিন্তু আকাশ তো নির্মেঘ, তারারা তেমনি জ্বলজ্বলে বরং বিদ্যুৎ কম্পন এখন আর ততো ঘন ঘন নয়। এখানকার স্থানমাহাত্ম্য সম্পর্কে দত্তবাবু সজাগ ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিহারে উচ্চপদস্থ মন্ত্রীকর্মচারীদের যোগাযোগ ছিল বিলক্ষণ। তবু এ-অঞ্চলের রাস্তা-ঘাট উন্নতি সম্পর্কে তাঁর ঔদাসীন্য ছিল বরাবর। গোপালকে একদিন ডেকে বলেছিলেন, রাস্তাঘাট মানেই বাস, ঘনবসতি, নোংরা, খোলা ড্রেন, খাটা পায়খানা, লালপতাকা, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। আর দত্তবাবুর সঙ্গে তার জীবনযাত্রার সামান্য মিল না থাকলেও গোপালের মনে হয়েছে রাস্তাঘাট আর ইলেক্ট্রিসিটি মানেই এই বিশাল আকাশের মৃত্যু, এই অন্ধকারের মৃত্যু, মানুষের পরিশ্রমের তার সততার মৃত্যু। শোনা যায়, এটর্নিবাবু লোক সুবিধের ছিলেন না কিন্তু তাঁর কথা গোপালের মনে প্রতিধ্বনি তুলেছিল। দত্তবাবুর ইউক্যালিপ্টাস আঁটা প্রাসাদের পাশ দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে গোপাল ভাবে যত শীঘ্র এ-বাড়ির মার্বেল মোজেইকের শোবার-বসার ঘরে চাঁদের আলো এসে পড়ে ততোই ভালো। গাঁয়ের মানুষকে শহর ছিবড়ে বানিয়েছে, শহরের লোকজন থেকে যত দূর থাকা যায় ততোই মঙ্গল। উন্নতির নামে, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের নামে শহরের লোক গাঁয়ের মানুষকে ফোড়ে বানিয়েছে, তাদের আরামের তোষাখানার বই বানিয়েছে। শিক্ষার নামে সরকারী পয়সা ধ্বংস করে টেরিলিনের সার্ট-প্যাণ্ট পরা শ্রমবিমুখ মজাসন্ধানী বাঁদরে পরিণত করেছে গাঁয়ের তরুণ সমাজকে। তার গাঁয়ের তরুণদের চেহারা গোপালের বেদনার কারণ। তবে এ-অঞ্চলের শুদ্ধতা এখনও কিছুটা সংরক্ষিত। পাঁচ-ছ মাইল দূরের শহর বাদ দিলে আশে-পাশে মাইলের-পর-মাইল সিনেমাক্যান্সার মুক্ত। গোপালের মতে শহরের একান্ত উদ্দেশ্যহীনতা এমনভাবে তাদের লোড়িয়ার জীবনে ছাপ ফেলেছে যে চাষ-বাসের উন্নতি শুধু বিজ্ঞাপন আর প্রচারে পর্যবসিত। এখানকার তরুণদের সাত-রাজার ধন একটি সাইকেল। গাঁয়ের পথে-পথে শয়ে-শয়ে সাইকেল। খালি যাদের দুধের ব্যবসা তাদের মনে-মনে খানিকটা শ্রদ্ধা করে গোপাল কারণ গাঁয়ের সঙ্গে সম্পর্ক তাদের এখনও অচ্ছেদ্য। এখনও টেম্পু ট্রাক বাস চালু না হওয়ায় পাঁচ-দশ মাইল বাঁকে করে দুধ যায় শহরে। আর গোরু-মোষ পালনের সারাবছরব্যাপী এক জীবন্ত রূপ আছে যা শুধু ন্যাড়া জমিতে ধান ছিটানো কিংবা ধানকাটার মতো সাময়িক নয়। জমিকে

আজ আরও জীবন্ত করে তুলতে হবে—অন্ধকারে চষা-ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গোপাল ভাবে তাহলেই বোধহয় মানুষের এই হন্যে হয়ে শহরে ছোটার নিয়তি রোধকরা সম্ভব। তাহলেই এই আকাশ ভর্তি তারা আর অন্ধকার, চষা মাটির গন্ধ, ফলের গাছে গরমের ফুল, অজস্র পাখির ডাক, মাঠে-ঘাটে বর্ষার লাল জলের সরব উল্লাস, বর্ষায় সারারাতব্যাপী ঝিঁঝিঁর ঘুঙুর আর খরায় কর্মঠ মানুষের দীপ্র সহিষ্ণুতা আবার সঞ্জীবিত করবে আমাদের সময়। নিস্তব্ধ শিশুগাছটার কাছে এসে গোপাল নিঃশ্বাস ফেলে। সত্যিই তার কোনো খেদ নাই। তার এই জমির লড়াই শুধু জমির জন্যে নয়, তার নিজের জন্যেই অপরিহার্য। তবে মানুষ নিজে নিজের মুখ আয়নায় দেখে কতদিন বাঁচবে? এ আত্মাবলোকনের গুরুত্ব অসামান্য। কিন্তু সময় আসে যখন পরের চোখ দিয়েও নিজেকে দেখতে হয়, নিজের ও বাহিরের মধ্যে পাঁচিল ধীরে-ধীরে সরিয়ে ফেলতে হয়। আজ তাই তার ফসলের ভারী সাফল্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই দশবছরের কষ্ট, একলা মানুষের সংগ্রাম তাৎপর্য পাবে এই সাফল্যে। গোপালের অবস্থাটা অনেকখানি সেই সীরিয়াস লেখকের মতো যে অনেক বছর ধরে একলা পথপরিক্রমা করে ক্ষমতার শিখরে কিন্তু যার সম্ভাবনা এখন আরও মানুষের মধ্যে নিজেকে বিস্তারে, উদ্যোগপর্বের শেষে আর এক নতুন পর্বে।

তার ক্ষেতের ঢাল বেয়ে গোপাল নামতে থাকে। বছর চারপাঁচ-আগে লাগান কচি কাঁঠালগাছটার গুঁড়ি এঁচড়ে ভর্তি হয়ে এসেছে। চালের গায়ে নুয়ে পড়া বিরাট জামগাছটাও কষি-জামে ভর্তি। আবার ঠাণ্ডা হাওয়া দিতে শুরু করেছে। বোধহয় রাত দুটো। গোপালের পা শিরশির করে ওঠে হাওয়ায়। তারপর হঠাৎ ধড়পড় ধড়পড় শব্দ সারামাঠ জুড়ে। মাঠ জুড়ে অবিশ্রান্ত বাজনা বাজতে থাকে। আতঙ্কিত হয়ে আকাশের দিকে তাকায় গোপাল। নির্মেঘ তারাভরা বৃষ্টিহীন আকাশ থেকে পাথর বৃষ্টি হচ্ছে। গোপাল স্থানুর মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সাদা বরফের পাথর ঝাঁকে-ঝাঁকে নামে। কোনোটা লাফিয়ে উঠে ঢাল দিয়ে গড়াতে-গড়াতে নামতে থাকে, কোনোটা পড়েই স্থির। গোপালের সামনে সেই বাস্কেটবলের মতো তৈরি তরমুজটা আওয়াজ করে ফেটে যায়। গোপাল পাগলের মতো দৌড়ে নিজের শরীর আড়াল করে আর একটা মস্ত তরমুজ আগলে রাখে। সঙ্গে-সঙ্গে পিঠে প্রচণ্ড আঘাতে আর্তনাদ করে দৌড়তে থাকে। আতঙ্কেও তার স্মরণে আসে গতবছর এসময় পাথরগাড়ায় শিলাবৃষ্টিতে জনৈক

কাপুরুষ

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

১

এভাবে ক্রমান্বয় কটা রাত কেটে গেল। রাতে-রাতে তাঁকে হাঁটতে হচ্ছে। দিনের বেলা চারপাশে মনে হয় এক ভয়ঙ্কর ঘটনা ওৎ পেতে আছে। আহা রাতের এমন নিরিবিলি একভাব আছে সে জানত না। কীটপতঙ্গেরা ডাকছে। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক সে শুনতে পেত। বড়-বড় পাটগাছগুলো মাথার উপর। এবং সে রাতের শেষে যখনই কোনো বড় পাটের জমি পেত, সে সেখানে বসে পড়ত। চোখে-মুখে কি-যে ক্লান্তি, কি-যে অসহায় চোখ, যেন সূর্য কতকাল কিরণ দেয় না, সূর্য আকাশ থেকে পালিয়েছে, এবং এইসব জমিতে দিনমান সে শুয়ে থাকে। আঁচলে তার এক পুঁটলি চিড়া ছিল, এখন তাও নিঃশেষ হয়ে এসেছে। সামনে বড় সড়ক। সে জানে বড় সড়ক থেকে দশ ক্রোশের মতো পথ, সে-পথটা পার হলেই বর্ডার পেয়ে যাবে।

এখন রাতের শেষদিক, আর এগোনো উচিৎ মনে হচ্ছে না। সামনের বড় রাস্তা দিয়ে মিলিটারি কনভয় যেতে পারে। এতদিন যা ভয় ছিল, এখন ভয়টা তার অন্যরকমের। সে পালিয়ে-পালিয়ে এসেছে, তার বয়স আর কতো, এই ত্রিশের মতো হবে, সঙ্গে ছেলেটার বয়স সাত-আট। সে তার একমাত্র শেষ অবলম্বন নিয়ে নিশুতি রাতে বের হয়ে পড়েছে। গ্রামের কে-কোথায় আছে কেউ জানত না। কেবল সে-রাতে মাঝে-মাঝে একটা গাধার ডাক শোনা যেত। কারণ মনে হয় গাধাটার গায়ে একটা গোলা এসে পড়েছিল এবং তার একটা পা উড়ে গেছে। নিশুতি রাতে সব যখন স্তব্ধ, সব যখন আর ফিরে আসছে না, তখন বের হয়ে পড়াই একমাত্র উপায় ছিল। সে তার শিশুসন্তানকে নিয়ে বের হয়ে পড়েছিল। তখন সেই নিস্তব্ধ রাত্রির অন্ধকার ভেদ করে গাধার ডাকটা বড় বেশি ভয়াবহ। কে-কোথায়, অসিত কোথায়, অসিত, আবদুল লতিফ ওরা যে কোথায়—কেউ আর ঘরে ফিরল না। লতিফ বলে গিয়েছিল, ভাবি আমরা ফিরে না এলে যেদিকে চোখ যায় সরে পড়বেন।

লতিফের কথাই বেশি মনে হচ্ছে। সে বোধহয় সবার আগে কপোতাক্ষ

নদীর পারে, অগুনতি তারা যখন আকাশে ফুটে রয়েছে এবং যখন একটা গয়না নৌকা নদীর জলে, লতিফ সেই নদী আর চরের মাঝে চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে। অসিতের কথা সে জানে না। জানবার কোনো তার সুযোগও নেই। মরার কথা তার এমনি, কারণ যেভাবে খবর আসছিল, তাতে ওরা মরে যাবেই। গৃহদাহ, লুণ্ঠন এবং নরহত্যা এখন একটা জাতিবিশেষে আরম্ভ হয়ে গেছে। সুতরাং লতিফ শেষপর্যন্ত লড়ে মরার কথা ভেবেছে, যখন ওরা কাউকে বাঁচাতে পারছে না, তখন একমাত্র সম্বল সূর্যকে প্রদক্ষিণ করা। সারা বিকেল সূর্য প্রদক্ষিণের সময়ই মনে হলো, বড়বড় গোলা বৃষ্টি, ওদের বন্দুকের শব্দ অতদূরে পৌঁছায় না বলেই ওরা আরও এগিয়ে গেছে। পাগলের মতো উন্মত্ত হয়ে ওরা কামানের মুখে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সূর্য অস্ত গেল। নদীর জলে আর গয়না নৌকা দেখা গেল না। সমাধিদের গম্বুজ উড়ে গেছে, এবং নানারকমের কাচ গম্বুজের চারপাশের ধূলায় মিলে আশ্চর্য এক মায়াবী ঈশ্বরের কথা অথবা মহিমার কথা বলেছে যা কখনও শেষ হয়ে যায় না। নমিতা দেখছিল তখন সে অন্ধকারে চুপিচুপি বের হয়ে পড়েছে। মিঞাবাড়ির দক্ষিণের ঘরটা জ্বলছে। বিশ্বাসদের খড়ের গাদায় আগুন, চৌধুরী সাহেবের বাংলো বাড়িটার চিহ্নমাত্র নেই এবং কে-যে-কোথায় ছিটকে পড়েছে অন্ধকারে টের পাওয়া যাচ্ছে না। আগুন যেখানে জ্বলছে তার চারপাশে উর্দিপরা অতিশয় হিংস্র মানুষের বেয়নেট ঝলকাচ্ছে। কাছে কোথাও কিছু জীবন্ত নড়ে উঠলেই আক্রমণ। এ-সময় তবু রক্ষা গ্রামের মানুষেরা মাঠের বিস্তৃর্ণ পাটক্ষেতের ভিতর ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছে এবং এভাবে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লে টের পাওয়া যায় না চারপাশে কোনো লোকালয় আছে কিংবা নমিতার বোধহয় কোনো হুঁস ছিল না। কে ছেলেটাকে টানতে-টানতে, কারণ ছেলেটাতো ঠিক বুঝছে না, কেন চারপাশে এমন আগুন, কেন মা তাকে দ্রুত টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ছেলেটা সবটাই অবিকল নকল যুদ্ধ ভেবে কেমন হতবাক হয়ে মাকে বলেছে, আমরা কোথায় যাব মা।

মা বলেছে, আমরা বর্ডারের দিকে যাব। আমাদের এখানে থাকা নিরাপদ নয় কাঞ্চন ?

বাবা এল না যে!

বাবা পরে আসবে।

বাবা পরে আসবে কেন ?

বাবা ওদের সঙ্গে লড়ছে।

বাবা যুদ্ধ করছে ? বলে সে বলল, মা আমার পায়ে লাগছে।

নমিতা তারপর কিভাবে যে এতটা পথ হেঁটে এল ! এখন যেন সে কিছুটা সাফ দেখতে পাচ্ছে। সে বাঁচবে, কাঞ্চন বাঁচবে, মানুষটার কথা সে ভাবতে পারছে না। ভাবতে গেলেই ভিতরটা কেমন ভয়ঙ্কর কঠিন হয়ে যায়। সে ভালো করে কাঁদতে পারে না। এবং সে এ-সময়ে হাতের নোয়া সিঁদুর সব দেখে একটু বিস্মিত হলো। এগুলো থাকার কথা না। সেতো এগুলো রাখতে পারে না। ওর নানা ধরনের কষ্ট এখন, সে-যে কি করবে, মাথার উপর আকাশ খুব বড় মনে হচ্ছে না, কারণ সে আকাশটাকে ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছে না। পাটের জমি ক্রোশের-পর-ক্রোশ, এবং সে জমির ভিতর। পাটগাছ ফাঁক করে দাঁড়ালে সে কিছুটা আকাশ দেখতে পায়। সবটা পায় না, তার মানুষ, অসিত এখন নিরালয় মানুষের মতো হাত-পা ছড়িয়ে হয়তো শুয়ে আছে। কি-যে ভাবছে সব ! যদি অসিত কোথাও থাকে এভাবে তবে টের পাওয়া যায় ওর শরীর মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। এবং আশ্চর্যভাবে ওর চোখের উপর শুধু শাদা রঙের কঙ্কাল, কি সুন্দর মহিমময় হয়ে পড়ে আছে ভিজা মাটিতে। আকাশ থেকে কেবল বৃষ্টিপাত হচ্ছে। নমিতা বৃষ্টিপাতের শব্দ শুনতে পেল।

এভাবে ক্রমান্বয় বৃষ্টিপাত। সে এ-কদিন শুকনো জমির উপর দিয়ে হেঁটে আসতে পেরেছে। বৃষ্টিপাত একটা বড় হয়নি। ছিটেফোঁটা মাঝেমাঝে হয়েছে। এবং মাথার উপর কখনও একটা চালাঘর ইটের খুপড়ি কখনও নির্জন বনভূমির বড় শালগাছ তাদের বৃষ্টিপাত থেকে রক্ষা করেছে। সে যেহেতু রাত হলেই বের হয়ে আসে বন থেকে, খুপড়ি থেকে, চালাঘর থেকে, এবং ক্রমান্বয় তার হাঁটা, কাঞ্চন তেমন হাঁটতে পারে না, ওর বেশি হাঁটতে গেলে বুক শুকিয়ে যায়, এবং সে তখন চোখ তার নীল রঙের করে রাখে। নমিতা বড় ভয় পেয়ে যায়। ওর পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, বাবা ঐ ছাখ আকাশ, কত বড় আকাশ। ও পাশে ছাখ আকাশটা কেমন নেমে গেছে। আমরা ওখানে যেতে পারলেই বর্ডার পেয়ে যাব। সেখানে আমরা পেটভরে খেতে পাব। কাঞ্চন, আমার লক্ষ্মী ছেলে বাবা। আমরা আর একটু হাঁটি।

বাবা যে আসছে না !

যুদ্ধ শেষ হলেই বাবা চলে আসবে কাঞ্চন।

যুদ্ধ এতদিন থাকে ! লতিফ চাচা পর্যন্ত এল না।

ওরা সবাই আসবে। দেখবি ওখানে ওদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।

ওরা ওখানে চলে গেছে।

শেষ হয়ে গেলেই ওরা ওখানে আমাদের আনতে যাবে।

আমরা আবার ফিরে আসব সব।

বাঃ আমাদের দেশ-বাড়িতে আমরা ফিরে আসব না!

তবে কারা আমাদের তাড়িয়ে দিচ্ছে?

এ-সময় আর কোনো জবাব দিতে পারে না নমিতা। সে চুপচাপ থাকে। এবং কেবল এক আশার কথা, আশা কুহকিনী, এই আশা কুহকিনীর মায়াজালে নমিতা কাঞ্চনকে হাঁটতে উৎসাহ দিচ্ছে। কাঞ্চন আর পারছে না। ওর পা ফুলে গেছে। নমিতা যতক্ষণ পারছে ওকে বুকে নিয়ে হাঁটছে। কিন্তু সে যেতেযেতে মাঝেমাঝে হাটু মুড়ে বসে পড়ছে। কারণ কাঞ্চনকে বড় বেশি ভারি মনে হচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে ততো ভারি মনে হচ্ছে। এসব ভারি অমঙ্গলের কথা! সে তখন মাথায় চুলে বিলি কেটে দেয়, সরল ডাগর চোখ দুটো কাঞ্চনের নীল রঙ থেকে শাদা হয়ে যাচ্ছে। আজ আবার একটা দিন ওরা বিশ্রাম পাবে। এই পাটের জমিতে শুয়ে থাকবে ভাবছিল, কিন্তু বৃষ্টিপাতের দরুণ ওরা বসতে পর্যন্ত পারছে না। আঁচলে যে শেষ খাদ্যটুকু ছিল, সকাল হলে নমিতা আঁচল থেকে সেটা খুলে দেবে ভাবল, কাল বিকেল থেকেই কাঞ্চন কাঁদছে। ক্ষুধার জন্য কাঁদছে। আমাকে এক মুঠ দাও। আর চাইব না মা। নমিতা শক্ত হয়ে গেছে। এই সম্বলটুকু নিয়ে প্রায় গোটা পথ তাকে পার হয়ে যেতে হবে। ওর শীর্ণ চোখ। সে কাল থেকে কিছু খায়নি। ছেলেটার জন্য এটুকু রেখে দিয়েছে এবং লোভ দেখানোর মতো ব্যাপার। আবার একক্রোশ হেঁটে গেলে তুমি এক মুঠো পাবে কাঞ্চন। কাঞ্চন লোভে-লোভে হেঁটে গেছে, যখন আর পারছে না, হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, তখন নমিতা ওকে বুকে তুলে নিতে গিয়ে দেখেছে ওর হাঁটুতে ও পায়ে জোর নেই। সে অসহায় ভীত চোখ-মুখ করে রেখে বলেছে, কাঞ্চন, ঐ গ্যাখ, ঐ যে বড় বটগাছটা দেখা যায় না, ওপাশে আমরা একটা নদী পাব। নদীতে দেখবি কত শাপলা ফুল ফুটে আছে। তোকে শাপলা তুলে দেব। খুব মিষ্টি লাগবে খেতে। আয় হাঁটি।

কাঞ্চন একটা নদীর আশায়, শাপলার আশায় মার সঙ্গেসঙ্গে হেঁটে গেছে। রাতের জ্যোৎস্নায় কিছুই দেখা যায় না। অথবা অন্ধকারে কিছু নক্ষত্র বাদে যখন কিছুই ফুটে না, তখন ওরা সেই অশ্বত্থ গাছ অথবা নদী এবং শাপলা ফুলের ভিতর এক আশ্চর্য দেশের বাসিন্দা হয়ে থাকে।

আর যা হয় কিছুদূর হেঁটে গিয়েই কাঞ্চনের বলা, মা আর কতদূর। ঐ যে বাবা এসে গেছি। সেখানে এক সাধুবাবা থাকেন, তিনি খুব দয়ালু ব্যক্তি। তিনি আমাদের গরম দুধ দেবেন খেতে। তবে তোমার আর শীত করবে না। তুমি বল পাবে। তোমার বাবাকে আমরা দেখতে পাব কাঞ্চন। হয়তো তিনি সেখানে আমাদের জন্য প্রতীক্ষা করবেন।

না মা আমি আর পারছি না।

আমাদের পারতে হবে বাবা। নদীর জলের রঙ কি নির্মল। সেখানে একটা পানসি নৌকা আছে। তোমার বাবা গেছে হয়ত গঞ্জে। একটা ইলিশমাছ কিনে আনতে পারে।

ইলিশ মাছের ঝোল রান্না হবে মা!

—গরম ভাত, ইলিশমাছের ঝোল। ওকে দুটো বেগুন আনতে বললে ভালো হতো। বেশ কালোজিরে সম্ভারে বেগুন দিয়ে ইলিশমাছের ঝোল খুব ভালো লাগবে।

আমি কিন্তু চান্‌টান করে খাব।

তুমি নদীর জলেই চান করে নেবে। লতিফ চাচাকে বলবে চান করে নিতে। ও যা লোক, ওতো খিদা পেলে রাক্ষসের মতো করে। স্নান করতে চায় না। তুমি বলবে, লতিফ চাচা স্নান না করে এলে ভাত খেতে পাবে না।

মা মনে আছে একবার লতিফ চাচা লটকল ফল এনে দিয়েছিল!

নদীর পাড়ে অনেক লটকলগাছ আছে কাঞ্চন। বিকেলের দিকে আমি তোমার বাবাকে নিয়ে যাব। লটকল ফল নিয়ে আসবে। তুমি লতিফ চাচার সঙ্গে নৌকায় বসে থাকবে, কেমন! নদীতে মাছ ধরব। রাতে আমরা ভালো, ভাজা কিছু করব না। নদী থেকে যা মাছ ধরবে তাই দিয়ে ঝোল-ভাত। কাঞ্চন ঝোল-ভাত খেতে তোমার অসুবিধা হবে নাতো।

অঃ কি সুন্দর মা তুমি! আমরা খেয়েদেয়ে উঠলেই কিন্তু শুয়ে পড়ব না মা। লতিফ চাচা গল্প বলবে। মধুমালার গল্প। আমরা সারারাত গল্প করব। কতদিন পর আমাদের আবার দেখা হবে, না মা!

কতদিন পর আবার দেখা হবে। আকাশে কত নক্ষত্র। চারপাশে সবুজ ধানক্ষেত। নদীর চরে তরমুজের জমি, আর শাদা বালুরাশি। আমরা শুয়ে থাকলে টিট্টিভ পাখির ডাক শুনতে পাব।

আর একটা পাখি, মা আমাদের গোয়ালঘরের চালে এসে যে বসত,

একদিন আমি গুলতি ছুঁড়ে মেরে ফেলেছিলাম পাখিটাকে, তুমি আমাকে খুব বকলে, পরদিন থেকে আমি গুলতিটা ফেলে দিলাম, মনে নেই মা, পরে তারপর পাখির বৌটা এসে রোজ গোয়ালঘরের চালে বসে থাকত, তুমি ওকে খেতে দিতে সব, মনে নেই!

বড় বড় চোখে তাকালে টের পাওয়া যায় কিযে আশা প্রাণে, কাঞ্চনকে নমিতা নানাবর্ণের ছবির ভিতর ক্ষুধার কি-যে তাড়না ভুলিয়ে রাখতে চাইছে, চোখগুলো আর তার বড় নেই, চোখ-মুখ শীর্ণ হয়ে গেছে। সে নিজের চেহারাটা দেখতে পাচ্ছে না, সে বুকে কাঞ্চনকে নিয়ে হাঁটছে! কাঞ্চন তুমি এভাবে কাঁধে ঘুমিয়ে পড়বে না। ঘুমিয়ে পড়লে আমি একটু হাঁটতে ভয় পাই।

না মা আমি ঘোমাইনি। একটা কুকুর ডাকছে না মা!

কুকুরটা টের পেয়ে গেছে। এ-গ্রামটার নাম ময়নাপুর। আমরা ময়নাপুর পার হলে একটা বড় মাঠ পাব।

আমি আবার মাঠে নেমে হাঁটব, একমুঠো খেতে দেবেতো।

একমুঠো! সে যে অনেক বাবা। তাহলে যে আমরা ওদের কাছে পৌঁছাতে পারব না।

তবে কতটুকু দেবে!

একটুখানি দেব।

দাও তবে। দিলে আমি ঠিক এই মাঠ পার হয়ে যাব।

আঁচল খুলে নমিতা খুব সন্তর্পণে ফুরিয়ে যাবে মতো একটুখানি দিল তারপর সামনের খাল থেকে আঁজলা পেতে জল খাওয়াল।

মা তুমি খাও।

না বাবা আমার খিদে পায় না।

এতদিনেও তোমার খিদে পায় না।

আমরা কদিন ধরে হাঁটছি। কদিনে কি আর খিদে লাগে।

না মা তুমি মিথ্যাকথা বলছ।

মা আবার কখনও মিথ্যাকথা বলে কাঞ্চন!

কাঞ্চনের সত্যি মনে হলো মা কখনও মিথ্যা কথা বলে না। মাকে সে খেতে আর পীড়াপীড়ি করল না। মা তাকে এভাবে নিয়ে আসছে। আজ রাতে ওরা বড় রাস্তা পার হয়ে যাবে। তারপরই কেমন একটা সুদীর্ঘ পরিচিত পথ, আর কিছুটা পথ হাঁটলেই ওরা সেই নীলবর্ণের নদী, নির্মল জল, শাপলা ফুল, পাখির

ডাক এবং আকাশের নির্মল ছবি দেখতে পাবে। এখন যেন ওরা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চারপাশের পাটগাছগুলো কারা বুনে দিয়ে নিরুদ্দেশে চলে গেছে। জমিতে নিড়ানি পড়েনি। বড় আগাছা চারপাশে। বৃষ্টিপাতে ওদের শরীর ভিজে যাচ্ছে। নানারকম কীট ওদের শরীর বেয়ে চারপাশে উঠে আসছে। এখানে ওরা বসে থাকতে অথবা শুয়ে থাকতে পারছে না। এমন সব কীটের রাজত্ব ঘাসের নিচে যে কিছুক্ষণ আর বসে থাকলে ওদের শরীর নীলবর্ণ হয়ে যাবে। সারা শরীরে কীট পতঙ্গে ঢেকে গেলে ওরা আর শাপলা ফুল অথবা নদীর জল খেতে পাবে না।

ওরা কোনো রকমে একটা ফাঁকা মাঠের ভিতর এসে হামাগুড়ি দিয়ে পড়ল। এবং ঘাসের ভিতর থেকে ওরা খরগোসের মতো উঁকি দিয়ে দেখছে। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। খাঁখাঁ করছে গ্রামের বাড়িঘরগুলো। ওরা বুঝতে পারল, গ্রাম ছেড়ে সবাই পালিয়েছে। এইসময় কোনো পরিত্যক্ত বাড়িতে উঠে গিয়ে সামান্য খাবার অন্বেষণ করা। সে কাঞ্চনকে ঘাসের ভিতর লুকিয়ে রাখল। তুমি কাঞ্চন কিছুতেই এইসব ঘাসের জমি থেকে উঠে আসবে না। আমি তোমার জন্য খাবার আনতে যাচ্ছি। আমি নিজেও খাব। ওরা কেউ যদি কিছু ফেলে গিয়ে থাকে, ওতে তোমার-আমার হয়ে যাবে। তুমি ঘাসের ভিতর থেকে নড়বে না।

সে উঠে যাচ্ছিল। হামাগুড়ি দিয়ে উঠে যাচ্ছে। কাঞ্চন বলল, মা আমার বড় শীত করছে।

শীত করছে এই বৃষ্টিপাতের জন্য। সে নিজে আর এগুতে পারল না। ওকে সঙ্গে নিয়ে কোনো পরিত্যক্ত ঘরে উঠে যাবে ভাবল। এবং এই সকালটা কাটিয়ে দিবে সেখানে। কাঞ্চনকে একটা তক্তপোষে ঘুম পাড়িয়ে ঘুম যাবে। এবং সে ভাবল, যদি কিছু চালডাল, আহা সে যদি একটা সুন্দর রান্নাঘর পায়। কিছু বাসনকোসন। লাউয়ের মাচানে লাউ। ঝিঙের মাচানে ঝিঙে। সুন্দর সুদৃশ্য করে সাজিয়ে রাখবে সব—এবং পরে খেতে বসে বলবে, তুমি আমি কাঞ্চন এক সুন্দর জগতের বাসিন্দা হয়ে যাচ্ছি। আমরা বিশ্রাম এবং আহার পেলে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠব। চাঙ্গা হতে না পারলে হরিণের মতো দৌড়ানো যাবে না। কাঁটাতারের বেড়াতে শরীর আটকে গেলে একটি মরা পাখির মতো ঝুলে থাকব। এই ভেবে যেন সে মনে-মনে বল পাচ্ছে। আহার সংগ্রহের নামে ওর জিবে জল এসে গেল।

কাঞ্চন উঠে দাঁড়াতে পারছিল না। ওর হাঁটু ভেঙে আসছে। শরীর ভীষণ

ভাবে কাঁপছে। মা-ও ভীষণভাবে কাঁপছেন। তবু ওরা ঘাসের জঙ্গল ফাঁক করে সেই নির্জন পরিত্যক্ত গ্রামে উঠে গিয়ে প্রবল বৃষ্টিপাত থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত চারপাশে নজর দিতেই মনে হলো, একটা পাখি পর্যন্ত ভয়ে ডাকছে না। বৃষ্টিপাতের দরুণ ঘাস পাতা, সবুজ সব ডালপালা কেমন উলঙ্গ হয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। মানুষ-জন না থাকায় এমন ভয়াবহ, যেন কোনো মহামারীতে সব নিঃশেষ। যেন এক বড় লম্বা হাত ক্রমে লম্বা হতে-হতে এগিয়ে আসছে। বাড়িগুলোর দরজা জানালা খোলা, কোথাও একটা রুগ্ন বেড়ালের ডাক। শীর্ণ কুকুরেরা ঘরের মেঝেতে মাটি খুঁড়ে একটু ওম মতো ভাব সৃষ্টি করে ঘুম যাচ্ছে। একটা সুখের রাজত্ব ওদের। এমন সময় কোত্থেকে দুই অমানুষ এসে হাজির। অথবা বলা যায় মনুষ্য জাতির অপোগণ্ড। কারণ মুখ-চোখ দেখে বোঝা যায় না—ইহারা মনুষ্য জাতির বংশধর। মনে হয় না ইহারা কোনোদিন মানুষের নিমিত্ত সভ্যজগতে বসবাস করিয়াছে। কেবল মনে হইতে পারে কোনো প্রাচীনকালে বনে অথবা জঙ্গলে এমন শীর্ণকায় অথবা রুগ্ন মানুষের সাক্ষাৎ মিলিয়া গেলেও অবাক হইবার কিছুই নাই। কুকুর এবং বিড়ালেরা ওদের ছায়ামূর্তি দেখিয়াই এক নূতনতর ইতরপ্রাণী ভাবিয়া ছুটিতে লাগিল।

মা আর কি করেন! কাঞ্চনকে ভাঙা তক্তপোষে শুইয়ে দেওয়া হলো। মা সূর্যের আলোতে এইসব ঘরে এখন কোথায়-কি-আছে হাঁড়ি-পাতিল নামিয়ে খুঁজে-খুঁজে হয়রান। মা আর কি করেন, দুর্বল শরীরে, যদি সামান্য আহারের ব্যবস্থা করা যায়। সামনে একটা বিলের মতো জায়গা, দক্ষিণে মাঠ। পূবে বন হবে, কিসের বন সে জানে না। পশ্চিমের পথটাই সীমান্তে চলে গেছে মনে হয়। সে এখন ঘুরে ঘুরে যেমন এক বনঝোপ থেকে অন্য বনঝোপে পাখিরা আহার সন্ধান করে বেড়ায় তেমনি সে আহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত ঘুরেবেড়াতে লাগল। সে ঘরে ঢুকে হাঁড়ি পাতিল তুলে দেখতে-দেখতে সহসা সে থেমে গেল। কাঠের শক্ত মানুষের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল। আহা এমন জ্বালা, ক্ষুধার জ্বালা, জ্বালা নিবারণ হয় না জলে—সে মুঠো-মুঠো তুলে দেখল মুক্তোর মতো চালের রঙ শাদা এবং আশ্চর্যভাবে লুণ্ঠন থেকে এসব যে কিভাবে রক্ষা পেয়ে গেল। সেই আশ্চর্য এক জগতের মতো যেখানে কেবল সূর্য কিরণ দেয়, ফসল ফলে, নদী বয়ে যায়, এবং পাখিরা সকাল-সন্ধ্যে গান গায়, যেন সে তেমন এক আশ্চর্য জগতে চলে এসেছে। মানুষের যা হয়, ক্ষোভ হলে যা হয়, একটু কাঠের ব্যবস্থা আগুন খুঁজতে গিয়ে সে গ্রামের শেষদিকে চলে এসেছিল। আর যা দেখল,

স্তূপীকৃত মৃতদেহ, এখন আর দেহ নেই। কঙ্কাল সব। কবে যে ওদের গ্রামের সামনে হত্যা করে কারা চলে গেছে। এদিক-ওদিক সব মানুষের হাড়, করোটি। সে যে এসব দেখে কি করে! ভয়ে কোনো মনুষ্য জাতির আপগণ্ড আর এদিকে আসছে না। এবং সে এবার দৌড়তে থাকল। কোথায় কোনো গাছের নিচে কুঁড়ে ঘরের ভিতর সে যে তার কাঞ্চনকে রেখে গেছে। আর এমন শক্তিই বা সে পাচ্ছে কোথায়। সেতো এত দুর্বল সে ভালোভাবে হাঁটতে পর্যন্ত পারে না। আহা পেটে কি-যে হচ্ছে। এমনসব অসুখের দেশ পার হয়ে যাবে বলে বের হতে গিয়ে কোথায় যে চলে এল। সে ডাকল, কাঞ্চন, কাঞ্চন! প্রবল বৃষ্টিপাতের দরুন কাঞ্চনের কোনো সাড়া পেল না। অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে। ঘাসপাতা ভিজছে এবং সে নানারকম আলোআঁধারির খেলা দেখতে পেল আকাশে। নতুন নতুন নক্ষত্র উঠছে আকাশে। কোনোটা সবুজ কোনোটা নীল এবং হলুদ রঙের। এতো তারা আকাশে এমন যে খেলা করে বেড়াতে পারে তার কল্পনার বাইরে। বস্তুত সে চোখে সর্ষেফুল দেখছে। মানুষ যখন চোখে শর্ষেফুল দেখতে পায় তখন মানুষকে চেনা যায়—এক আবহমান কাল আমরা ছুটছি, জাতি হিসাবে আমরা মানুষ, এবং ধর্ম হিসাবে আমরা অমানুষ, এমন কোনোদিন কেউ ভাবে না। আমরা বাঁচব, বেঁচে থাকব, সূর্য উঠবে, আর অমানুষ এই পৃথিবীর সব যেন কোনো নিশুতি রাতে মরুভূমির খনি গর্ভে সব ডুবে যাবে। হায় এসব ভাবনা মানুষের, মানুষের জন্যে আর কোনো ইচ্ছা-অনিচ্ছা বেঁচে থাকে না। এভাবে একরাতের গল্প সে সেরে ফেলল। এবং দারুণ গ্রীষ্মের দাবদাহের কথাও মনে হয়—! কাঞ্চন কোথায়! সে কি পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে কি কোনো পথ হারিয়ে ফেলেছে। না-কি সে কোনো মানুষ দেখলেই ভয় পাচ্ছে। সে একা এক বিশ্ব তৈরি করে সেখানে কাঞ্চনকে নিয়ে আবহমানকাল বাঁচতে চাইছে।

সে জোরে চিৎকার করে ডাকল, কাঞ্চন।

কাঞ্চন দেখতে পাচ্ছে, মা বাইরে ছুটোছুটি করছে। এবং নানাবর্ণের সব গাছ গাছের ভিতর দিয়ে ছুটে আসছে। মা তাকে দেখতে পাচ্ছে না, অথবা কথা শুনতে পাচ্ছে না। কাঞ্চন জানালায় হাত বাড়িয়ে দিল।

কাঞ্চনের মা দেখল, একটা হাত জানালার বাইরে, ক্রমে লম্বা হয়ে যাচ্ছে, এটা মানুষের হাত মনে হচ্ছে না, সে যে কি করে। সে তার কাঞ্চনকে খুঁজে পাচ্ছে না। সে বলল, যেন হাতটাকে বলা, তুমি কাঞ্চনকে দেখেছ?

এই যে এখানে কাঞ্চন।

এবং ঘরে এসে সে কাঞ্চনকে দেখল, কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল। বুকে জড়িয়ে বলল, কাঞ্চন, আমাদের এখানে কেউ আসবে না। তুই আমি এখানে নিশ্চিন্তে দুটো রান্নাবান্না করে খেয়ে নিতে পারি।

বিশ্রাম আর খাদ্য পেলেই ওরা আবার অনেক দূর হেঁটে যেতে পারবে।

এভাবে কাঞ্চনের মা কাঞ্চনের জন্য আগুন সংগ্রহ করে ফেলল। বাইরে এসে দাঁড়াতে, সে দেখতে পেল পুকুরপাড়ের দিকে একটা লাউগাছ, সে ঝিঙের মাচানও দেখতে পেল। এমন লুণ্ঠনের পর, সূর্য আবার এখানে উঠতে পারে কি করে সে ভেবে পেল না কারণ সূর্যের কিরণ না পেলে কিছুই বাঁচে না। একটা আশ্চর্য মায়া এই মাটি এবং ঘাসের জন্য। সে একেবারে নিজের দেশটির মতো লাউ তুলে ঝিঙে তুলে ভাত সেদ্ধ এবং রান্নাবান্নার জন্য আগুন জ্বালতেই মনে হলো কাঠ ভিজা। ভিজা কাঠ জ্বলছে না। ফুঁ দিয়ে সে জ্বালাচ্ছে, ভাঙা তক্তপোষে বসে আছে কাঞ্চন। ওর বাবা একটা পানসী নৌকায় বসে, লতিফ গেছে গঞ্জে যেন। সে গঞ্জ থেকে ইলিশমাছ কিনে আনবে। এমন যখন ভাবনা, তখন মায়ের চোখে আশ্চর্য ভালোবাসা সন্তানের জন্য। এতটা পথ সে নানা প্রলোভনে কাঞ্চনকে হাঁটিয়ে এনেছে, এখন একটু খাদ্য দিতে পারবে ভেবে সে কাঞ্চনের দিকে অদ্ভুত রহস্যময় চোখ নিয়ে মিষ্টি-মিষ্টি হাসছে। কারণ তার ভয় নেই। কেউ আসছে না এ-গ্রামে। গ্রামে ঢোকার পথে সব কঠিন ভয়ঙ্কর দৃশ্য। দেউড়িতে সেপাই-সান্ত্রির মতো ওরা ওদের পাহারা দেবে।

কাঞ্চনকে সে কিছুই বলল না। গ্রামের মানুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে যে সামনের সদর রাস্তায় হত্যা করা হয়েছে সে-কথা বললে, কাঞ্চন ভয় পেয়ে যেতে পারে। ছোট গ্রাম, আসেপাশে কোথাও কোনো গ্রাম নেই। দু-পাশে বিস্তৃর্ণ অঞ্চল, বিল, বন, মাঠ এবং নির্জন এই বাসভূমে সে কেমন নির্ভয়ে ভিজা কাঠে ফুঁ দিয়ে-দিয়ে আগুন জ্বালবে ভাবছে। মানুষের অনুসন্ধানে কিছু কুকুর বেড়াল এখানে বৃষ্টি ভিজে হাজির হয়েছে। তা মোটামুটি কতদিন পর, মনে হয় দীর্ঘদিন পর কাঞ্চন আর তার মা একটা সুস্পষ্ট সংসারের ছবি মনে করতে পেরে বেশ চুপচাপ আছে। রান্না হলেই খাবে।

কাঞ্চন বলল, মা একটা কলাপাতা কেটে আনি।

তুমি ভিজবে না কাঞ্চন। সে কাঞ্চনের হাফসার্ট গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। নিজের শাড়ি ব্লাউজ তারে ঝুলিয়ে দিয়েছে। একটা সায়া পরনে। বুকের হাড় দেখা যাচ্ছে। এমন কাঠ যে কিছুতেই জ্বলছে না। ভিজা কাঠের ধোঁয়া অনেক

উপরে কুণ্ডলি পাকিয়ে উঠে যাচ্ছে। বৃষ্টি আর হচ্ছে না।

ধোঁয়া এত বেশি যে মনে হয় কোথাও থেকে আবার মানুষ এসে আশ্রয় নিয়েছে। বড় রাস্তা থেকে দূরবীন দিয়ে কেউ সেই আকাশের ধোঁয়া দেখে ভাবল ঐ গ্রামটাতে কারা আবার ফিরে এল। সে তাড়াতাড়ি গাড়িটা ঘুরিয়ে সদরে খবর দেবে বলে লেজ তুলে ছুটল। কারণ ওর ধারণা কোনো মুক্তিবাহিনী যেন ঢুকে গেছে গ্রামে। আগুন জেলে খাবার প্রস্তুত করছে।

ওরা সন্তর্পণে বড় রাস্তা থেকে নেমে পড়ল। ঘাস এবং বনঝোপের ভিতর দিয়ে ওরা আসছে। যেকোনো সময়ে আক্রমণের মোকাবিলা করতে হবে। ওরা চাইছে গ্রামের চারপাশটা আবার ঘিরে ফেলবে। টের পাবার আগেই গ্রামটাকে ঘিরে সব নীলবর্ণের পাখিদের ধরে ফেলা এবং গাছের নিচে দাঁড় করিয়ে হত্যা। ওদের চোখ ভীষণ ভয়ঙ্কর আর ভিতরে-ভিতরে এক কাপুরুষ ঢোক গিলছে, নীলবর্ণের পাখিরা কিভাবে যে উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে তারা জানে না। অথচ আশ্চর্য কোনো সাড়াশব্দ ওরা পাচ্ছে না। যে-জায়গাটায় ধোঁয়া উঠে যাচ্ছিল সেখানে এখনও সামান্য ধোঁয়া যেন চালে লেগে রয়েছে। তবে এ-বাড়িটাতেই ওরা আত্মগোপন করে আছে। ওরা কেমন এক ধূর্ত শেয়ালের মতো চারপাশে ঘিরে ফেলে এলোপাথাড়ি গোলাবৃষ্টি। একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া। পরপর বীরদর্পে ওরা ভিতরে ঢুকে চাল, কান বাঁশ সব ঠেলেঠুলে যা আবিষ্কার করল, এক সুন্দরী যুবতী সে শিশুসন্তানকে বুকে জড়িয়ে পড়ে আছে। কলাপাতায় ভাত, একটু ডাল, লাউ সেদ্ধ, ঝিঙে সেদ্ধ। ভাত থেকে গরম ভাপ উঠছে। পাশে তাজা নীল রক্ত বয়ে যাচ্ছে। বৃষ্টিপাতে তাজা রক্ত আর নীল থাকে না। কেমন পানসে রক্ত জলে ভেসে-ভেসে সারা মাসকাল এক নিদারুণ কঠিন দৃশ্য তৈরি করে রাখে—কোথাও যে একটা নদীতে শালুক ফুল ফোটে, কোথাও যে নির্মল জলে নীলবর্ণের পাখিরা উড়ে যায় আর কোথাও যে কেউ কখনও কোনো গঞ্জের হাটে ইলিশ কিনতে যায় এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখলে তা আর কখনও মনে হয় না।

ওরা লাস দুটোকে-টানতে টানতে আবার গ্রামের বাইরে ফেলে রেখে মার্চ করে চলে গেল।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা ও লুকাক্‌স্

সত্যপ্রিয় ঘোষ

সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া এবং সমাজতন্ত্রের আদর্শে বিশ্বাসী দুনিয়াজোড়া মানুষের এক বিশ্বস্ত 'বিবেক' লুকাক্‌সের প্রাণপ্রদীপ নিভে গেল; সুদীর্ঘকাল যিনি সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের নানাবিধ শর্ত ও সমস্যা আমাদের কাছে নিরবচ্ছিন্নভাবে চুলচেরা বিশ্লেষণে তুলে ধরেছেন, তাঁর বিদায়ের পরমুহূর্তে আসুন আমরা আমাদের প্রাণের পতাকা অর্ধনমিত করি।

সাহিত্যবিচারে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শ যে বিপুল আবর্ত ও ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে আন্দোলিত-আলোড়িত, সম্মানিত-উপহসিত, গৃহীত-বর্জিত হয়েছে তার মোটামুটি ধারণা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিকদের নিশ্চয়ই আছে। তথাপি সাহিত্যের মূল লক্ষ্যবিষয়ে যে পথনির্দেশ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা দেয় তা প্রগতিশীল সাহিত্যসাধকদের বারংবার স্মরণ করা কর্তব্য বলে এ-বিষয়ে লুকাক্‌সের কয়েকটি কথা পুনরায় তুলে ধরা, বিশেষ করে মৃত্যুর অব্যবহিত আগে তিনি এই প্রসঙ্গে তাঁর যে শেষ কথাগুলি বলে গিয়েছেন তা পর্যালোচনা করা নিশ্চয়ই আমাদের কর্তব্য।

নভেম্বর বিপ্লবের পরে কেন আরও সতেরো বছর লাগল সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্ব সার্বজনিকভাবে গ্রহণ করতে তা লুকাক্‌স্ তাঁর The Meaning of Contemporary Realism গ্রন্থের অন্তর্গত Critical Realism and Socialist Realism প্রবন্ধে কথাপ্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন। ১৯৫৬ সালের গ্রীষ্মকালে লিখিত এই প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩৪ সালে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে গোর্কির নেতৃত্বে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবীদের 'সহযাত্রী'-দের যে নতুন শ্রেণীবিচার হয়েছিল, তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন।[১] তিনি লিখেছেন, " 'Fellow-travellers' are bourgeois writers, critical realists who sympathize with, or at least acknowledge, the dictatorship of the proletariat and the goal of a socialist society."

তিনি বলেছেন, এই নীতি ১৯২৫-এ কেন্দ্রীয় কমিটির প্রস্তাবেও গৃহীত হয়েছিল কিন্তু RAPP প্রমুখ উগ্রপন্থীদের তৎপরতার ফলে নস্যাৎ হয়ে গিয়েছিল, এদের রক্তচক্ষু থেকে গোর্কি, শলোখভের মতো লেখকেরাও নিষ্কৃতি পাননি, 'সুস্পষ্ট-ভাবে' সমাজতান্ত্রিক লেখক ব্যতিরেকে আর কেউই বিশ্বাসযোগ্য 'প্রলেতারীয়' লেখক নন, এই ছিল এঁদের 'লাইন', ১৯৩২ সালে সোভিয়েত লেখক সংঘের প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এমনি গোঁড়ামি সাময়িকভাবে দমিত হলো। কিন্তু পরবর্তী-কালে এই বিষবৃক্ষের চারা সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্যে দেশে দেশে কেন কেমন করে গজিয়ে উঠল তা লুকাক্স্ সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। বিশেষ করে ঝানভী দমননীতি ১৯৪৬ সাল থেকে সোভিয়েত লেখকদের যে নাগপাশ বন্ধনে বেঁধেছিল এবং আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মহলে যে ফতোয়া জারি করেছিল তা ১৯৪৮ সালে ঝানভের মৃত্যুর দ্বারাও নিবৃত্ত হয়নি, ১৯৫৩ সালে স্তালিনের মৃত্যুর পরেই বিশল্যকরণীর খোঁজ করা সম্ভবপর হয়েছিল।

এই ঝানভী খড়্গ ছিল এমনই যে স্বয়ং লুকাক্স্ উপর্যুক্ত গ্রন্থের জর্মান সংস্করণের ভূমিকায় (১৯৫৭-এর এপ্রিল মাসে লিখিত) লেখেন যে ঐ-সময়ের আগে দুই দশকব্যাপী 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা' (Revolutionary Romanticism) নামে যে-আখ্যা সমাজতন্ত্রী শিবিরে উচ্চ-ঘোষণায় অভিষিক্ত ছিল তার প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল এতই প্রবল যে সরকারী কোপদৃষ্টিতে পড়তে হবে জেনেও তিনি তাঁর কোনো লেখায় বা কথাবার্তায় এই 'আপত্তিকর' আখ্যাটির উল্লেখমাত্র করেননি, নীরবতার দ্বারাই সমাজতন্ত্রী লুকাক্স্‌কে সাহিত্যের একটি সাধারণ আখ্যার বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে—"More direct opposition was impossible while Stalin was alive and the reign of Zhdanov absolute."[২] এই বাধা অপসৃত হলো বিংশ পার্টি কংগ্রেসে, তার অব্যবহিত পরে উপর্যুক্ত প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে লুকাক্সের পক্ষে এ বিষয়ে মনোভাব গোপন রাখবার প্রয়োজন রইল না, অতএব তিনি পরিষ্কার ভাষায় এবার লিখতে পারলেন যে, মার্কস ও লেনিন 'Romanticism' নামক যে-আখ্যাটাকে কখনো সুনজরে দেখেন নি সেই আখ্যাটার সঙ্গে কী করে 'বিপ্লবী' অভিধা জুড়ে দেওয়া সম্ভবপর হলো, আর কী করেই বা তার ফলে সেটা মার্কসীয় আখ্যায় পরিণত হলো![৩] আসলে, তাঁর মতে, এই আখ্যাটা প্রকৃতিবাদের (naturalism) এক বিকল্প মাত্র, নূতন নামে কিছু কাব্যিক এবং 'সংশোধিত'। তিনি লিখেছেন, স্তালিনী আত্মমুখিতার কালে বহু গুরুত্বপূর্ণ মার্কসীয় তত্ত্বের যে অপব্যাখ্যা

হয়েছিল, সোনার পাথরবাটি-মার্কা এই আখ্যাটা ছিল তার অন্যতম। কৃষি-ক্ষেত্রের বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ওয়াকিফহাল না থেকে এবং বিজ্ঞানসম্মত অর্থনীতি-জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে স্তালিন উত্তর-কালে 'আর্থনীতিক আত্মমুখিতাবাদ'-এর ঝোঁকে সোভিয়েত-অর্থনীতিতে যে সঙ্কট ঘনিয়ে তুলেছিলেন, অনুরূপ আত্মমুখিতা সোভিয়েত সাহিত্যকেও গ্রাস করেছিল, সেই অবস্থাতেই কল্পিত হতে পেরেছিল এমনি অবাস্তব আখ্যার, বলেছেন লুকাক্স্: "Revolutionary romanticism is the aesthetic equivalent of economic subjectivism."

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অন্যতম কুললক্ষণ হিসেবে এই 'বিপ্লবী রোমান্টিক-তা'-র প্রবক্তারা প্রায়শ লেনিনের 'কী করিতে হইবে' (What is to be done ?) গ্রন্থ উদ্ধৃত করে বলেছেন: বিপ্লবীদের 'স্বপ্ন দেখতেই হবে'; লুকাক্স্ ব্যাখ্যা করেছেন বিপ্লবীদের স্বপ্ন-দেখার ব্যাপারটি লেনিন যেভাবে বুঝিয়েছেন, 'বিপ্লবী রোমান্টিকতাবাদীরা' সেখানে গোড়ায় গলদ রেখে, পরি-প্রেক্ষিত বিষয়ে অজ্ঞ থেকে, সত্তার সঙ্গে পরিপ্রেক্ষিতের সমীকরণ করে ফেলে [সত্তা (reality) ও পরিপ্রেক্ষিতের (perspective) পারস্পরিক মুখা-পেক্ষিতা সম্বন্ধে স্বীকৃতি দিয়েও লেনিন কিন্তু উভয়ের সুনির্দিষ্ট পার্থক্য বিষয়ে সদা-সর্বদা সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন], প্রাত্যহিকতার সমস্যাগুলির মধ্যে যথাসর্বস্ব খুঁজে পেয়ে, জীবনকে শুষ্ক জীর্ণ রসহীন ছন্দহীন কবিতাশূন্য করে ফেলে লেনিনের বিপরীত মেরুতে চলে গেছেন: "The 'dreams' of revolutionary romanticism are the direct opposite of what Lenin called for."

পরিপ্রেক্ষিত বিষয়ে স্তালিনের অপর দুই ভ্রান্ত এবং পারস্পরিকভাবে বিচ্ছিন্ন নীতি কেমন করে সোভিয়েত ও সমাজতান্ত্রিক সাহিত্যবিচারকে বিভ্রান্ত করেছিল, লুকাক্স্ তা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।[৪] প্রথমত, সমাজতন্ত্রে শ্রেণীসংগ্রাম চলতে থাকবে এবং অবশ্যই তা ক্রমশ তীব্রতর হবে এই ধারণা বদ্ধমূল করে দেওয়া হলো; তাঁর দ্বিতীয় পরিপ্রেক্ষিত রূপে পাওয়া গেল: সমাজতন্ত্রবাদের দ্বিতীয় পর্ব সাম্যবাদ আসন্ন। রাষ্ট্রের বিলোপ-সাধনের মার্কসীয় তত্ত্বকে ঢেলে সাজিয়ে স্তালিন উপর্যুক্ত দুই পরস্পরবিরোধী ধারণার মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধনের চেষ্টা করলেন। তিনি বোঝালেন, চতুর্দিকে ধনতান্ত্রিক আবেষ্টনী সত্ত্বেও একমাত্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাম্যবাদ অর্জিত হবে; রাষ্ট্র,

রাজনৈতিক পুলিশ এবং আনুষঙ্গিক সব কিছু বজায় রেখেও : "The stage of 'from everyone according to his abilities, to everyone according to his needs' would be reached." ক্রমতীব্রতামুখী শ্রেণীসংগ্রামের নামে রাষ্ট্রের সর্ববিধ ক্ষেত্রে যেমন তেমনি সাহিত্যেও কল্পিত শ্রেণী-শত্রুকে খতম করার নেশা চারিয়ে গেল স্তালিনের সর্বশক্তিমান সিকুরিটি বিভাগের কর্মকর্তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় ; এবং আসন্ন সাম্যবাদের পরিপ্রেক্ষিত পেয়ে গিয়ে সোভিয়েত কথাসাহিত্যের মনস্তাত্ত্বিক, নৈতিক ও প্রকৃতিগত (typological) কাঠামো বিশেষভাবে প্রভাবিত হলো। এর ফলে সমাজতন্ত্রবাদের সেই অধ্যায়ে যে ঘটনা ছিল নিতান্তই একটি ব্যতিক্রমবিশেষ, সেটিকে ধরে নেওয়া হলো আদর্শ একটি নমুনা। এমনি করে এই সর্বনাশা 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা' কেমন করে 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা'-র মুখে চুনকালি মাখাল তা লুকাক্‌স্ খোলা-মনে যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

এই 'বিপ্লবী রোমান্টিকতা' আখ্যায় জন্ম ও লালনে স্বয়ং গোর্কির অবদান ছিল সর্বাপেক্ষা বেশি, পূর্বোক্ত প্রথম সোভিয়েত লেখক-কংগ্রেসে প্রদত্ত তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণেও এর উল্লেখ আছে। লুকাক্‌স্ এই আখ্যা গ্রহণের অযোগ্য মনে করলেও 'বিচারী বাস্তবতা' (Critical Realism) আখ্যা শুধু গ্রহণই করেননি, এ বিষয়ে গোর্কি উক্ত ভাষণে যে তত্ত্ব উপস্থিত করেছিলেন তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অব্যবহিত পূর্ববর্তী স্তর হিসেবে বিচারী বাস্তবতার ঐতিহাসিক ও শিল্পপ্রকরণগত বিবর্তন আলোচ্যমান প্রবন্ধে সবিস্তারে বিশ্লেষণ করেছেন।

গ্রন্থটির তিনটি প্রবন্ধে লুকাক্‌স্ আধুনিক সাহিত্যের তিনটি প্রধান ধারা খতিয়ে দেখেছেন। প্রথমত, তিনি ইউরোপের ধনতান্ত্রিক শিবিরের পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক রীতিসর্বস্ব আধুনিকতাবাদীদের মুখ্য প্রবক্তা কাফকা, প্রুস্ত, জয়েস, রবার্ট ম্যুসিল থেকে শুরু করে কামু, বেকেট, ফকনার, নরমান মেইলার প্রভৃতিদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন ; এঁদের আত্মমুখিতা, মানবজীবন অচল-অনড় এঁদের এই তত্ত্ব, ব্যক্তিত্বের অপহ্নব, দেহ ও মনের যাবতীয় বিকারে মধ্যে হন্যে হয়ে ঘোরা, ইতিহাসবোধ হারিয়ে চিন্তা-অনুভূতি-কর্মের মধে যোগসূত্র গুলিয়ে ফেলে শ্মশানস্থ নিরালম্ব বায়ুভূত নিরাশ্রয়-অবস্থাকে অনিবা বলে মেনে নেবার প্রবণতাগুলি তুলে ধরেছেন। দ্বিতীয়ত, এঁদের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় দীক্ষিত এমন সব কমিউনিস্ট লেখকদে

কথা তুলে ধরেছেন যাঁরা গোর্কি-আচরিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার তত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে পারেননি, এই তত্ত্বকে যাঁরা আরোপ করেছেন প্রধানত ওপর-থেকে; ফলে এঁদের সাহিত্য হয়ে গেছে স্থূল প্রচারধর্মী; সমাজের প্রকৃত চরিত্র অনুধাবন করতে না পেরে, তার অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বসংঘাত ধরতে না পেরে এঁরা বাস্তবতার সমস্যাগুলিকে অতিসরলীকরণের দ্বারা সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতাকেই উপহসিত করেছেন; ফলে ধনতান্ত্রিক রীতিসর্বস্বদের মতো এঁরাও ইতিহাসের রথের চাকা অচল করে রেখেছেন। তৃতীয়ত, সমকালীন অধ্যায়েই 'বিচারী বাস্তবতাবাদী' আর একদল লেখকের সন্ধান লুকাক্স্ দিয়েছেন—বিশেষভাবে তাঁদের মধ্যে তুলে ধরেছেন টমাস মান, যোসেফ কনরাড, ও'নীল, বর্ণড শ প্রমুখ লেখকদের যাঁদের তিনি স্থাপন করেছেন উনিশ শতকের সার্থক বাস্তবতাবাদীদের পুরোধা বালজাক, স্তঁাদাল, তলস্তয়ের যোগ্য উত্তরসাধক রূপে; এঁদের সাহিত্যসৃষ্টি লুকাক্সের মতে সমাজচরিত্রের সর্বাপেক্ষা সত্য রূপায়ণ, স্থান-কাল-পাত্র এঁদের সাহিত্যপটে যথাযোগ্য পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত, চরিত্রগুলিকে এঁরা শৌখিন মজদুরির খেয়ালিপনায় সমর্পণ করেন নি, যুক্তিবুদ্ধিসমন্বিত বিচারকুশলতার দ্বারা এঁরা যেমন অতীতের ধ্রুপদী সাহিত্যের যোগ্য উত্তরপুরুষ রূপে স্বীকৃতির অধিকারী তেমনি এঁরাই ভবিষ্যতের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার বিশ্বস্ত অগ্রদূত।

গ্রন্থটির দ্বিতীয় প্রবন্ধের নামই হল 'ফ্রানৎস্ কাফকা না টমাস মান?' প্রবন্ধটির শেষে তিনি বলেছেন, ফ্যাসিবাদের নখদন্তবিস্তারের সমসময়ে এবং পরবর্তী স্নায়ুযুদ্ধের প্রলম্বিত অধ্যায়ে তার এক প্রতিপক্ষ রূপে বিচারী বাস্তবতার পক্ষে আত্মপ্রকাশ আদৌ সহজ কর্ম ছিল না, তথাপি দৈহিক-মানসিক নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করেও বিচারী বাস্তবতার শরিকরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী কীর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরা আন্তরিকভাবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, যুদ্ধভীতিকণ্টকিত স্নায়বিক টানা-পোড়েনের বিরুদ্ধে, শিল্প-সংস্কৃতির সমূহ বিনাশের ঘনঘটার বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত করতে পেরেছেন। এমনি পরিস্থিতিতে, লুকাক্সের মতে স্নায়ুযুদ্ধের নীতির পরাভব আসন্ন হয়ে এসেছে, তা থেকে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এক নূতন পরিপ্রেক্ষিত প্রত্যাসন্ন হয়েছে যা বিচারী এবং বাস্তব-বাদী বুর্জোয়া সাহিত্য-বিকাশের পক্ষে ব্যাপকতর সম্ভাবনা এনে দিয়েছে। তিনি বলেছেন : "The real dilemma of our age is not the opposition between capitalism and socialism, but the opposition between

peace and war." এ অবস্থায় প্রগতির শরিকদের নূতন করে পথনির্দেশ নিতে হবে: "It is the dilemma of the choice between an aesthetically appealing, but decadent modernism, and a fruitful critical realism. It is the choice between Franz Kafka and Thomas Mann."[৫]

গ্রন্থের তৃতীয় এবং শেষ এবং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের মুখপাতেই লেখক বলেছেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সঙ্গে বিচারী বাস্তবতার মেলবন্ধন না দেখিয়ে আলোচনা শেষ করলে তাঁর গোটা বক্তব্যই খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ থেকে যেত।

বুর্জোয়া বাস্তবতা ও আধুনিকতাবাদের আলোচনায় যেমন তিনি সর্বাগ্রে উভয়ের পারস্পরিক পরিপ্রেক্ষিত বিচার করে নিয়েছেন, তেমনি বিচারী ও সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পারস্পরিক পরিপ্রেক্ষিতটি তিনি প্রথমেই পরিচ্ছন্নভাবে তুলে ধরেছেন। উভয় অবস্থার চরিত্রবিচার করে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও মিলগুলি একের পর এক উদ্‌ঘাটন করেছেন। এই দুই তত্ত্বের মধ্যবর্তী সাদৃশ্যের ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা, একের প্রয়োজনে অন্যটির অস্তিত্বের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে লুকাক্‌স্ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অন্যতম সুহৃৎ বিচারী বাস্তবতার মহান শরিক রোম্যাঁ রলাঁর কথা সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করেছেন। গোর্কি সম্বন্ধে লুকাক্‌স্ অসংখ্যবার বলেছেন তিনি ছিলেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ (তাঁর পূর্ববর্তী একটি গ্রন্থ *Studies in European Realism*-এ লুকাক্‌স গোর্কিকে বলেছেন The Liberator, পৃথক এক পরিচ্ছেদে তিনি যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে এই মত ব্যক্ত করেছেন যে তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখক), সেই গোর্কিও তো বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ক্রমান্বয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে সংগ্রাম করতে করতে প্রায় অলক্ষ্যেই যেন সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি লাভ করেছেন। লুকাক্‌স্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, "Lenin always insisted there was no Chinese Wall separating the bourgeois-democratic and proletarian revolutions."[৬]

কিন্তু স্তালিনের আত্মমুখী স্বেচ্ছাচারিতা যখন প্রবল আকার ধারণ করল, ঝানভী গর্জন যখন চারিধার ঢেকে ফেলল তখন শুধু যে ঐ সৌহার্দ্যের রাখী-বন্ধন ছিন্ন হলো তাই নয়, সোভিয়েত ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রী দেশগুলির মাটিতে বিচারী বাস্তবতার সমস্ত সম্ভাবনা বিনষ্ট করা হলো, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতাও জল-মাটি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সাহিত্যের পরগাছায় পরিণত হলো, লুকাক্‌স্ যাকে

বলেছেন 'illustrative literature.' (কথাটা তিনি আহরণ করেছিলেন তিনের দশকের এক সাহসী রুশ-সমালোচক উসিয়েভিচের একটি প্রবন্ধ থেকে)।[৭] এই প্রসঙ্গে লুকাক্‌সের অন্য একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য: শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে স্তালিনী সংকীর্ণতা আশ্রয় করেছিল লেনিনের ১৯০৫ সালে লিখিত বিখ্যাত 'পার্টি সংগঠন ও পার্টি-সাহিত্য' শীর্ষক প্রবন্ধটিকে, এই প্রবন্ধের দোহাই পেড়ে স্তালিন-অনুগামীরা সৃজনমূলক শিল্পসাহিত্যের চরিত্র নির্ণয় করেছিলেন; কিন্তু লুকাক্‌স্ উল্লেখ করেছেন[৮] সোভিয়েত পত্রিকা Drushba Narodov (1960, no. 4)-এ প্রকাশিত ক্রুপস্কায়ার একটি অজ্ঞাতপূর্ব চিঠিতে জানা যায় লেনিনের উক্ত প্রবন্ধ সৃজনমূলক শিল্পসাহিত্য সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। লুকাক্‌স্ দাবি করেছেন, তিনিও দীর্ঘকাল আগে থেকেই এই মতই পোষণ করেছেন।

এসব বিভ্রান্তি সত্ত্বেও লুকাক্‌স্ কিন্তু গোর্কি-নির্দেশিত সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার আদর্শে বীতশ্রদ্ধ হননি। পূর্বোক্ত প্রথম লেখক-কংগ্রেসে অভিভাষণের উপসংহারে গোর্কি বলেছিলেন: "সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পদ্ধতি জীবনকে দেখে কর্মকাণ্ডরূপে, সৃষ্টিশীল ধারারূপে। এর লক্ষ্য মানুষের মূল্যবান ব্যক্তিগত সামর্থ্যগুলির অনিরুদ্ধ বিকাশসাধন, উদ্দেশ্য প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে মানুষের বিজয় অর্জন, তার স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু, পৃথিবীতে বাঁচার আনন্দ—অর্থাৎ যা মানুষ চায় এবং পৃথিবীকে সমস্ত মানুষের এক ঐক্যবদ্ধ পরিবারের আবাস-ভূমিতে রূপান্তরিত করার জন্য মানুষের যে ক্রমবর্ধমান দাবি তার সঙ্গে সেই ইচ্ছার পূর্ণ সঙ্গতি রয়েছে।" লুকাক্‌স্ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এই সংজ্ঞার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যগুলি অনুধাবনের জন্য সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। গোর্কি, শলোখভ, মাকারেংকো, আলেকসেই তলস্তয়, ত্রেনভ, ফেদিন, আনা সেঘার্‌স্, তিবর ডেরি প্রমুখ লেখকরা যে-পথে উক্ত আদর্শের রূপায়ণ করে গেছেন সেই পথেই, লুকাক্‌স্ বলেছেন: "Socialist realism has still to fight to establish its international reputation."[৯] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সেই নিপতিত সমৃদ্ধি, বিহত শ্রদ্ধা, প্রতিহত আশা পুনরুদ্ধারের কাজে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার বিনষ্ট সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে স্তালিনযুগের বিকৃতিগুলি অবশ্য ভুলে থাকলে চলবে না, একথা লুকাক্‌স্ বারংবার বলে গিয়েছেন। দীর্ঘকাল বিচ্ছিন্ন থাকার পর লুকাক্‌স্ শেষ জীবনে পুনরায় হাঙ্গেরির সোশ্যালিস্ট ওঅর্কার্স পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন, ১৯৬৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর

পার্টির মুখপত্র *Nepszabadsag* সেই উপলক্ষে এক সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে অর্থনীতি পুনর্গঠন, নন্দনতত্ত্ব ও দর্শন বিষয়ে তাঁর সর্বাধুনিক মতামত প্রচার করে ; তখনও লুকাক্স্ বলেন উক্ত বিকৃতির উল্লেখ ও বিশ্লেষণ না থাকলে আজকের দিনের বাস্তবকে চিনে নেওয়া এবং তা সাহিত্যভাত করা আদৌ সম্ভবপর নয়। স্তালিনের মৃত্যুর পর বরফ গলার সময়ও এলো ; এর্হেনবুর্গ লিখলেন *The Thaw* (১৯৫৪), দুদিন্‌ৎসেভ লিখলেন *Not by Bread Alone* (১৯৫৬), পাস্তেরনাকের *Dr. Zhivago* (১৯৫৭), ইয়েফতুশেঙ্কোর *A Precocious Autobiography* (১৯৬২), ইত্যাদি ইত্যাদি, এবং অবশেষে ১৯৬২ সালের শেষে সোভিয়েত মাসিকপত্র নোভি মির-এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হলো আলেকজান্দর সলঝেনিতসিনের যুগান্তকারী এবং নব্যযুগের প্রবর্তক নভেলা *One Day in the Life of Ivan Denisovich* ; আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই দুনিয়ার সমাজতন্ত্রী শিবিরে এই লেখক বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করলেন। লুকাক্স্ উচ্ছ্বসিত ভাষায় সলঝেনিতসিনকে স্বাগতম জানালেন, ১৯৬৪ সালে মস্ত একটি প্রবন্ধে সবিস্তারে তিনি এই নভেলার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলেন, বললেন : "...the role of landmark on the road to the future falls to Solzhenitsyn's story."[১০] বললেন, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সার্থক পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হলে সমকালীন মানুষকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিত ও প্রকৃত সত্তার পারস্পরিক সম্পর্ক চিনে নিতে হবে, বুঝতে হবে বর্তমান যুগ মানুষের কাছ থেকে কী চায় ? প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী বলে কে নিজেকে প্রতিপন্ন করতে পেরেছে ? মনুষ্যত্বের মর্যাদা ও সামঞ্জস্য কে উদ্ধার করতে পারছে ? নিজের কথা কে বলছে, কিভাবে ? কে তার একান্ত মূল্যবান মানবতা রক্ষা করতে পারছে ? এই মানবতা কোথায় কেমন করে পদদলিত নিষ্পেষিত ধ্বংস হয়েছিল ? এসব জানতে হবে, লিখতে হবে প্রাণের ভাষায় ; বলেছেন লুকাক্স্, "...any future great literature of a revitalized socialism cannot possibly, least of all where the all important questions of form are concerned, be a straightforward continuation of the first upsurge of the nineteen-twenties, nor a return to it.···socialist realism should develop a different style···"[১১] ; বললেন লুকাক্স্ : "No one can now predict when this advance will be completed and whether by

Solzhenitsyn or by others."[১২]

এই প্রশ্নের জবাব পেতে লুকাক্‌স্‌কে দীর্ঘকাল অপেক্ষায় থাকতে হলো না, সলঝেনিতসিন অচিরেই লিখলেন বর্তমান শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ উপন্যাস *The First Circle* এবং *Cancer Ward*; সুদীর্ঘ এক প্রবন্ধের মুখবন্ধে অভিনন্দন জানিয়ে, ১৯৬৯ সালে, লুকাক্‌স্‌ লিখলেন: "In this respect Solzhenitsyn is heir not only to the best tendencies in early socialist realism, but also to the great literary tradition, above all that of Tolstoy and Dostoevsky."[১৩] সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার পূর্ণ বিকাশে আগ্রহী লুকাক্‌স্‌ লিখলেন: বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল, দীর্ঘকালীন বিভ্রান্তির শেষে সলঝেনিতসিনের পরপর কয়েককটি নভেলা রচনার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাতের পর প্রশ্ন জেগেছিল, নূতনতর এই অধ্যায়ে সমাজ-তান্ত্রিক বাস্তবতার পূর্ণ সাহিত্যরূপায়ণ কি তাঁর কলম থেকেই আমরা পাব? ইনিই কি পারবেন এমন কিছু লিখতে যার দ্বারা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতামণ্ডিত কোনো সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হবে?[১৪] পাঁচ বছর আগে লুকাক্‌স্‌ এই যে প্রশ্ন রেখেছিলেন, ১৯৬৯ সালে লেখা সলঝেনিতসিনকে নিয়ে রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি প্রবন্ধে তিনি সহর্ষে লিখলেন: *The First Circle* নিঃসন্দেহে তাঁর সেই প্রত্যাশিত গ্রন্থ, লিখলেন, "His works are undoubtedly the first and most important precursors of a new creative epoch."[১৫]

লুকাক্‌স্‌ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের শরিকদের আহ্বান জানিয়েছেন ঐ নূতনের কেতনকে অভিনন্দন জানাতে, উচ্চে তুলে ধরতে সমাজতান্ত্রিক সংগ্রামের এমনি সাফল্যকে। মার্কসবাদের স্তালিনবাদী বিকৃতিতে বিমুখ ও হতাশ হয়ে যাঁরা আধুনিক বুর্জোয়া দর্শনে আকৃষ্ট হচ্ছেন তাঁদের এমনি দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে এসে নূতনতর উদ্যমে প্রগতির আন্দোলনে শামিল হতে ডাক দিয়েছেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এমনি করেই লুকাক্‌স্‌ একজন মার্কসবাদী তত্ত্ববিদের কর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন। কোনো অবস্থার নিস্পৃহ নির্বিকার উপস্থাপনের শুষ্ক পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে লুকাক্‌সের উৎসাহ কোনো দিনই ছিল না, তাঁর অনুসন্ধিৎসার মূল লক্ষ্য ছিল অতীতের জাবরকাটা নয়, বর্তমানের নির্জীব কূটকচালি নয়—অতীত ও বর্তমানের প্রাণশক্তিটুকু নিঃশেষে

আহরণ করে নিয়ে প্রাণময় ভবিষ্যতের দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া। তত্ত্ববিদ্‌রূপে লুকাক্‌সের এই প্রকৃত মার্ক্সীয় চরিত্র লক্ষ্য করে অধ্যাপক রয় প্যাসকাল একদা লিখেছিলেন: "Lukacs' criticism of the work of Thomas Mann, the greatest living German novelist, gives an excellent example of the function of the Marxist critic —we do not go too far in asserting that Lukacs' warm appreciation and sharp criticism of Mann's achievement has contributed largely to the latter's development from the troubled aestheticism of his early years, as in *Death in Venice*, to the profound exposition of the corruption of modern bourgeois culture in *Dr. Faustus.*"[১৬] টমাস মান স্বয়ং এই কথার স্বীকৃতি দিয়ে গেছেন, লুকাক্‌সের সমালোচনা তাঁর মানসজীবনে কী বিপুল পরিবর্তন এনে দিতে পেরেছিল তার কৃতজ্ঞ উল্লেখ তিনি বারংবার করেছেন।

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার এমন একজন দিশারী তাই আমাদের স্মৃতিতে অমর হয়ে থাকবেন।

সূত্র:

১. Georg Lukacs. *The Meaning of Contemporary Realism*, Merlin Press, London, 1963. Pp. 105-106.
২. ঐ, Pp. 9. ৩. ঐ, Pp. 124-7. ৪. ঐ, Pp. 1-8-9. ৫. ঐ, Pp. 91-2
৬. ঐ, Pp. 103. ৭. ঐ, Pp. 8. ৮. ঐ, Pp. 7. ৯. ঐ, Pp. 133.
১০. Georg Lukacs, *Solzhenitsyn*, Merlin Press, London, 1970. Pp. 16. ১১. ঐ, Pp. 30-1. ১২. ঐ Pp. 27. ১৩. ঐ Pp. 35. ১৪. ঐ, Pp. 13-4. ১৫. ঐ, Pp. 87.
১৬. George Lukacs, *Studies in European Realism*, Hillway Publishing Co., London. 1950. p. viii

যন্ত্রণা

সৌরী ঘটক

হাওড়া-ফারাক্কা প্যাসেঞ্জার একঘণ্টারও বেশি লেট করে রাত প্রায় দশটার সময় ছাড়ল ; তারপর লিলুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত রেললাইনের জালের ভেতর ঘটাঙ ঘটাঙ করে দুলেদুলে ধাক্কা খেতেখেতে এগিয়ে গিয়ে ব্যাণ্ডেল স্টেশনে যখন থামল তখন রাত প্রায় এগারটা।

একটা ছোট কামরার যাত্রী আমি। গাড়ির মধ্যে লেখা আছে 'ষোলজন বসিবেক'। কিন্তু ব্যাণ্ডেলে কিছু যাত্রী নেমে যাওয়ার পর ষোলজন যাত্রী আর রইল না।

চারখানা বেঞ্চি। এরমধ্যে ওধারের জানলার পাশের বেঞ্চিটায় এক মধ্যবিত্ত পরিবার। বয়স্ক গৃহকর্তা দরজার কাছে জেগে বসে রয়েছেন, আর ভদ্রমহিলা পা গুটিয়ে কোলের ছেলেটিকে বুকে নিয়ে পাশ ফিরে ঘুমোচ্ছেন। তাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝখানে শুয়ে রয়েছে আর দুটি সন্তান।

তার এধারের বেঞ্চিটায় সতরঞ্চি বিছিয়ে সুটকেশ মাথায় দিয়ে শুয়ে রয়েছে দুটি বয়স্ক ভদ্রলোক। তারা কখনও ঘুমোচ্ছে, কখনও তাকাচ্ছে আবার মাঝে মাঝে উঠে বসছে।

তাদের এদিকে বেঞ্চিতে বসে রয়েছে জনাতিনেক গোয়ালা। এরা নিয়মিত ছানা নিয়ে যায় কলকাতায়। সঙ্গে রয়েছে বড়-বড় বাঁক, ছোট এনামেলের প্যান। তাদের কোমরে গামছা, গায়ে ময়লা গেঞ্জি, বাঁকগুলো পাশে ঠেসিয়ে রেখে তারা একটা করে বিড়ি ধরিয়ে তিনজনে ভাগ করে খাচ্ছে আর মহাজনের সঙ্গে টাকার হিসেবের গোলমাল নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলরব করছে।

তাদের সামনে এধারের বেঞ্চিতে রয়েছি আমরা চারজন। তারমধ্যে আমি ছাড়া বাকি তিন্‌জনই অল্পবয়স্ক তরুণ, কুড়ি-একুশের মধ্যে বয়স। মাথায় লম্বা রুক্ষ চুল, গালে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, পরনে সৈনিকের মতো নীল প্যাণ্ট, গায়ে সোয়েটারের মতো পুরু নীল গেঞ্জি। পায়ে শাদা কেড্‌স্ জুতো।

শহরতলীর যাত্রীরা ব্যাণ্ডেল স্টেশনেই নেমে গেছে। বাকি যারা রয়ে

গেলাম এদের মধ্যে ঐ গোয়ালা কজন ছাড়া আমরা সবাই দূরের যাত্রী। আমাদের অবস্থা হলো ডিকেন্সের 'এ টেল অফ্ টু সিটিজ'-এর ঘোড়ার গাড়ির যাত্রীদের মতো, সহযাত্রীদের সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের মনে রয়েছে ভয়, সন্দেহ, আতঙ্ক, উদ্বেগ। আমরা কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছি না, কেউ কারও সঙ্গে কথাও বলছি না, জিজ্ঞেসও করছি না কে কোথায় যাবে। সবাই চুপচাপ বসে আছি। আড়চোখে এক-আধবার এর-ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি আর মনে-মনে ভাবছি ভালয় ভালয় গিয়ে পৌছতে পারলে বাঁচি।

যা দিনকাল পড়েছে তাতে সহযাত্রীদের সম্পর্কে আমাদের এই আতঙ্ক কোনো অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। গভীর রাতে এই গাড়ির ভেতর যেকোনো ঘটনাই ঘটতে পারে। এই সহযাত্রীদের মধ্যেই কেউ হয়তো হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ছোরা বার করে হুকুম করতে পারে 'যার যা আছে বার করে দাও'। প্রাণের দায়ে তখন সর্বস্ব দিয়ে খালি হাতে-পায়ে বাড়ি যেতে হবে। কিম্বা বাইরের কোনো দস্যুদল, মাঝপথে গোটা গাড়ি লুট করতে পারে, কিম্বা চোরেরা ফিস প্লেট চুরিকরার ফলে গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, কি গাড়ির ড্রাইভারই ইঞ্জিনের কয়লা ব্ল্যাকে বিক্রি করে সারারাত বাজে অজুহাতে গাড়ি নাও চালাতে পারে।

এ-ধরনের ঘটনা আজকাল প্রতিদিনই ঘটছে। সেজন্য নেহাৎ দায়ে না পড়লে আজকাল কেউ রাতের গাড়িতে যাতায়াত করে না। আর যারা করে ধন-প্রাণের মায়া ছেড়ে দিয়েই করে।

আমরাও সেইভাবেই চলেছি। এমন ভঙ্গি করে সব বসে রয়েছি যেন অন্য কোনোদিকে খেয়াল নেই। অথচ ভেতরে-ভেতরে আমাদের প্রত্যেকের মন ভীষণ সতর্ক। এমনকি গাড়ির চলার বেগে জোরে একটা শব্দ হলেও, আমরা চমকে উঠে এ-ওর দিকে তাকাচ্ছি।

তবে গাড়ির মধ্যে আমাদের সকলেরই বেশি সন্দেহ ঐ সামরিক ঢঙে পোষাক পরা যুবক তিনটির ওপর। কে ওরা? এই ছোট গাড়িতে উঠলই বা কেন? কোথায় বাড়ি? যাবেই বা কোথায়? এত চুপচাপই বা কেন? নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতেও তো পারে? তাহলেও তো কান পেতে শোনা যায় কি বলছে?

আমি আর সেই সস্ত্রীক ভদ্রলোকই বেশি করে লক্ষ্য করছি যুবক তিনটিকে। ওধারের বেঞ্চিতে অন্য যে-দুজন ভদ্রলোক শুয়ে আছে তারাও মাঝে

মাঝে উঠে বসে আড় নজরে ওদের দেখে নিচ্ছে। সবারই মনে আশঙ্কা এত চুপচাপ যখন রয়েছে তখন ঐ ছেলে তিনটে নিশ্চয়ই কিছু অঘটন ঘটাবে।

ত্রিবেণী, কুন্তিঘাট পার হয়ে গিয়েছে গাড়ি। ঢুকে পড়েছে গ্রামবাঙলার মধ্যে। রাত প্রায় বারোটা। বাইরে ঘুরঘুটি অন্ধকার। বর্ষাকাল। বিকেলের দিকে প্রবল বর্ষণ হয়ে গিয়েছে। আকাশ এখনও মেঘে ঢাকা। খোলা জানলা দিয়ে হুহু করে জলো হাওয়া গাড়িতে ঢুকছে। গাড়ি ধুক-ধুক করে চলছে। মাঝে মাঝে দু-একটা স্টেশনে থামছে। স্টেশনের টিমটিমে আলোয় দু-একজন যাত্রী ওঠানামা করছে।

গাড়ির মধ্যে আমরা সবাই চুপচাপ বসে জেগে আছি। মাঝে-মাঝে ওপাশের ভদ্রলোকের নিদ্রিত শিশুরা দু-একবার কাশছে, বৌটি ঘুমের ঘোরে দু-একবার পাশ ফিরছে, আমাদের মধ্যে কেউ হয়তো দু-একবার নাক ঝাড়ছে, এ-ছাড়া গাড়িতে আর কোনো শব্দ নেই।

ব্যাণ্ডেলের পর গুপ্তিপাড়া হলো ইঞ্জিনের জল নেওয়ার স্টেশন। গাড়ি এখানে প্রায় মিনিট দশেক থামে। দিনের বেলায় যাত্রীরা ওঠানামা করে, চাওয়ালা চা হাঁকে, হকাররা শশা, মুড়ি, মিষ্টি, চানাচুর, নানারকম মনিহারি জিনিস, ওষুধপত্র হেঁকে-হেঁকে বিক্রি করে, ভিখারী হারমোনিয়ম বাজিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে করে। নানা বিচিত্র কলরবে মুখর হয়ে থাকে স্টেশনটা।

কিন্তু এখন গভীর রাতে সে সবের কোন চিহ্ন নেই। প্লাটফরমের আবছা আলোয় গাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ইঞ্জিন্ গাড়ি থেকে খুলে গিয়ে হাঁসফাঁস করে জল নিচ্ছে আগে। প্লাটফরমের ওপর দুটো সশস্ত্র পুলিশ ভারি জুতোয় থপথপ আওয়াজ তুলে ঘোরাফেরা করছে। ওধারে রেললাইনের খাদের ভেতর গ্যাঁঙর-গ্যাঁঙর করে একটানা ব্যাঙ ডেকে চলেছে।

গোয়ালা ক'জন আগেই নেমে গিয়েছে। ওরা যতক্ষণ ছিল মনে খানিকটা সাহস ছিল। কিন্তু এখন একেবারে অসহায় লাগছে নিজেকে। মনেমনে ঠিক করে রেখেছি যদি ওরা ছোরা বার করে তো হাত তুলে দাঁড়িয়ে বলব, 'যা আছে সমস্ত নিয়ে যাও শুধু প্রাণে মেরো না।'

ইঞ্জিনের জলভরা প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে এমনসময় আমার পাশে বসে থাকা সেই যুবক তিনজনের একজন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। তারপর আমার পায়ের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে অন্ধকার স্টেশনে নেমে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

যুবকটি ওঠামাত্র গাড়িশুদ্ধ সবাই আমরা সচকিত হয়ে উঠলাম। ওপাশের বেঞ্চিতে যে-দুজন যাত্রী শুয়েছিল তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল। সস্ত্রীক ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে জোরে একটা ধাক্কা মারামাত্র ভদ্রমহিলা উঠে বসে তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ছেলে দুটিকে আগলে ধরল।

ইঞ্জিন এসে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে জোড়া লাগল গাড়ির সঙ্গে। তারপর গার্ড হুইস্‌ল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঁশি বাজিয়ে গাড়ি চলতে শুরু করল।

গাড়ি ছাড়ার সঙ্গেসঙ্গে সেই যুবকটি দড়াম করে দরজা বন্ধ করে নিজের জায়গায় গিয়ে বসল। গাড়িশুদ্ধ আমরা সবাই অপলকে তাকিয়ে ওদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করছি এমনসময় সেই যুবকটি হঠাৎ আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল 'এটা কোন স্টেশন ?'

তার মুখে কথা শুনে গাটা শিরশির করে উঠল। চমকে উঠে জবাব দিলাম 'গুপ্তিপাড়া।'

'কোন জেলা ?'

'হুগলি ?'

যুবকটি চুপ করে গেল। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম আবার কি যেন ভাবছে। অন্য-দুজন সেই আগেকার মতো নির্বিকার। গাড়ির মাঝখানে একটা চল্লিশপাওয়ারের বাল্‌ব জ্বলছে। তার অস্পষ্ট আলোয় মুখের রেখাগুলো ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবে এত অল্পবয়সে এত বেশি ভাবনা ওদের যেন আরও অস্বাভাবিক করে তুলেছে।

কয়েক-মিনিট এইভাবে কেটে গেল। তারপর সেই যুবকটি হঠাৎ আবার মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল 'পশ্চিমবাঙলার সবচেয়ে বড় জেলা কি ?'

প্রশ্নটা শুনে একটু হতভম্ব হয়ে গেলাম। চোরডাকাতের আবার জেলা ছোট-বড়তে কি দরকার! জবাব দিলাম 'চব্বিশ পরগণা।'

'কত বড় ? আমাদের ময়মনসিংয়ের চেয়েও বড় ?'

বলে কি ছেলেটা! আমাদের ময়মনসিং! মানে! জয়বাঙলার লোক নাকি ? জিজ্ঞেস করলাম 'কোথায় বাড়ি আপনাদের ?'

'বাঙলাদেশ।'

'বাঙলাদেশ ? মানে ? পূর্ববঙ্গ ?'

'হাঁ ?'

গৃহযুদ্ধ চলছে বাঙলাদেশে! সেখানকার লোক! জিজ্ঞেস করলাম 'চলে

এসেছেন বুঝি ?'

'হাঁ।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'কলকাতা।'

'এখন চললেন কোথায় ?'

'এখন!' একটু দম নিল ছেলেটি, তারপর—আস্তে আস্তে বলল 'আজকে চললাম বহরমপুর। তারপর কাল আবার বাঙলাদেশেই ফিরে যাব।'

চোর, গুণ্ডা, খুনজখমের পরিবেশে আতঙ্কিত গাড়ির যাত্রী ক'জনের মুখ-চোখের চেহারা যেন অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। পূর্ব-বাঙলার ঘটনা খবরের কাগজ আর রেডিয়োর মারফতে আজ গ্রামের মানুষেরও অজানা নেই। সেই বৌটি দেখলাম অদ্ভুত কৌতূহল নিয়ে যুবক তিনটিকে দেখছে। আমরাও নিজের অজান্তে ছেলে তিনটি সম্পর্কে মনেমনে কৌতূহলী হয়ে উঠেছি।

এবার আমিই শুরু করলাম কথাবার্তা। জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনাদের তিনজনের বাড়ি কি বাঙলাদেশ ?'

'জি, হাঁ।'

'কোন জেলা ?'

'আমার বাড়ি কুষ্টিয়া, ওর বাড়ি ফরিদপুর আর ও ঢাকা শহরের।'

'তিনজনে তিন জেলার ?'

'আমাদের আর জেলা শহর গ্রাম বলে কিছু নেই, কোথাকার মানুষ যে কোথায় চলে গিয়েছে তার কোনো হদিশ নেই। সবকিছু ওলট-পালট হয়ে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।'

'আপনাদের নাম ?'

'আমার নাম ফজলে করিম। ওর নাম সামশুল আলম, আর ওর নাম আবদুল জব্বার।'

আবদুল জব্বার বলে যে-ছেলেটিকে দেখাল তারই বাড়ি ঢাকা। আমি সঙ্গেসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা মশায় ঢাকা শহরে শুনলাম শাঁখারি পট্টি ট্যাঙ্ক দিয়ে ভেঙে গুঁড়ো করে সমান করে দিয়েছে। কোনো লোককে পালাতে দেয়নি। হাজার-হাজার লোককে চারিধার ঘিরে গুলি করে মেরে ফেলেছে ? সত্যি ?'

জব্বার আস্তে-আস্তে বলল, 'শধু শাঁখারি পট্টি নয় গোটা শহরটাকেই ওরা

ধ্বংস করে দিয়েছে।'

'গোটা শহরটা? ঘর বাড়ি সব?'

'হাঁ প্রায় তাই। আপনি কখনও গেছেন ঢাকায়।'

'না।'

'তাহলে রাস্তার নাম করে-করে আপনাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম।'

না, রাস্তার নাম করে আমাকে বোঝাবার কোনো উপায় নেই। আমি পশ্চিম-বাঙলার মানুষ। এই অঞ্চলে বড় হয়েছি। বড়শহরের মধ্যে দেখেছি কলকাতা। আর বাঙলাদেশের বাইরে একবার চেঞ্জে গিয়েছিলাম দেওঘর। স্বাধীনতা পাওয়ার আগেই আমার জ্ঞান হয়েছে। দেশবিভাগ হয়েছে জানি। গ্রামে, শহরে, পথে, ঘাটে, হাওড়া স্টেশনে বহু বাস্তুহারা দেখেছি। তবে পাকিস্তান দেখেছি ম্যাপে। মালদহ, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগণা জেলার প্রান্ত থেকে ম্যাপে আঁকা আছে এক নীল ভূখণ্ড। সেটা পাকিস্তান। সেই ম্যাপের নীল আজ নীল বিষ হয়ে জ্বলছে এটাও জানি।

সুটকেশ মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকা ভদ্রলোক দুজন এতক্ষণ বেশ বসেবসে আমাদের কথা শুনছিল।

এইবার তাদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা মশায় ওপর থেকে বোমা মেরে সব গ্রাম-শহর ধ্বংস করে দিয়েছে একি সত্যি।'

'সত্যি', জবাব দিল ফজলে করিম।

'আপনি নিজে দেখেছেন বোমা ফেলা?'

'দেখব না কেন? আমাদের কুষ্টিয়াতেই বোমা ফেলেছে।'

'কি করে ফেলল মশায় একটু বলুন তো? কি হলো তারপর?'

তার অপর সঙ্গী তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'হাবার মতো কথা বলছ কেন? বানের সময় এরোপ্লেন থেকে চাল ফেলা দেখনি? সেই রকম?'

'তুমি থাম। ওকে বলতে দাও। বলুন ত মশায় খুলে।'

ফজলে করিম বলল, 'উনি যা বললেন প্রায় তাই। প্লেনগুলো উড়ে এসে নিচু হয়ে বোমা ফেলল। দাউ-দাউ করে জ্বলতে লাগল ঘর-বাড়ি, মানুষ-জন টুকরো-টুকরো হয়ে ছিট্‌কে মরে পড়ে রইল চারিধারে।'

'তাজ্জব কাণ্ড। এই ক'বছর আগে সব 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে দাঙ্গা করল। আবার পাকিস্তান হওয়ার পর বোমা মেরে মানুষ মারতে লাগল।'

'হাঁ, যতসব মোছলমানী ব্যাপার। সেথ আর খানে লাগিয়ে দিল লড়াই

মাঝখান থেকে আমাদের লাভ হলো এককোটি রিফিউজি। এমনিতেই তো পশ্চিম বাঙলার ছেলেদের চাকরির উপায় নেই তার ওপর আরও এককোটি ঢুকল।'

হঠাৎ আলোচনাটা একটা কুৎসিৎ মোড় নিল। চুপ করে বসে রইলাম। যুবক তিনটিও খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তারপর ফজলে করিম আস্তে-আস্তে বলল 'আমরা স্বাধীন হলে সব ফেরৎ নিয়ে যাব।'

'আর আপনারা স্বাধীন হয়েছেন ? আর সত্যি বলছি মশায় স্বাধীন হওয়ার চেয়ে পরাধীন থাকা অনেক ভালো। কি স্বাধীন হলাম আমরা। বাড়ি থেকে চোদ্দ-বছর ষোল-বছরের ছেলেগুলোকে ধরে-ধরে নিয়ে গিয়ে কাটছে। এর চেয়ে মশায় আপনাদের মতো বোমা ফেলে বাড়িশুদ্ধ মেরে ফেলা ভালো।'

চুপ করে বসে আছি। সাধারণ অরাজনৈতিক মানুষ। মনে যা আসছে, না চেপে রেখে প্রকাশ করছে। গাড়ি ধাত্রীগ্রাম পার হয়ে গিয়েছে। এরপর সমুদ্রগড়। তারপরে নবদ্বীপ।

হঠাৎ সেই বৌটিকে দেখি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নাক ঝাড়ছে। সঙ্গেসঙ্গে স্বামী ঝেঁঝে উঠল, 'তুমি গাড়ির মধ্যে ফ্যাচ-ফ্যাচ করে কাঁদতে-লেগো না।'

আমরা সবাই মুখ ফিরিয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম। ভদ্রলোক সঙ্গে-সঙ্গে যেচে কৈফিয়ৎ দিল, 'আর বলবেন না। ওর এক ভাই পড়ত নবদ্বীপে কলেজে। খুন হয়েছে।'

কি হয়েছিল ? এ পাশের ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করল সঙ্গে-সঙ্গে।

ও-ভদ্রলোক উত্তর দিল, 'কি করে বলব বলুন ! এরা চার বোন। তারপর ভাইটা। মাত্র উনিশবছর বয়স। সকালে খেয়ে-দেয়ে কলেজে গেল আর ফিরল না। খোঁজ ! খোঁজ ! রাতে আর পাওয়া গেল না। সকালে দেখা গেল গলা কাটা, পড়ে আছে টাউনের ধারে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? টেলিগ্রাম পেলাম, লোক এসেছিল তার মুখে সব শুনলাম। শ্বশুরমশায় তো শুনলাম আধপাগলা হয়ে গিয়েছেন, শাশুড়ি ঠাকরুণ ঘন-ঘন ফিট্। কিন্তু গিয়ে কি করব বলুন দেখি ?'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, 'আ-হা-হা ! হবে না। উনিশবছরের ছেলে, সোজা কথা। আর দু'বছর পরেই তো ভার নিতে পারত সংসারের।'

'তা তো পারত মশাই, কিন্তু ?'

'হাঁ। ঘরে ছেলে থাকা আজকাল হয়েছে এক জ্বালা।'

বৌটি মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদছে ফুলে-ফুলে, তার কান্নার প্রতিধ্বনিতে ভারি হয়ে উঠেছে গাড়ির বাতাস।

একটু চুপ করে থেকে প্রসঙ্গটা পরিবর্তন করার জন্য ফজলে করিমের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার পরিবারের লোকজন সব কোথায় ?'

'আমার' একটু চুপ করে থাকল ফজলে করিম, একবার ফিরে তাকাল বৌটির চোখের জলে ভেজা মুখখানার দিকে, তারপর সহজ শান্ত গলায় জবাব দিল, 'সব মরে গিয়েছে বোমায় ?'

'সেকি ?'

'হাঁ। একেবারে চৌমাথার মোড়ের কাছে ছিল বাড়ি। সামনে জুতোর দোকান। বোমা পড়ে সব শেষ।'

'আপনি তখন কোথায় ছিলেন ?'

'মিলিটারি ট্রেনিং নিতে গিয়েছিলাম শহরের বাইরে।'

'তারপর ?'

'তারপর আর কি ? ফিরে এসে দেখলাম সব শেষ।'

'কে ছিল আপনার বাড়িতে ?'

'সবাই ছিল। মা, বাবা, ভাই, বোন।'

'একজনও বেঁচে নেই ?'

'না।'

এতক্ষণ বৌটির কান্না শুনে খারাপ লাগছিল এখন ফজলে করিমের কথা শুনে হঠাৎ যেন ভয়-ভয় করে উঠল ভেতরে। সামশুল আলমের দিকে তাকিয়ে আস্তে-আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওনার বাড়ির খবর ?'

'হাঙ্গামা শুরু হওয়ার আগে ও রাজসাহী চলে আসে। তারপর আর ফিরতে পারেনি। জানে না কি খবর। তবে ওর বাবা আর বড়ভাইকে গুলি করে মেরে ফেলেছে শুনেছি।'

'অন্যরা।'

'শুনেছি তো পালিয়েছে।' 'আর ওনার ?' দেখালাম জব্বার সাহেবকে।

'ওর ও বাড়িশুদ্ধ সব মেরে ফেলেছে। বাড়িটা গুঁড়ো করে দিয়েছে ট্যাঙ্ক দিয়ে। ওর এক দিদি পড়ত ইউনিভারসিটিতে শুনেছি তাকে নাকি মিলিটারি ধরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে ক্যান্টনমেন্টে।'

একটা জোর ঝাঁকানি খেয়ে দুলে উঠল গাড়িটা। মনে হলো বাইরের অন্ধকার যেন ধাক্কা খেয়ে কেঁপে উঠল থরথর করে। গাড়ির ভেতর আমরা মানুষ ক'জন নির্বাক, হতভম্ব। আবছা অন্ধকারে এতগুলো মৃত্যুর খবর শুনে কেমন যেন ছমছম করতে লাগল গা।

খানিকক্ষণ পরে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠল, 'পালিয়ে আসতে পারেননি। সব মেরে ফেলল? এত লক্ষলক্ষ লোক পালিয়ে এল আর আপনারা পারলেন না। বোনটাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে তাহলে তো তার মান ইজ্জত থাকবে না।' এই ভদ্রলোকই একটু আগে বাঙলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বলছিল শেখ আর খানের লড়াই, স্বাধীন হওয়ার থেকে পরাধীন থাকা ভালো।

উত্তেজনায় চিৎকার করছেন ভদ্রলোক। অন্য সবাই স্তব্ধ। বৌটিও ভাইয়ের শোক ভুলে অপলকে তাকিয়ে রয়েছে ছেলে তিনটির দিকে।

ঝিমঝিম করছে মাথার ভেতর। ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যেক মানুষেরই বুকে কিছু কিছু বেদনার ক্ষত আছে। কিন্তু এই যে তিনটি তরুণ। বয়স যাদের কারোরই কুড়ি-একুশের বেশি নয়। ওদের ঐ ছোট বুকে এত বেদনা ভরে রেখে চুপ করে বসে আছে কি করে?

আমি নামব কাটোয়ার পর গঙ্গাটিকুরি স্টেশনে। বাড়িতে আমার বুড়ো মা-বাপ আছে, স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে আছে। আমি যাব বলে ঘরে আমার খাবার ঢাকা দেওয়া আছে, আমার জন্যে পাতা আছে পরিচ্ছন্ন শয্যা। আমার ব্যাগে রয়েছে লজেন্স, বিস্কুট, আপেল। আমি যাওয়ামাত্র আমার ছেলেমেয়েরা ঘুম থেকে উঠে সেগুলো নিয়ে কাড়াকাড়ি করে খাবে। আমার বড় ছেলে, প্রায় এদেরই সমবয়সী, সামনের বার কলেজে পড়বে, তাকে তো আমার নেহাৎ শিশু বলেই মনে হয়। আমার বড়মেয়ে মাত্র পনেরবছর বয়স, ওর মা তো এখনও রেগে গেলেই ধরে ঠেঙায়। যদি কোনোদিন এমন হয়—পরিবারের আমাদের সবাইকে মেরে ফেলেছে। আমার ঐ মেয়েকে সৈন্যরা ধরে নিয়ে গিয়ে বলাৎকার করছে, আমার ছেলে দেশছাড়া হয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াচ্ছে?

রগের শিরাগুলো ফুলে উঠে দপদপ করছে। গরম হয়ে উঠছে কান নাক। মাথাটা জানলা দিয়ে বার করে দিলাম। হুহু করে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা কপালের ওপর দিয়ে বয়ে যেতে লাগল।

আমি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি। আমার পেশা শিক্ষকতা। বাঙালি হিসাবে আমার অহঙ্কারের শেষ নেই। গোঁড়া জাত্যাভিমান আমার রক্তে।

আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম লিখেছেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ 'নোবেল প্রাইজ' পেয়েছেন, আমাদের ভাষা জগতের শ্রেষ্ঠ ভাষা, আমাদের রামমোহন রায়, আমাদের বিবেকানন্দ, আমাদের ক্ষুদিরাম কত কি? কবে গোখলে বলেছিলেন, 'What Bengal thinks today, India will think to-morrow.' এ-কথা আমি ছাত্রদের হাজারবার পড়িয়েছি। প্রকাশ্যে নয়, ঘরোয়া আলোচনায় আমি বিহারীদের বলি ছাতুখোর, উড়িষ্যাবাসীদের বলি উড়ে, পাঞ্জাবীদের বলি খোট্টা। কথায়-কথায় মিছিল, ছাত্রধর্মঘট আমি সমর্থন করি না; কিন্তু তবু জহরলাল নেহেরুর সেই উক্তি যখন মনে পড়ে, 'কলকাতা মিছিলের নগরী', 'কলকাতা আমার দুঃস্বপ্ন' তখন মনে-মনে বলি 'এ বাঙলাদেশ? বিহার, ইউ পি, পাওনি যে যা বোঝাবে তাই বুঝবে।'

আর সেই বাঙলাদেশ বলতে আমি বুঝি পশ্চিমবাঙলা, সেই বাঙালি বলতে পশ্চিমবাঙলার সাড়েচারকোটি মানুষ। পূর্ববাঙলার সাড়েসাতকোটি মানুষ সম্পর্কে আমার ধারণা ওরা সব গরিব মুসলমান, জটিল রাজনৈতিক তত্ত্বের ওরা বোঝেই বা কি, আর করবেই বা কি? ভাষা নিয়ে গুলি চলছে কি হরতাল হয়েছে তো কি হয়েছে। এরকম গুলি আমাদের দেশে উঠতে-বসতে চলে, ও-রকম হরতাল খেতে-শুতে হয়।

কিন্তু আজ এই গভীর নিশীথে এই দুদিক প্রসারিত অন্ধকারের সমুদ্রের মধ্যে, এই ছোট্ট গাড়ির মিটমিটে আলোয় ঝাঁকানি খেতেখেতে এই ছেলে তিনটির দিকে তাকিয়ে আমার ভাবনা-চিন্তা কেমন যেন সব ওলট-পালট হয়ে যেতে লাগল।

বাঙলাদেশের মানুষ হিসাবে ব্যাপক মৃত্যুর সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকে। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হতে দেখেছি ম্যালেরিয়ায়, কলেরায় পাড়াকে পাড়া ধ্বংস হতে দেখেছি, পঞ্চাশ সালের দুর্ভিক্ষে পঞ্চাশ লক্ষ বাঙালির মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছি, দেখেছি ফ্যান দাও ফ্যান দাও বলে কঙ্কালসার মানুষ পথে পথে মরেছে, তাদের লাশ শেয়াল কুকুরে ছিঁড়ে খেয়েছে। বইয়ে পড়েছি এর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এক তৃতীয়াংশ মানুষ না খেয়ে মরেছে বাঙলা দেশে। ইদানীং দেখছি পাড়ায়-পাড়ায় শিশু কিশোরদের মৃতদেহ পড়ে রয়েছে পথের ধারে। সেইজন্যে মৃত্যু দেখে আর কোন প্রতিক্রিয়া হয় না আমার মনে। রেডিয়োর খবর শোনার মতো প্রতিদিন কিছু মৃত্যুর সংবাদ শুনতে অভ্যস্থ হয়ে গিয়েছে কান। কিন্তু এত ভোঁতা মনও আজ এই ছেলে তিনটির দিকে তাকিয়ে

থর থর করে কাঁপতে লাগল।

গাড়ি নবদ্বীপে এসে থেমেছে। সেই সস্ত্রীক ভদ্রলোক ছেলেপিলে নিয়ে নেমে গেল এখানে। বৌটি যাওয়ার আগে বারবার ফিরে-ফিরে তাকাল ছেলে তিনটির দিকে হয়ত তার নিজের ভাইয়ের স্মৃতি মনে পড়ছিল ওদের দেখে। এখন গাড়িতে ওরা তিনজন আর আমরা তিনজন। মাঝের বেঞ্চির সেই বুড়ো দুজন নামবে কাটোয়ায়। আমি তার পরের স্টেশনে। নবদ্বীপ থেকে দাঁইহাট পর্যন্ত প্রায় একঘণ্টা গাড়ি চলবে একটানা। মাঝে থামবে না কোনো স্টেশনে। সেইজন্যে ড্রাইভার গাড়ির গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে। হু হু করে ছুটছে গাড়ি, ঘটাং ঘটাং করে জোর শব্দ হচ্ছে লাইনে, ঝাঁকুনি লাগছে প্রচণ্ড। সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার কথা শুরু করেছেন। জিজ্ঞেস করছেন 'আচ্ছা এখন ভেতরের অবস্থা কি ?'

'এখন গেরিলাযুদ্ধের সংগঠন গড়া হচ্ছে গ্রামে গ্রামে।'

'স্থানীয় লোক সাহায্য করছে ?'

'করছে বইকি ? নইলে করছে কে ?'

'আচ্ছা রাজাকার হয়েছে কারা ?'

'ওরা প্রায় বেশির ভাগই অন্য প্রদেশের লোক।'

'তবে গ্রামে গ্রামে সৈন্যদের পথ দেখাচ্ছে কে ? আওয়ামী লীগের বা অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের বাড়ি চেনাচ্ছে কে ?'

'মুশ্লীম লীগের লোকেরা। তবে বিভিন্ন অঞ্চলে ওদের কিছু নেতাকে খতম করার পর অনেকটা ঠাণ্ডা হয়েছে।'

'গ্রামে সৈন্যরা যাচ্ছে ?'

'পাকা রাস্তার দুধারে যে গ্রামগুলো ছিল সে সব জালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছে। শহর থেকে দূরের গ্রামগুলোর ক্ষতি খানিকটা কম।'

'কত লোক মরেছে বলে আপনাদের ধারণা।'

'কয়েক লক্ষ হবে। তবে এদের মধ্যে বেশির ভাগই যোয়ান ছেলে।'

'যোয়ান ছেলে ?'

'হাঁ যোয়ান ছেলেদের রক্ষা নেই। ধরে নিয়ে গিয়ে কোথায় উধাও করে দিচ্ছে আর পাত্তাই পাওয়া যাচ্ছে না। এর কোন বাছবিচার নেই। যেমন ধরুন কুষ্টিয়া সহরে। পাকিস্থানী সৈন্যরা এসে ঘোষণা করল সব সরকারি কর্মচারীকে কাজে যোগ দিতে হবে। অনেক কর্মচারী আমাদের নিষেধ না শুনে

যোগ দিল। যোগ দেওয়ামাত্র যাদের বয়স কম তাদের নিয়ে মেরে ফেলল।'

'আর শুনলাম বহু মেয়েকে নষ্ট করেছে।'

'হাঁ যেখানেই সৈন্যরা গিয়েছে সেখানেই পাইকারি হারে অত্যাচার করেছে মেয়েদের ওপর।'

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর—একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা কোথায় যাবেন।'

'বাঙলা দেশেই ফিরে যাব।'

ভদ্রলোক একটু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল 'তার মানে? আবার পূর্ব-বাঙলায় ফিরে যাবে?'

'হাঁ?'

'এই বলছ সেখানে, যোয়ান ছেলে দেখলে আর রাখছে না তবে সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে?'

ফজলে করিম আস্তে-আস্তে বলল 'যুদ্ধ'।

'যুদ্ধ? বলে কি ছোকরা'—বৃদ্ধ তার সঙ্গীর মুখের দিকে সমর্থনের জন্য এক নজর তাকালেন। তারপর সহসা একটু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন 'পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে। ঢাল নেই, তরোয়াল নেই বোমা কামানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে? কি সাহস! কেন? এদেশ কি কামড়াচ্ছে কুট কুট করে।' —বলেই হয়ত বৃদ্ধের খেয়াল হলো অচেনা লোককে এ ভাবে উপদেশ দেওয়ার অধিকার তাঁর নেই। তাই সহসা গলার স্বর নামিয়ে বললেন, 'বুড়ো মানুষ, কিছু মনে করো না বাবা। তুমি আমার ছেলে কেন নাতির বয়সী হবে। তাই বারণ করছি, যেও না। বাড়ির তো সবাই গিয়েছে এবার তুমি ম'লে আর ও বংশ বলতে থাকবে না। তারচেয়ে যতদিন গোলমাল না মেটে এ দেশেই থাক! কিছু না হোক হকারি করেও দুটো পেটের ভাত জোটাতে পারবে?'

নিজের কণ্ঠস্বরের ব্যাকুলতায় বৃদ্ধ বোধহয় নিজেই লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেলেন। ইতিমধ্যে গাড়ি কাটোয়া স্টেশন এসে গেল। সতরঞ্চি উঠিয়ে সুটকেশ হাতে করে নেমে গেলেন বৃদ্ধ দুজন।

ছেলেবেলায় গ্রামে প্রবাদ শুনেছিলাম তিনমাথাওয়ালা লোকের কাছে পরামর্শ নিও। অর্থাৎ বয়সের ভারে কুঁজো হয়ে যার মাথা হাঁটুর সঙ্গে ঠেকে গিয়েছে তারই জীবনের অভিজ্ঞতা সবচেয়ে বেশি। কিন্তু জীবনের অভিজ্ঞতা

কি শুধু বয়স হলেই হয় ? আমার বয়সও তো পঞ্চাশের কোঠায়। কিন্তু আমার অর্ধেকেরও কম বয়সী এই যে তিনটি তরুণ আকণ্ঠ বিষপান করে নীলকণ্ঠ হয়ে বসে রয়েছে তার শতভাগের একভাগও কি আমার এই দীর্ঘজীবনে ছুয়েছি।

গঙ্গাটিকুরি স্টেশনে নেমে গেলাম। রাত প্রায় আড়াইটা। মেঘে ঢাকা অন্ধকারে নিশুতি গ্রাম বাঙলা। যে লোকটি আমায় এগিয়ে নিতে এসেছিল সে হ্যারিকেনটি হাতে করে মোট মাথায় আগে আগে চলেছে। আমি চলেছি তার পেছনে। আমার মনের মধ্যে ভাসছে তিনটে তরুণের মুখ। বন্দুক হাতে করে ওরা কাল যাবে হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করতে। হয়ত সে লড়াইয়ে ওরা মরে যাবে, হয়ত কোনো বনের ধারে কি খালের পারে ওদের মৃতদেহ পড়ে থাকবে। পাকিস্তান রেডিও ঘোষণা করবে 'তিনজন দেশদ্রোহী খতম।'

দেশদ্রোহী! হাঁ এই তরুণের দল, সর্বস্ব হারিয়ে আজ যাদের বুক শূন্য তারা দেশদ্রোহী! আর যারা ওদের ঘরবাড়ি, গ্রাম, সহর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, যারা ওদের পরিবার পরিজন সবাইকে হত্যা করেছে, যারা ওদের মা বোনকে ক্যান্টনমেণ্টে ধরে নিয়ে গিয়ে প্রতিদিন বলাৎকার করছে, তারা ধার্মিক, তারা সভ্য!

কিন্তু ওরা যা বলে বলুক আকাশের গ্রহ নক্ষত্র থেকে এই মাটির তৃণগুচ্ছটি পর্যন্ত জানে ওদের পরিচয়। আর তা জানে বলেই তো এই খণ্ডিত, অবহেলিত, অপমানিত, বাঙলাদেশের মুক্তির ভার ইতিহাস ওদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। তার কারণ ইতিহাস জানে একমাত্র বাঙলাদেশের এই তরুণরাই পারবে মৃত্যুকে পরাজিত করতে। কারণ যে জীবনীশক্তি এদেশের মাটিতে সঞ্জীবিত মৃত্যু আর ধ্বংস তার কাছে অসহায়। শীত প্রতিবছর এদেশের তরুলতা শাখা হতে প্রতিটি পাতা ঝরিয়ে নেয়, আবার প্রতি বছরই বসন্ত সেই সব মৃত শাখাকে নূতন পাতায় ভরিয়ে দেয়। প্রখর গ্রীষ্ম এখানকার মাটি থেকে রসের শেষবিন্দুটি পর্যন্ত শুষে নেয়, পুড়ে যায় প্রতিটি তৃণখণ্ড, কিন্তু বর্ষার সমারোহে আবার এদেশের মাটির সর্বত্র নতুন করে জেগে ওঠে সবুজ তৃণাঙ্কুর, এদেশে প্রতি বছর গ্রীষ্মের মরা নদী বর্ষায় দুকূল ছাপিয়ে গান গেয়ে ওঠে, প্রতি বছর দুর্ভিক্ষ, মহামারী বন্যায় এদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে যায়, কিন্তু আবার নতুন মানুষ নতুন উদ্যম নিয়ে জেগে ওঠে।

এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির কাছে মৃত্যু চিরকাল পরাজিত হয়েছে আজও হবে। এক কোটি দু কোটি নয়, অর্ধেকেরও বেশি মানুষকে মেরে ফেললেও শত্রুরা এদেশে জিততে পারবে না।

গাড়ি বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। তার ঘস-ঘস শব্দটা মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। আমি বাড়ির কাছে এসে পড়েছি। জীবনে আজ এই প্রথম লজ্জা লাগছে বাড়ি ঢুকতে।

খালি মনে পড়ছে তিনটি তরুণের মুখ। ওরা ও আমি একই বাঙালি জাত। একই নদী বয়ে গিয়েছে দু দেশের ওপর দিয়ে, একই পাখি গান গায় দু দেশের বনে, একই ভাষায় কথা বলি আমরা, একই আমাদের সংস্কৃতি, একই সাহিত্য।

আর এই ভাষা, সংস্কৃতি, মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য ওরা তিনজন চলেছে প্রাণ দিতে তার আমি চলেছি ঘরে উষ্ণশয্যায় ?

কেমন যেন যন্ত্রণা হচ্ছে মাথার ভেতর।

নচিকেতা জানিতে চাহিলেন···

অমলেন্দু চক্রবর্তী

রাত তখন কত হবে! হাত ঘড়িটা যদিও কব্জিতেই বাঁধা ছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, মনে নেই, আচমকা নাড়া খেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতেই, একেবারে অবিশ্বাস্য এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার মুখোমুখি, প্রথম ধাক্কায় ঠিক যেন বিশ্বাসই করতে পারেন নি ডঃ এস্, সি, দাশগুপ্ত, অন্তত কয়েক পলক নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর, যখন শরীরের রক্তচাপ, কণ্ঠনালীর তেষ্টা, করোনারির সেই অস্থিরতাটা প্রায় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে সেরিব্রায় ধাক্কা মারল এবং মাথার পরিপূর্ণ মসৃণ টাক থেকে ঘাড়-গর্দান বেয়ে গলগল করে ঘামে-ঘামে জামা-গেঞ্জি-পায়জামা ভিজে চপ্‌চপ্ হয়ে উঠতেই যখন স্পষ্ট অনুভব করলেন—স্বপ্ন নয়, নিদারুণ বাস্তব, পায়ের তলায় মাটি নেই, মাটির উপর এক্সপ্রেস্ ট্রেন একটানা লোহার চিৎকার তুলে হুড়মুড় করে ছুটছে, সুন্দর সাজানো-গোছানো নির্জন ফার্স্ট-ক্লাশ কামরা, ফ্যান চারটেই, টিউব-লাইটের নীলচে আলো, ঝক্‌ঝকে আরশিতে ফ্যান-টিউব শেকলে-ঝোলানো সবুজ-রেক্‌সিনে মোড়া বাঙ্ক, বাঙ্কের পাশে দরজার মাথায় লোহার শেকল, লাল-হাতল, লাল হরফে 'আলার্ম', রেল-কর্তৃপক্ষের হুসিয়ারি দূর থেকে শুধু কতগুলি কালো সরলরেখা, কিছুই পড়া যায় না, টেবিলের উপর চশমা নামিয়ে রাখলে দিন দুপুরেও যিনি সামনের বেঞ্চের ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত মুখ দেখতে পান না, রাতদুপুরে তাঁর চোখে সবই আবছা আর ধোঁয়াটে! কিন্তু হাত বাড়ালেই যে শরীরটা ছোঁয়া যায়, যার কোমরের কাছে তাঁর নাক, শক্ত পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা সেই যুবক এবং তার হাতের জীবন্ত পিস্তলটা, নেহাৎ-ই যেন একটা খেলনা অথবা দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের মতো হালকা এবং হেলাফেলার কোনো জিনিস, ঠিক তারই দিকে তাক করে নিঃশব্দে উঁচিয়ে। এবং সেই যুবক, লম্বা ছিমছাম; সার্ট-প্যান্ট-জুতোর নিখুঁত বেশভূষায় সুন্দর চেহারার একুশ-বাইশ বছরের স্মার্ট ইয়ং-ম্যান, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র, যা কথায় কথায় আগেই জেনে নিয়েছিলেন, কথায়-কথায়, রাস্তাঘাটে

মানুষজনের সঙ্গে অকারণ কথা বলা যদিও তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ, বিশেষত বয়সের এত দুস্তর ব্যবধানে, প্রায় ত্রিশ বছরের অধ্যাপক জীবনে ছাত্র-ছাত্রীদের নাগাল থেকে দূরে দূরে নিজের গাম্ভীর্য বজায় রাখার অভ্যাসটাই যখন মজ্জায় মিশে আছে, তবু প্রায় হাজার মাইলের দীর্ঘ একটানা ট্রেন-জার্নির ছ'শ মাইল পেরোনোর পর, ছেলেটি কোন একটা বড়ো জংশন-স্টেশন থেকে উঠল, অথবা ট্রেনেই অন্য কোথাও ছিল, সামনের ফাঁকা সিটটায় এসে বসল, একা, চুপচাপ, 'ভারতীয় কৃষি-অর্থনীতি'র উপর দীর্ঘ পরিশ্রমে তৈরি করা তাঁর পেপারটা, দিল্লীতে এরই মধ্যে যা রীতিমতো আলোড়ন তুলেছে, তারই একটা কপি সঙ্গে ছিল, বসে-বসে পাতা নেড়ে পড়ছিলেন, এবং পড়তে-পড়তে এক সময় বিরক্তি আসছিল, বিশেষত চলতি ট্রেনে, আড়চোখে ছেলেটির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ কেন জানি, ভালোলেগে গেল, দু-চারটে কথা বলার পর আলাপটা জমল আরও, পিতা আর পুত্রের ব্যবধানে, অসম বয়স, তবু। এবং এখন এই মাঝরাত্তিরে, ট্রেনটা যখন কালো অন্ধকার ঠেলে প্রতিমুহূর্তে প্রতিগজ অচেনা ভারতবর্ষ পেরিয়ে তীব্রবেগে ছুটছে, মাঝে-মাঝে এক্সপ্রেস্ ট্রেনের হুইসিলের গর্জন এখন কানে অভ্যস্ত-হয়ে-ওঠা ঝনঝন, এমন কি, সহযাত্রী হিসেবে যে মারোয়াড়ি পরিবারটি দিল্লী থেকেই সঙ্গে ছিল, তারাও কোথাও নেমে গেছে, রেলের অ্যাটেন্ডেন্ট ভদ্রলোকও কোথায় বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন, নিঝুম ফাঁকা রেলের কামরাটা যেন শূন্যে ভাসছে, দোল খাচ্ছে দু-পাশে, মাঝরাত্তিরে অন্ধকারে বিরাট একটা নদীর উপর সেতু পেরোচ্ছে রেলগাড়ি, সেতুটা যেন ফুরোবার নয়, গুর-গুর শব্দে বুকটা কাঁপছে, গলগল করে ঘেমে ভিজে যাচ্ছেন ভিতরে ভিতরে, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করছে, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন ডঃ দাশগুপ্ত, জীবনের জন্য এত করুণভাবে কখনও তাকাননি, হাসপাতালের ডাক্তারের দিকেও না। কিন্তু অতর্কিত রক্তচাপ বৃদ্ধি অথবা করোনারি আক্রমণের মতো জীবন্ত একটি যুবক, স্মার্ট ইয়ং ম্যান! মাথা তুলে, চোখে চোখ রেখে তাকাতেই মনে হলো, চোখ-জোড়া গ্রহণের সূর্যের মতো। এক পলকে হঠাৎ, নিজেরই সন্তান দীপুকে মনে পড়ল, মুখের আদলে, পুরো চেহারায় কোথায় যেন আশ্চর্য মিল। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে শরীরটা ওর পাথরের মতো জমে গেছে, ভাবাই যায় না আর, সন্ধেবেলা এই যুবকের সঙ্গেই তাঁর কথা বলার সাহস হয়েছিল অথবা এখন তিনি সেই পুরনো ভঙ্গিতে কোন কথা বলতে পারবেন। বোবা পিস্তলটার মতোই যুবকটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক মাথার

উপর আলো রেখে, ডানে, বাঁ-এর সামনে পিছনে কোথাও তার ছায়া নেই, নিজের মধ্যেই নিজের সম্পূর্ণ ছায়াকে আত্মস্থ করে স্থিরমূর্তির মতো কঠিন। আলোর পোকাগুলি ঘুরপাক খেয়ে চোখে-মুখে পড়ে বিরক্ত করলেও চোখের পলক ওর এতটুকু কাঁপছে না। যে ইংরেজি পকেট বুকটা সঙ্গে থেকে পড়ছিলেন এবং স্যুটকেশ, ওর সিটেই পড়ে আছে। কাঁপতে কাঁপতে হাত বাড়িয়ে, বেশ কিছুটা ঝুঁকে, হোলডোলের শিয়রে বই, কলম, ফাইল, টাইপ-করা-থিসিস-এর উপর যে চশমাটা ছিল, টেনে নিলেন। সব কিছু ঝাপসা দেখছেন চারদিকে। এবং চোখে চশমা এঁটে, ছেলেটির কানের পাশে ও পারের দরজায় অ্যালার্ম-চেনের লাল-হাতল দেখলেন। এবং গলায় আরও বেশি তেষ্টা বাড়ল, আরও বেশি ঘামতে শুরু করলেন ভিতরে-ভিতরে। কানের দু-পাশে আগুনের হল্‌কা রুমালের জন্য পাঞ্জাবির পকেটের দিকে হাতটা নামাতেই হঠাৎ, একটা প্রচণ্ড শব্দে থর-থর করে কেঁপে উঠলেন। এক ঝটকায় মনে হয়েছিল,. বোধহয়, গুলিরই শব্দ, কিন্তু নিজের মধ্যে আবার ফিরে আসতেই যখন বুঝলেন, শক্ত মেঝেতে ছেলেটির ভারি জুতোর পা-ঠোকার শাসন, কিছু একটা করতে হবে ভেবে এবং কোন কিছুই করার নেই দেখে, অকারণেই চশমাটা খুলে পিট্‌পিট করে তাকালেন। মনে হচ্ছে, যেন অনেক বেশি সময় নিয়ে নিচ্ছে ট্রেনটা, এক্ষুনি একটা বড়ো-সড়ো কোন স্টেশনে পৌঁছে যাওয়া উচিত অথবা সিগনাল না পেয়ে একটা গেঁয়ো স্টেশনেও থেমে যেতে পারে। 'একটা পয়েন্টেড রিভলবারের সামনে দাঁড়িয়েও কখনও পকেটে হাত দিতে নেই। আপনি জানেন না?' অবশেষে সেই পাথুরে শক্ত শরীরটা কথা বলল। হয়তো পিস্তলটাও কথা বলবে এক্ষুনি। ডঃ দাশগুপ্ত অসহায়ভাবে তাকালেন। 'হাত তুলুন—' যেন পোষ মানানো কুকুরের মতো। হাত দুটো তুলতেই মাথার উপরে বাঙ্কটায় আঙুলগুলি ঠেকল। 'দাঁড়ান—' দাঁড়াতেই হয়। 'এদিকে আসুন—' পিস্তলের শাসন। মানতেই হয়। গৌর-নিতাই-এর মতো দু-হাত তুলে, মেদবহুল বিশাল শরীর নিয়ে, পায়ের তলায় একটা স্লিপার পাওয়া গেল, একটা পাওয়া গেল না, এবং এক পায়ের চটি টেনেই এগোতে লাগলেন। এবার কী দেয়ালে পিঠঠেঁসে সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলবে? এতটা নৃশংস হবে এই বয়সের একটা ছেলে! সাহস করে মাথা তুলে তাকাতেই হঠাৎ শিউরে উঠলেন দেখে, অপরিচিত আততায়ীর চোখ নয়, নিজেরই মুখ। ঠিক বিপরীত দিকে, ঝকঝকে আরশিতে নিজেরই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আরশির

পাশে ব্র্যাকেটের হুকে ঝুলছে ওয়াটার-ব্যাগ, ফ্ল্যাস্ক তালে-তালে দুলছে, ডানে-বাঁয়ে, এপাশে-ওপাশে। চলমান রেলগাড়ির প্রচণ্ড গতি আর পায়ের তলায় সবকিছু গুঁড়িয়ে-দেওয়া লোহা-লক্কড়ের শব্দের মধ্যে নির্জন কামরাটা যখন স্থির গৃহের মতোই মনে হয়, শুধু ভূমিকম্পে কাঁপছে, বুকের ভিতর পাঁজরা-দুটোও আলগা হয়ে দুলছে, তেষ্টায় গলা শুকোচ্ছে, পিস্তলের নলটার শান্তভঙ্গি আর আরশিতে নিজেরই একজোড়া চোখ চোখে পড়তেই যেন হিম হয়ে আসে গোটা শরীর। থপ্-থপ্ করে এগোতে-এগোতে হঠাৎ ঝিঁ-ঝিঁ ধরা অবশ পায়ের উপর ভারি শরীরটা হুমড়ি খেয়ে পড়ার মতো, হঠাৎ, ডঃ দাশগুপ্ত টলে পড়লেন ও-দিকের ফাঁকা সিটটায়। সেই সিটটা, যেখানে টান হয়ে শুয়ে সারা দুপুর অশ্লীলভাবে নাক ডেকেডেকে পড়েপড়ে ঘুমিয়েছে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। এবং উপুড় হয়ে পড়েই দু-হাতের পাতার উপর কাঁধের ভর রেখে, মাথাটার উপর নিয়ন্ত্রণ শক্তি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে, গর্দানটা ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। চোখ তুলে তাকাবার সাহস তাঁর নেই। পিস্তলের মুখোমুখি দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা তাঁর এই প্রথম। জীবনের এত অসংখ্য বছর পেরিয়ে এসে, বিশ্বজ্ঞান ভাণ্ডারের লক্ষলক্ষ পাতা, পাতার পর পাতা ওল্টানোর পর চোখের ছানি কাটা শেষ করে যখন সব ঝাপসা, লোহা লক্কড়ের প্রচণ্ড শব্দের মধ্যেও কানে বাতাসে বই-এর পাতা ওড়ার খস্-খস্ খস্-খস্ শব্দ শুধু, সারাটা জীবন ধরে শুধু বই, বই, বই—ফাইল কাগজপত্তর—পেপারস্—থিসিস্—আলমারি র‍্যাক বই, বই-এর পাহাড়, হাজার হাজার যুবক-যুবতী, ছাত্র-ছাত্রী, ত্রিশ বছরের অধ্যাপক জীবনের পুরো হিসেব নেই, চেনা-অচেনা কতো অসংখ্য মুখের মিছিল··· বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীন অধ্যাপক, হেড অব দি ইকনমিক্স্ ডিপার্টমেন্ট, প্রোপোস্‌ড ভি-সি, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য···ভাবাই যায় না, জীবনের এত অসংখ্য সাফল্যের সেতু ডিঙোবার পর, আজ অকস্মাৎ, নিছক প্রাণভিক্ষার জন্য এত করুণভাবে···ধুঁকতে ধুঁকতে আড়চোখে তাকালেন ডঃ দাশগুপ্ত, মেঝের উপর শক্ত ভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া কালো জুতো, চকচকে পালিশ, জুতো থেকে গাছের মতো বেড়ে-ওঠা সরু প্যাণ্টের ক্রিজ্। ডানে বাঁ-এ সামনে বা পিছনে কোথাও ছায়া নেই। অথচ নিজের ছায়াটা নিজের কাছে কী ভীষণ বাস্তব। বুকের ভিতরটা হঠাৎ মোচড় দিয়ে ওঠে। জীবনের শেষ কয়েকটা শেষ মুহূর্ত হয় তো, শেষ রাত! ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসছে শরীর। অথচ অসহ্য গরম। গল্‌গল্ ঘামছেন। গা ঘেসে জানালার কাচ ফেলে রেখেছে

কে। মাথা তুললেন বাইরে, কৃষি অর্থনীতির ভারতীয় দিগন্ত, মাঠ আর মাঠ দূরে-দূরে গ্রাম, গাছের সারি, নিরন্ন বুভুক্ষ মানুষ, অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে সব একাকার কুচকুচে কালো ব্ল্যাক বোর্ড। কাচের গায়ে কামরার অস্পষ্ট ছায়া। সেই যুবক! তার সম্পূর্ণ শরীর! পিস্তলটা ঈষৎ নুইয়ে, প্যান্টের দু-পকেটে শুধু দুটো বুড়ো-আঙুল রেখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে থেকে স্থিরপলকে তাকে দেখছে, যেন পায়ের কাছে লুটিয়ে-পড়া সহজ শিকার, এখন শুধু করুণা দিয়ে যতক্ষণ বা যতটুকু উপভোগ করা যায়। অকস্মাৎ, যেন এক ঝটকায় দপ্ করে জ্বলে উঠল মাথাটা, এক ঝটকায় সোজাসুজি তাকালেন অধ্যাপক। এবং সেই যুবক কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে শান্তভাবে পিস্তলটা আবার তাক করে ধরল কপাল লক্ষ্য করে। অধ্যাপক, অন্তত সেই মুহূর্তে অন্য কোনো কর্তব্য খুঁজে না পেয়ে, স্প্রিং-এর পুতুলের মতো অবশ হাত দুটো ঊর্ধ্বে তুলে দিলেন। পাঞ্জাবির ঢোলা-হাত কনুই পর্যন্ত গড়িয়ে নামল, হীরের আংটি দামী ঘড়ি, স্টেনলেস স্টিলের চেন জ্বলতে লাগল। কিন্তু চোখ সরালেন না। যেন প্রাণের দায়ে, শেষ মুহূর্তে, একটা বেপরোয়া চেষ্টা, আবার যদি নতুন করে একটা সেতু গড়া যায়, দীর্ঘ ত্রিশ বছরে হাজার হাজার ছাত্রের যে মিছিল বয়ে গেছে, অথচ যে কাজটা কোনদিন করা হয় নি, আজ, যুবকটির চোখে চোখ রেখে তাকাতেই যে, চোখ জোড়া আদৌ হিংস্র নয়, কোনো দস্যুতা নেই, মনে হলো, নিস্পলক চোখ দুটোয় কী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! পাথরের মূর্তি করুণাময় ঈশ্বরের কাছে সকাতর জিজ্ঞাসার মতোই যেন ভিতর থেকে হঠাৎ উগড়ে উঠল বাক্যটা, ফ্যাঁস ফেঁসে গলা—'আমাকে মারবে কেন?'

এবং সেই শব্দহীন যুবক, হঠাৎ নিঃশব্দ ঘরটায় মানুষের কণ্ঠস্বরে নাড়া খেয়ে এবং কিছুমাত্র বিচলিত না হয়ে, হাতের মুঠোতেই পিস্তলটা নিয়ে খেলতে খেলতে একটু নড়ে উঠল, এক-পা বাঁ-এ ঘুরে আবার স্থির হয়ে দাঁড়াল। সেই ধারালো চোখের দৃষ্টি। কিন্তু অধ্যাপক, এই রুদ্ধশ্বাস ঘরটায় যখন দম বন্ধ হয়ে হৃদয়যন্ত্রে একটা তোলপাড় ঝড়ের আশঙ্কায় হাঁপাচ্চেন, যখন ধরাশায়ী হয়ে লুটিয়ে পড়ার সময়, অকারণ গুলি-খরচ না করেই যখন পিস্তলটা জিতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই যেন হঠাৎ স্বস্তি পেলেন—এতক্ষণ নিজের ছায়াকে চাদরের মতো সর্বাঙ্গে জড়িয়ে যে-যুবক প্রস্তরীভূত হয়ে উঠেছিল, হঠাৎ একটু নড়ে উঠতেই শরীর থেকে বেরিয়ে তার দীর্ঘ দীর্ঘ ছায়া মাটিতে পড়ে, মাটি থেকে দেয়াল বেয়ে গোটা কামরায় ছড়িয়ে পড়ল এবং শক্ত কব্জিতে পিস্তলের নল আর নলের

ছায়াটা একই সঙ্গে তার কপাল আর ওপাশে হোল্ডলের বিছানায় ছড়ানো ব্যাগ কাগজপত্তর বইএর উপর কৃষি-অর্থনীতির থিসিসের গায়ে গিয়ে আটকে রইল।

মনে হচ্ছে, যেন রেলের গতি কমছে, পায়ের তলায় লোহারক্করের শব্দগুলি বদলে যাচ্ছে। এবং মনে হতেই একটু স্বস্তিতে, একটু ক্ষীণ আশায় ভিতরে ভিতরে ঝিম-ধরা শরীরটায় হঠাৎ রক্ত চলাচলের স্পন্দন অনুভব করলেন অধ্যাপক, পাখাগুলি ঘুরছিল মাথার উপরে, যেন বাতাস ছিল না, অনেকক্ষণ পরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল ঘর্মাক্ত শরীরে। তবু খটকা লাগে। অবচেতনের ভ্রান্তি অথবা সত্যি বাস্তব! ট্রেনটা কী সত্যি থামছে কোথাও? সত্যি কোন স্টেশন এলো! যেন একটু নিশ্চিন্ত হতেই বাঁ-দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে একটু দেখতে চাইলেন। কাচের জানালা। কিছুই দৃশ্যমান নয়। কৃষি-অর্থনীতির ভারতীয় দিগন্ত মিস্‌মিসে কালো ব্ল্যাক-বোর্ড। চকখড়ির দাগে স্ট্যাটিস্‌টিক্‌সের জটিল অঙ্কের মতোই পিস্তল-হাতে যুবকের অস্পষ্ট ছায়া। আরও কিছু নিঃশব্দ মুহূর্তের মধ্যে অধ্যাপক যেন মনেমনে কিছুটা স্বস্তি, কিছু আরাম বোধ করছেন। গাড়ির গতিটা মন্থর হয়ে আসছে ঘনঘন হুইস্‌ল বাজছে। কোনো সংশয় নেই। গাড়িটা থামবে। মধ্যরাত্রির নির্জন ঝিমোনো স্টেশন হলেও, থামা মানে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাওয়া, ডাকলেই যেখানে মানুষ, কাতারে কাতারে মানুষ। এখন ভিড় চান তিনি, হাজার হাজার মানুষের ভিড়েই বেঁচে থাকার সুখ। ভিতরে ভিতরে সাহস বাড়ল। আর যদি কিছুটা সময় পাওয়া যায়, যদি এই সময়টুকুর মধ্যেই হঠাৎ কোনো বিপদ না-ঘটে, হয়তো একটা মিরাক্‌ল্‌ ঘটে যেতে পারে, বেঁচে যেতেও পারেন এ-বারের মতো। ট্রিগারের চাবিটায় আঙুলটা আংটার মতো বাঁকানো দেখেও, নিঃশব্দ নলটার উপর দৃষ্টিটা স্থির নিবদ্ধ রেখে দু-হাত ঊর্ধ্বে তুলেই অধ্যাপক অনেক কষ্টে তাঁর ভারি শরীরটা তুললেন। ঊর্ধবাহু চৈতন্যের বিশাল ছায়াটা তাঁর পায়ের তলায় মাটিতে গড়াচ্ছে। এবং যুবকটি, যার মধ্যে কিছুমাত্র কাঁপুনি নেই, মাথার শ্যাম্পু করা মোলায়েম চুলগুলি বাতাসে ফুরফুর করে না-উড়লে যাকে রক্ত-মাংসের মানুষ বলে মনে করাটাও দুঃসাধ্য হতো, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু পিস্তলের নলটাকে তাক করে রইল। অধ্যাপক যতই ঘুরুন, যেন পিস্তলের নলের সঙ্গে তাঁর সহজ সরলরেখার সম্পর্কটা ঘুচবার নয়। অথচ এখানেই একটা ছেদ চাইছেন অধ্যাপক এবং স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ভয়টা আর ভয় থাকছে না, আস্তে-আস্তে দুঃসাহস মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। ট্রেনের গতিটা দ্রুত কমে

আসছে। এবং মরীয়া হয়ে সেই সরলরেখা বেয়ে অধ্যাপক পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন, পিস্তলের নল থেকে মাত্র কয়েক বিঘতের দূরত্বে। হয়তো এক্ষুনি গর্জে উঠতে পারে পিস্তলটা, হয়তো এমনি একটা সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিল যুবক, হত্যা করেই যাকে পালাতে হবে, তার পায়ের-তলায় মাটি চাই। মাটি মানেই মধ্যরাত্রির নির্জন স্টেশন। টাইম-টেবিলের সাধারণ নিয়মেই ট্রেনটা এখন থামবে এবং পায়ের-তলায় মাটি পেলেই হত্যা করার আর নিহত-না-হবার শেষ-লড়াই। এতক্ষণ ধরে হাতদুটো তুলে থাকায় দুদিকের কাঁধ থেকে কনুই পর্যন্ত হাতদুটো ব্যথায় টনটন করছে। ছিঁড়ে পড়তে চায়। চোখে-মুখের ভয়ের চিহ্নগুলি এখন যন্ত্রণায় কাত্‌রাচ্ছে। সারা শরীরের রক্ত যেন একসঙ্গে মাথায় স্নায়ুতে-স্নায়ুতে চিন্‌চিন্ করে উঠল। বয়স, বার্ধক্য, ব্লাড-প্রেশার সব ভুলে একটা প্রচণ্ড দুঃসাহস, একটা বেপরোয়া শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে ভিতরে ভিতরে। মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যবধান, এবং যদি মৃত্যুটা অবধারিতই হয়, তবে অন্তত শেষ-চেষ্টা হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় না একবার! হুটোপুটি, লুটোপুটিতে একবার যদি পিস্তলের অধিকারটা কেড়ে নেওয়া যায়! আর যদি হেরে যেতে হয়, অন্তত মেঝেতে গড়ানো দু-জন মানুষের হুটুপাটির শব্দে রেলের অ্যাটেণ্ডেণ্ট ভদ্রলোক জেগে যেতেও পারেন আশেপাশে আরো কয়েকজন, আততায়ী ধরা পড়বে। এবং পুরো ভাবনাটা চরম স্তরে চাগিয়ে ওঠার আগেই এক মুহূর্তে ভয়ে-সন্ত্রাসে ভড়কে গিয়ে আর্তনাদ করে দু-পা পিছিয়ে গেলেন অধ্যাপক। চোখের পলকে ছেলেটিও দু-কদম লাফ মেরে এগিয়ে গেল। ভাঁজ-করা কনুইটা হঠাৎ টান করে একেবারে অধ্যাপকের বুকের উপর পিস্তলটা রাখল—'সাবধান, টু শব্দটি করবেন না।'

তলায় ট্র্যাক বদলে গাড়ি স্টেশনে ঢুকছে। কিন্তু অধ্যাপকের গলা শুকিয়ে এসেছে। বুকের ভিতর সেই অস্থিরতা—'তুমি, তুমি আমাকে খুন করবে?' 'বুঝতেই পারছেন।'

'এ-জন্যে, শুধু এ-জন্যে আজ তুমি আমাকে পিছু নিয়েছ?' 'আজ নয়, অনেকদিন থেকে আমি আমি এ-সুযোগ খুঁজছি।' 'অনেক দিন!' 'অনেক বছর।' হৃদযন্ত্রের উপর স্টেথিস্‌কোপের মতোই পিস্তলের নল। পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির তলায় বুকের উপর স্পর্শটা স্পষ্ট অনুভব করা যায়। অধ্যাপকের বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে নিরুত্তেজ শান্ত যুবক—'আমি তো কোনোদিন কোনো অপরাধ করিনি!' 'এ যুগে আমরা কেউ-ই আমাদের অপরাধ সম্বন্ধে

সতর্ক নই। 'কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি···' 'জীবনে কতবার প্রতিবাদ করেছেন ?' 'প্রতিবাদ !'

'ঢাকা জগন্নাথ কলেজের লেকচারায় থেকে দিল্লীর প্ল্যানিং-কমিশনের মেম্বারশিপ্ পর্যন্ত, ত্রিশ বছরের কেরিয়ার-তৈরিতে সব কিছু মাথাপেতে অ্যাক্সেপ্ট না করে কতবার প্রতিবাদ করেছেন ?' স্টেথিস্কোপের মতোই পিস্তলের নলটা বুকের উপর খেলা করে। ঘন নিঃশ্বাসে হাঁপাতে হয়। কী আছে বুকের ভিতর! ভয়! সমস্ত শরীর হিম হয়ে আসছে। পাখার তলায় দাঁড়িয়ে আবার গল্‌গল্‌ ঘামছেন অধ্যাপক। একটা মোচড় লাগছে। সত্যি, কী যেন একটা চাগিয়ে উঠতে চাইছে বুকের ভিতর। জীবনে প্রথম প্রতিবাদ ! এই পিস্তলের বিরুদ্ধে। কিন্তু কাণ্ডজ্ঞানহীন অর্বাচীন এই যুবক পিস্তল হাতে নিয়ে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। ঘনঘন ট্র্যাক বদলে অসম্ভব রকমে মন্থর হয়ে আসছে গাড়ির গতি। বাঁ-দিকে একটা স্থবির মালগাড়ির গা-ঘেসে যাচ্ছে। ট্রিগারের উপর আঙুলটা কাঁপছে। আরও কুঁচকে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, যুবকের চোখজোড়া। হাত তুলে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না অধ্যাপক। বুক থেকে কী একটা উঠে এসে কণ্ঠনালীতে আটকে রইল। তবে কী সেই চরম মুহূর্তটা ঘনিয়ে আসছে. তীব্র হুইসল বাজাতে বাজাতে গাড়ি বোধ হয় প্ল্যাটফরম ছুঁয়েছে। ডানদিকে স্টেশনের আলোয় জড়াজড়ি রেল লাইনগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। জীবনের এই শেষ মুহূর্তটাকে যেন কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না অধ্যাপক। ছেলেটির আরও কুঁচকে-আসা চোখ জোড়ার দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে রইলেন। আন্‌কম্‌প্রোমাইজিং ইয়ুথ্। গাড়িটা প্ল্যাটফরম ছুঁয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ানোর মুখেই হয় তো. ঠিক বুকের উপর পিস্তলের নল রেখে, পরপর তিনটে কী চারটে গুলি···রক্ত ধোঁয়া-চিৎকার, মাঝরাত্তিরের ঝিমোনো স্টেশন তোলপাড় করে জনতা-পুলিশ-কুকুর, এবং সেই ভিড়ের মানুষ আর অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে উধাও এই যুবক···হয়তো পালানোর সমস্ত পরিকল্পনা সে ভেবেই রেখেছে···সম্ভাব্য দৃশ্যগুলি ভাবতে ভাবতে অধ্যাপক যখন তাঁর গোড়ালির উপর নিজের শরীরের ভার হারিয়ে টলে পড়ছিলেন, ঠিক তখনই পাশাপাশি কলকাতা···কলকাতা...সুদৃশ্য নতুন প্রাসাদ, সাজানো ড্রইং রুম স্টাডি-লাইব্রেরি, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, দীর্ঘ ছ-বছর পরে বড়ো-ছেলে অক্সফোর্ড থেকে ফিরছে, তার প্রায় ভুলে যাওয়া মুখ, মেয়েটার মেরিকা-যাত্রা প্রায় ঠিক, এ-বছরই এম এ কমপ্লিট করছে ছোটছেলে দীপু···দিল্লী···দিল্লী এম্-পি কোয়ার্টারে

বন্ধু এম্‌-পি-র আতিথ্য, ইউ-জি-সি-র পাঁচতলা প্রাসাদ, যোজনা-ভবন, প্রধান মন্ত্রীর খাস-কামরা, সারা ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল···তালগোল পাকিয়ে সমস্ত স্মৃতিগুলি করাতের দাঁত দিয়ে তার মগজ চিরছিল। কিন্তু সামনে তখন ভয়ঙ্কর বাস্তব এই যুবক। যেন অদৃশ্য কোন স্টপ-ওয়াচের দিকে তাকিয়ে নির্দিষ্ট মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে। এবং তিনি নিজে অজ্ঞাত কোন ঘৃণিত অপরাধের জন্য অদৃশ্য কোন ইলেকট্রিক চেয়ারে বসে সেই শেষ মুহূর্তের কাছে অসহায়।

এবং তখনই, অধ্যাপক যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না, ছেলেটি তাঁর বুকের উপর থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে, দু-পা পিছিয়ে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়াল। ডান চোখটা কুঁচকে, দাঁতে জিবে অদ্ভুত এক উপেক্ষার শব্দ করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—'বুঝতেই পারছেন, ইচ্ছে করলেই এর মধ্যে আপনাকে খুন করতে পারতাম।'

হতবিহ্বল অধ্যাপক বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন।

'এবং সে আমি করবই।' হঠাৎ জুতোশুদ্ধ ডান পা টা কোণের দিকে অধ্যাপকের বার্থের উপর তুলে, কোমর থেকে পিঠ পর্যন্ত বাঁকিয়ে, হাঁটু থেকে মাঝারি ঘেরের প্যাণ্টটা তুলতে তুলতে অনেকখানি তুলে, পিস্তলটা কোথায় যেন রেখে, আবার প্যাণ্টটা গুটিয়ে নিয়ে স্প্রিং এর মতো লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

'হাত নামান।'

হাত! হাত দুটো আর নামাতে পারছেন না অধ্যাপক। অবশ হয়ে গেছে। সামান্য চেষ্টাতেই কোমরের ডানদিক, বাঁ দিক, পিঠের শিরদাঁড়া, দুটো কাঁধ একসঙ্গে টনটন করে উঠছে। আশ্চর্য! চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। অসহ্য যন্ত্রণা। অথচ বুঝতেই পারছেন, পায়ের তলায় আর কোন লোহা লক্করের শব্দ নেই। বিরাট জংশন-স্টেশনের সেডের তলায় গাড়িটা থেমে দাঁড়িয়েছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, নির্জন প্ল্যাটফরম ভরে নীলচে আলো, দূরে দূরে মধ্যরাত্রির হকারদের ভূতুড়ে-গোঙানি। জীবনে বাঁচতে হলে তাঁকে এক্ষুনি, এক্ষুনি একটা কিছু করতে হবে। কত পরে আবার স্টেশন! কিন্তু তার আগেই···ব্যথায় যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে, দাঁত-মুখ খিঁচে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঊর্ধবাহু হাতদুটো নামাতে গিয়ে অধ্যাপক শুনছেন, দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর অর্বাচীন সেই যুবক তখনও কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় ফিসফিস করে বলছে—'আরও একটা স্টেশন পর্যন্ত সময় দিলাম। ভেবেচিন্তে উত্তর দিন,

গত ত্রিশ বছরে কম্প্রোমাইজ না-করে কতবার প্রতিবাদ করেছেন। ভাবুন··· আদারওয়াইস ইউ উইল ফাইণ্ড মি অল দ্য টাইম এ স্যাডো বিহাইণ্ড ইউ অ্যাণ্ড নেভার আন-আর্মর্ড···' যুবকটি হঠাৎ গিয়ে ল্যাভেটারিতে ঢুকল। যেন অনেকক্ষণ ধরে প্রয়োজনটা জমা হচ্ছিল তার। এবং বিহ্বল অধ্যাপক, অভাবনীয়ভাবে হঠাৎ, লটারির মতো জীবনটা ফিরে পেয়ে কিছুক্ষণ ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইলেন, যেন বিশ্বাসই করতে পারছেন না, এ-রকম একটা কিছু ঘটতে পারে বা আদৌ সম্ভব! অথচ বাঁচতে হলে তাকে এক্ষুনি একটা কিছু করতে হবে। এক্ষুনি। কিন্তু শরীরটা একটু টানতেই কনুই-এ, হাঁটুতে, মাজায়, কাঁধের দু-পাশে, দেহের গাঁটে গাঁটে ব্যথা, টনটন করছে, নড়তে পারছেন না। মাথার মগজটা যেন করাতে চিরছে। থপ্ থপ্ পা ফেলে, টলতে টলতে নিজের বার্থে হোলডলের উপর আছড়ে পড়লেন। ডানহাতে বুকের বাঁ দিকটা চেপেধরে দাঁতে দাঁত চেপে ঘন নিঃশ্বাসে হাঁপাতে লাগলেন। প্রেসারটা কি বাড়ছে? সর্বনাশ! মাথার কাছে বালিশের তলায় শিশিটা হাতড়ালেন। রেলে বা প্লেনে একা চলতে সঙ্গে রাখতে হয়। ট্রেনটা কী ছাড়ার সময় হলো? ভাবনাটা মাথায় টোকা দিতেই ইন্সোম্নিয়া রোগীর রাতের আতঙ্কটা চাগিয়ে উঠল। থাবলা দিয়ে ফোলিও ব্যাগটা টেনে নিলেন, অনেক সরকারি নথিপত্র আছে এতে, ভীষণ জরুরি, আর···ভাবলেন, 'কৃষি-অর্থনীতির উপর থিসিস্টা'···অসম্ভব, ওটা মরে গেলেও সঙ্গে রাখতে হবে, আর কিছু···হোলডোল, বিছানা বাঙ্কের উপর স্যুটকেশ, বেশ কয়েক সেট বিলিতি স্যুট, ক্যামেরা, টাইপ-রাইটিং মেশিন···ভাবলেনও না। সময় নেই ভাববার। ট্রেনটা যদি হঠাৎ চলতে শুরু করে, ডালার ভিতর ভয়ঙ্কর সাপটা চাপা পড়ে আছে, আর যদি...দ্রুত একবার ল্যাভেটরির বন্ধ দরজাটার দিকে তাকালেন, যেন পিস্তলটার মতোই, যে কোনো মুহূর্তে খুলে যেতে পারে, এবং খুলে গেলেই বিপদ, আর ভাবলেন না, শরীরের ব্যথা-বেদনা-যন্ত্রণার কথাও না, মোমের মতো গলে গলে ভিজেছেন এতক্ষণ, গায়ের চামড়ায় লেপটে আছে গেঞ্জি-আদ্দির পাঞ্জাবি, ঘামের দুর্গন্ধ, চপ্ চপ্ করছে গা, অসহ্য বিরক্তি। শরীরের আপত্তি সত্ত্বেও যতোটা সম্ভব তাড়াহুড়ো করে ফোলিও ব্যাগ আর থিসিসের কাগজ গুছিয়ে নিয়ে জানালা বাঙ্ক দেখল ধরে, টলতে টলতে হাতড়ে হাতড়ে বাইরে দরজার কাছে এগিয়ে গেলেন। দরজাটা খুললেন। একবার শেষবারের মতো তাকাতে ইচ্ছে করল, অনেক কিছু ফেলে যেতে হচ্ছে, অনেক টাকার জিনিস। সবই তুচ্ছ। অধ্যাপক চমকে উঠলেন।

ল্যাভেটরির দরজায় যেন একটা শব্দ হলো। দরজা ঠেলে প্ল্যাটফরমের উপর লাফিয়ে পড়লেন। এবং নির্জন ফাঁকা প্ল্যাটফরমটায় নেমেই বেশ একটু আরাম বোধ করলেন। অচল শরীরটা নিয়ে এগোতে যাবেন, আচমকা কোথা থেকে ছুটে এসে কতগুলি রাইফেলধারী পুলিশ আর-পি-এফের বড়োকর্তা, এস-আই, কালো-কোট পরা স্টেশনের বড়ো সাহেব, এবং লম্বা কাগজ হাতে রেলের সেই অ্যাটেনড্যাণ্ট ভদ্রলোক, ঘুম কাটেনি চোখে, চারদিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলল। আচমকা এতগুলি ভারি জুতোর শব্দে বুকটা কেঁপে উঠলেও এবং প্রথম ধাক্কায় বেশ বিরক্ত বোধ করলেও, অধ্যাপক চারিদিকে তাকিয়ে এতগুলি রাইফেল এবং অফিসার দেখে খুশিই হলেন। যাক, হাতের-ব্যাগ আর ফাইলটা মেঝেতে নামিয়ে ধীরে সুস্থে রুমাল দিয়ে ঘাড় গর্দান-মুখ সব মুছে নেবার একটু সময় পাওয়া গেল। 'এক্স্‌কিউজ মি স্যর, আপনি ডঃ দাশগুপ্ত, নাম্বার থার্টি-নাইন রিজার্ভ-বার্থের প্যাসেঞ্জার?' 'হুঁ...' 'নামলেন কেন?'

'আমার খুশি...' চোয়াল থুতনি-গলার উপর লম্বা লম্বা টানে রুমাল ঘসতে ঘসতে অধ্যাপক নিস্পৃহ উত্তর দিলেন—'এনিথিং মোর?' 'আজ্ঞে না, একটা ইনভেষ্টিগেশনের জন্যে কিছু জানার ছিল।' 'বলুন।'

'আচ্ছা একটি ছোক্‌রা, এই ধরুন বছর কুড়ি বাইশ বয়েস, ফর্সা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, অ্যাভারেজ হাইট, ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কিনেছে কিন্তু রিজার্ভেশান নেই। এ-রকম কেউ আপনার কম্‌পার্টমেণ্টে উঠেছিল?'

বিস্তীর্ণ কপাল থেকে হাতের রুমালটা সোজা মাথার টাক পর্যন্ত উঠেছিল, ঠিক তালুতে গিয়ে আটকে গেল। ঝিমমেরে একেবারে পাথর বনে গেলেন অধ্যাপক। পুরো চেহারাটা চোখের উপর ভাসছে—স্মার্ট লাভলি ইয়ংম্যান। এবং পুলিশ, পুলিশ আর রেলের অফিসার—মানুষগুলিকে কেমন খুনে নেকড়ের মতো বীভৎস, ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছে যেন। অফিসারের দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমাদের কাছে আই-বি-র রিলায়েবল খবর আছে স্যর, এ ছোকরা এই গাড়িতেই আছে। আনলাইসেন্‌স্‌ড আর্মস্‌ নিয়ে ঘুরছে।' 'এত জানেন আপনারা, ছেলেটার নাম জানেন না?' 'সবই জানি'—পকেট থেকে একটা কাগজের তাড়া বেরকরে টর্চের আলোজ্বেলে অনেক কষ্টে একটা নাম পড়লেন ইন্‌স্‌পেকটর—'দীপায়ন দাশগুপ্ত।' 'কী বললেন!' সারা শরীরে নাড়া খেয়ে চমকে উঠলেন অধ্যাপক—'ডাক নাম কী?' 'জানি না।' 'বাবার নাম!' 'জানি

না।' 'ঠিকানা!' 'স্যরি'।

ধাক্কার পর ধাক্কায় অধ্যাপক বুকের ভিতর আবার সেই যন্ত্রণা অনুভব করেন। আলোর নিচে ওই মুখ তিনি নানাভাবে অনেকক্ষণ দেখেছেন, এখনও বিভীষিকা। কিন্তু এই নাম কেন? একটা নামের চমক। অধ্যাপক আবার স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করলেন। নিজের মধ্যে ফিরলেন—'এখন কী করবেন আপনারা?' 'গোটা ট্রেন ঘিরে কুম্বিং চলবে।' 'ওকে ধরবেন?' 'উই আর ডিটারমিন্ড…' 'ফাঁসি দেবেন?' 'সে কোর্ট জানে।'

অধ্যাপক হাসলেন। তাঁকে ঘিরে অদ্ভুত চেহারার বিচিত্র বর্ণের কিছু মানুষ। মেঝে থেকে ব্যাগ আর থিসিসের-ফাইলটা তুলে নিলেন—'সে ছোকরা তো পালিয়েছে। কাকে খুজছেন?'

সবগুলি মানুষ প্রায় একসঙ্গে চমকে উঠল—'মানে! আপনি দেখেছেন নাকি?' 'আমার কম্‌পার্টমেন্টেই তো ছিল।' 'তারপর!'

'গাড়িটা যখন ইন্ করছিল, স্পিডটা কমে আসতেই' অধ্যাপক একে একে চারদিকের সবগুলি কুতকুতে শেয়ালের চোখের দিকে তাকিয়ে সেই যুবকের উজ্জ্বল তরুণ মুখের চেহারাটা ভাবলেন। ঘাড় ফিরিয়ে নিজের পরিত্যক্ত কামরাটার দিকেও তাকালেন—'দেখছেন না, সেই থেকে ঘামছি। হোয়াট এ ফ্রানটিক অ্যাণ্ড ডেস্‌পারেট অ্যাটেম্‌পট টু ইগ্‌নোর ডেথ্। রানিং থেকেই হঠাৎ অন্ধকারে লাফ দিল।' হঠাৎ একটা সশব্দ উত্তেজনা। একসঙ্গে সবগুলি চোখ তখন পিছনের দিকে। আর-পি-এফের বড়োসাহেব উত্তেজনায় টুপি নামিয়ে মাথার চুল মুঠো করে ধরেছেন—'কোথায় বলুন তো, কতো মিনিট আগে।' 'কোথায় কী করে বলব? ধরুন, প্রায় মিনিট পনের…'

হাতের পেনশিল গালে ঘসছেন রেলের অফিসার। কব্জিতে হাত ঘড়ি দেখছেন—'সাম হোয়ায়র নিয়ার সাউথ কেবিন।' 'আপনি চেন টানলেন না কেন?' 'আই ওয়াজ বিওয়েলডারড়, কম্‌প্লিটলি লস্ট…' 'আচ্ছা কোন চিৎকার শুনেছেন? আই মিন…' 'রান ওভার?' 'ইয়েস…ইয়েস…'

অধ্যাপক হাসলেন—'মনে হয় না, ও ছোকরা অত সহজে আপনাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করে দেবে।' 'হোআ…ট্…'

মানুষগুলিকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে অধ্যাপক জটলা থেকে বেরোতে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের আর-পি-এফের প্রধান অফিসার বুক পকেট থেকে দড়ি বাঁধা হুইস্‌ল খুলে কানের কাছে এমন জোরে বাজাতে শুরু

করলেন যে, মধ্যরাত্রির নির্জন স্টেশনটায় তীব্র এবং কর্কশ বাঁশিটা চারদিকে অসম্ভব তোলপাড় তুলে দিল। এবং বিরাট ফাঁকা প্লাটফরমে চারদিকের আলো-অন্ধকার গলি-ঘুপচি থেকে পালেপালে, ঝাঁকেঝাঁকে রাইফেল হাতে পুলিশ, এতক্ষণ যে ওরা কোথায় ছিল, ছুটে আসতে লাগল। এবং বিমূঢ় অধ্যাপক তাকিয়ে দেখলের, গাল ফুলিয়ে অফিসার বাঁশি বাজিয়ে হাত নেড়েই যাচ্ছের্ন এবং শান্ বাঁধানো প্ল্যাটফরমে প্রায় শ-এর কাছাকাছি ভারি বুট জোড়ার আওয়াজে রেলের কুলি, ট্রেনের প্যাসেঞ্জার চারদিকে সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। দেখতে দেখতে লম্বা প্ল্যাটফরমের সারি বেঁধে 'ফল ইন্'। অফিসারও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন পুলিশের লাইনটা অফিসারদের পঞ্চাশ-ষাট গজ মস্তো লম্বা হাত হয়ে উঠল এবং সেই লম্বাহাত বাড়িয়ে অন্ধকারেও খাবলে খাবলে যে কোন জিনিস খুঁজেখুঁজে আনা যায়। অধ্যাপকের হঠাৎ ভাবনা হলো। নানাভাগে ভাগ হয়ে একটি বিরাট বাহিনী দৌড়ে প্ল্যাট-ফরম পেরিয়ে অন্ধকারের দিকে ছুটল। কিন্তু তার চেয়েও বেশি পুলিশ ট্রেনের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। এবং ট্রেনের কৌতূহলী-আতঙ্কিত যাত্রীরা, এরই মধ্যে যারা হল্লায় চিৎকারে লুটোপুটি শুরু করে দিয়েছে, পুলিশি তাণ্ডবে সে হট্টগোল আরও বাড়বে। চারদিকের এত শব্দ, চিৎকার, সমুদ্রমন্থনের আয়ো-জন, আর তার মধ্যে ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে অধ্যাপক সেই তরুণ উজ্জ্বল মুখ আর দুঃস্বপ্ন আর বিভীষিকার দৃশ্যের মধ্যে জড়িয়ে রইলেন। দীপায়ন নাম! দীপু! দাশগুপ্ত! আশ্চর্য! যেন চোখের সঙ্গে লেপটে আছে মুখটা। ভুলতে পারছেন না। পারবেন না। আবার অস্থিরতা বাড়ছে ভিতরে ভিতরে। ব্যাগটা খুলে পাইপটা বের করলে। পাউচ আর দেশলাই। যেন অনেকক্ষণ ধরে প্রয়োজন বাড়ছিল। কিন্তু নিস্পলক চোখের পাতায় সেই মুখ। ট্রেনের প্রতিটি কামরায় প্রতিটি দরজায় পুলিশ। ঠাসাঠাসি ভিড় কামরায় কামরায়। কুম্ভমেলা না কী স্নান সেরে ফিরছে মানুষগুলি। দুটো তিনটে পিল্‌গ্রিম স্পেশালের পরও গাড়িতে গাড়িতে অসম্ভব ভীড়। প্রতিটি মুখের উপর পুলিশের টর্চ পড়বে, যাচাই হবে, রেহাই নেই। ভাবতেও শিউরে উঠলেন অধ্যাপক। উদ্‌ভ্রান্তের মতো নিজের কামরার দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখানেও পুলিশ। টেনে হিচড়ে তছনছ করছে তাঁর বিছানা পত্তর, হোলডোল, স্যুটকেশ টাইপ-মেশিন। ইচ্ছে হলো, ছুটে যান। চিৎকার করে প্রতিবাদ জানান। কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে হাতের শেকল ছাড়া কতগুলি শিকারী কুকুর। কাকে

রুখবেন ! ল্যাভেটারির বন্ধ-দরজাটা ! যেন কি এক অজ্ঞাত টানে শরীরে শক্তি পেলেন। ভিতর ঢুকলেন। দরজা খোলা। তবে ! টলতে টলতে আবার নেমে এলেন। তামাকভরা পাইপটা দাঁতেই আটকে থাকে, আগুন জ্বালতে ভুলে যান। এখানেই কোথাও সে আছে। হাতে পেলে ওকে ছিঁড়ে খাব শেয়াল-গুলি। কিন্তু···ভিড়ের মধ্যে সেই চোখ খোঁজেন অধ্যাপক। আততায়ীর চোখ। এই ভিড়ের মধ্যেই যে-চোখ তাঁকে খুঁজছে। অদৃশ্যভাবেই যেন একটি পিস্তলের অঙ্গে সোজা সরল রেখায় তিনি আটক আছেন। যে-কোন মুহূর্তে গর্জে উঠতে পারে। বীভৎস সেই দৃশ্যের কথা তিনি যেন ভাবতেই পারেন না আর। এই ভিড়, এত মানুষের মধ্যে সেই মুখ ! দীপু ! দীপায়ন ! দীপু ! দাশগুপ্ত ! হি কুড হ্যাভ্ বিন্ মাই সন্, হি ইজ·· চোখের-পাতা থেকে সেই ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ চোখ জোড়া যেন সরতে চায় না, অধ্যাপক আবার গল্‌গল্ ঘামছেন। অথবা দু-হাত বাড়িয়ে জড়াতে চান। নাগালে নেই। এ ক্রুড প্রটেস্ট অব এ মাইটি ইয়ং, অ্যানার্কিক···আই অ্যাম্ নট হিজ এনিমি, এ ফাদার ক্যাননট বি···দূরে, স্টেশনের বাইরে হঠাৎ দু-রাউণ্ড গুলির শব্দ। প্রচণ্ড শব্দে স্টেশনের হাজার হাজার মানুষের চিৎকার, হল্লা, হুটোপুটি এক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেল। বুকের ভিতর একটা ধাক্কা সামলাতে চোখ বুঁজে ঝিম মেরে দাঁড়ালেন অধ্যাপক। অবশেষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরল কেউ ! অসহায় নিরীহ কোন মানুষ। অন্ধকারে আততায়ী খুঁজছে ওরা, যখন অন্ধকারে আততায়ী নেই। এবং অধ্যাপককে ঘিরে মানুষের চিৎকার আবার বাড়ছে। কান্না আর আর্তনাদ। চোখ খুলেই চমকে শিউরে উঠলেন। তৃতীয় শ্রেণী কামরার জানালায় মুখ বাড়িয়ে ধুকতে ধুকতে বমি করছে জরাগ্রস্ত বুড়ি, সত্তর-আশি কি তারও চেয়েও বেশি বয়স ! পানের কষ না রক্ত ! ছুটে গেলেন। রক্ত ··রক্ত বমি। কামরার ভিতরে ভিতরে মানুষে-মানুষে ঠেলাঠেলি, ধস্তাধস্তি, সরু ঘুপচির মধ্যে শিশুপুত্রকে বুকে চেপে চিৎকার করে কেঁদে জোয়ান-মরদ মানুষ পুরুষমানুষের ঠেলাঠেলি সামলাচ্ছে যুবতী-বৌ, বাঙ্ক থেকে গড়িয়ে পড়ছে টিনের স্যুটকেশ, জানালায় জানালায় মাথা গলিয়ে বেরোতে চাইছে মানুষ, চাপে পড়ে মুখে রক্ত তুলে, চোখ উল্টে গড়িয়ে পড়ছে বুড়ো চাষী। কুম্ভমেলার যাত্রী সব। স্নান সেরে পুণ্যি নিয়ে ফিরছে এবং এরই মধ্যে পুলিশের টর্চ-লাঠি-হুঙ্কার ! অধ্যাপক সইতে পারলেন না। স্নায়ুতে স্নায়ুতে টনটন করছে মাথাটা। দাঁত-মুখ খিঁচে, মুখে নিঃশ্বাস টেনে কাঁপতে কাঁপতে সরে আসবেন, হঠাৎ, যেন বিশ্বাসই করা যায়

না, সেই ভিড়ের মধ্যে, দুর্গন্ধ, ভ্যাপসা গরম আর অসম্ভব ঠেলাঠেলির মধ্যে হঠাৎ সেই যুবক! নিরুত্তাপ, শান্ত, উত্তেজনাহীন। যেন মানুষের সেবার কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ তাঁর চোখে চোখ পড়তেই যেন চেহারা বদলে গেল। ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসতে লাগল। ভয়ে পিছিয়ে এলেন অধ্যাপক। আবার গল্‌গল্ করে ঘামতে শুরু করলেন। এবার পাণ্টা-পিস্তলের মুখে ধরা পড়বে ছেলেটা। কল্পনা করতেও যেন চোখ বুজে এলো। থিসিসটা অন্য হাতের বগলে নিয়ে বুক হাতড়াতে শুরু করলেন। সামনেই কতগুলি নির্দোষ নিরীহ যুবককে পেটাতে পেটাতে, টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলেছে পুলিশ; খোলা-রিভলবার হাতে একজন ইনস্‌পেক্টারের অকারণ লাথি! এরা সবাই নিরপরাধ, এখন এই হাজার হাজার মানুষের সবাই নির্দোষ। আর কেউ না জানুক তিনি জানেন। মাথাটা দপ করে জলে উঠল হঠাৎ। প্রোটেস্ট, এ রাইট অ্যাণ্ড যাষ্টিফায়েড প্রোটেস্ট! চিৎকার আর আর্তনাদে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে যখন শব্দব্রহ্মাণ্ড তোলপাড়, শরীর-মনে সর্বস্বান্ত, ক্লান্ত এবং ক্ষুব্ধ অধ্যাপক ধুকতে ধুকতে হাঁপাতে হাঁপাতে সেই অরণ্যে ব্যাধ খুজতে শুরু করলেন অথবা ব্যাধের শিকার। একে একে প্রতিটি কামরায় জানালায় জানালায়, দরজায় সেই শিকারী কুকুর আর আর্ত মানুষ আর…কী এক দুর্বোধ্য অস্থিরতায় পাগল হয়ে উঠলেন অধ্যাপক, যেখানেই মানুষ আর মানুষের জটলা সেখানেই সেই মুখ, দৃষ্টি থেকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করতে পারছেন না যাকে। ব্যাগ আর কাগজপত্তর মেঝেতে রেখে, পাইপটা দাঁতে কামড়ে চশমাটা নামালেন। পাঞ্জাবির কোণে কাচ মুছতে মুছতে পিটপিট করে তাকালেন চারিদিকে। দৃষ্টিভ্রম! জোর করেই যেন ভুলতে চাইছেন সেই মুখ। চশমাটা চোখে এটে আবার তাকাতে যাবেন, ঘাবড়ে গেলেন, এই কোলাহলের মধ্যে কতগুলি ভারি বুটের প্রচণ্ড শব্দ তেড়ে এলো তাঁর দিকে, চারদিক থেকে ঘিরে ফেলল। আর-পি-এফের সেই অফিসার, পুলিশের বড়োকর্তা, স্টেশন-মাষ্টার 'হিয়ার ইউ আর, ডঃ দাশগুপ্ত...'

এতগুলি ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, হিংস্র মানুষের মধ্যে অসহায় অধ্যাপক হকচকিয়ে গেলেন। হাতের আঙুলের বদলে খোলা-রিভলবার তুলে কথা বলছে সবাই। 'ট্রেনটা আমরা ছেড়ে দেব। কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।' বিমূঢ় অধ্যাপক নির্বাক। 'রিজার্ভড্-ফ্রম থার্টি-নাইন থেকে আপনার সব জিনিস আমরা তুলে রেখেছি নাথিং ইজ্ লস্ট...' 'আপনি বলেছেন, সে ছোকরাকে আপনি দেখেছেন। আপনার কামরায় ছিল।' 'প্রায় সাড়ে চার শ বদমাশ

ছোকরাকে স্ক্রিন করেছি···' 'কাল সকালে আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে।' 'আজ রাতে বিশ্রাম করুন।' 'ইউ আর আওয়ার ম্যান।' 'ইউ মাস্ট হেল্‌প আস্‌—'.

বিস্মিত হতবাক অধ্যাপক অসহায়ভাবে তাকালেন। প্রতিবাদ! উন্মত্ত আর হিংস্র মানুষগুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যেন ভাবতেই পারলেন না, ওই রক্তাক্ত চোখগুলি মানুষের ভাষা বোঝে! পিস্তল হাতে মানুষের কোনো ভাষা আছে! তাই অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় আর-পি-এফের অফিসার যখন পকেটের দেশলাই জেলে তাঁর পাইপটা ধরিয়ে দিলেন, এবং রাইফেল কাঁধে একজন পুলিশ মাটি থেকে ফোলিও ব্যাগ আর থিসিসের ফাইলটা হাতে তুলে নিয়ে যখন পিছনে আর্দালির মতো দাঁড়াল এবং দুজন এস-আই ডানে বাঁ-এ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে এগোবার নির্দেশ দিলেন, হতবিহ্বল অধ্যাপক, যেন গ্রেপ্তার হলেন, নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন। প্ল্যাটফর্ম ট্রেন ভিড় জনতা কোলাহল সব কিছু ছাড়িয়ে স্টেশনের দোতলায় সুন্দরভাবে সাজানো ফার্স্ট-ক্লাশ ওয়েটিং-রুমে পৌঁছে দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা চারজনই যখন পুরো কায়দায় স্যালুট ঠুকল, ঘটনার পর ঘটনায়, ধাক্কার পর ধাক্কায় ক্লান্ত অধ্যাপক একবার ফিরেও তাকালেন না। এই নির্জন আর সুন্দর ঘরটাকে যেন আশ্চর্য এক স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল তখন। আরাম কেদারা, সোফা-সেট, ফুল-সাইজ আরশি, ফুলদানিতে সত্যিকারের তাজা রজনীগন্ধা। গান্ধী-জওহরলালজির ফটো ছিল দেয়ালে, 'ভিজিট-ইণ্ডিয়া'র কাশ্মীরের ডাল-লেক, মাদুরাইর মীনাক্ষী মন্দির, দিল্লীর কুতুব, কোথাকার উপজাতি রমণীর লোকনৃত্য। যদিও রাত শেষ হয়ে আসছে। ভোরের কাক ডাকছে কোথায়! জানালায় ভেন্টিলেটারের কাছে অন্ধকার ফর্সা হয়ে উঠছে। ক্লান্ত অধ্যাপক বাথরুমের দিকে এগোলেন। বাথরুম! বন্ধ দরজার হাতলে হাত রাখতেই সারাশরীরে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠলেন। এবং যেন মুহূর্তে চারদিকের সব দেয়াল সঙ্কুচিত হতেহতে একেবারে তার গা ছুঁয়ে জেলখানার সেল হয়ে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে একটা ইজিচেয়ারে ঢলে পড়লেন। এবার এই ভয়ঙ্কর নিস্তব্ধতা তার শত্রু। সামনেই নগ্নবক্ষ গান্ধীজির সহাস্য ছবি। গুলিবিদ্ধ বুকের পাশে আশ্বাসের বরাভয়। যেন অজান্তেই হাতটা বুকে উঠে আসে। বুক হাতড়ান। নিজের দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করার মতো এতটা শক্তি তাঁর নেই। যেন আচ্ছন্নতার একটা ঘোর জড়িয়ে আছে মাথায়। চোখের ডগায় লেপটে থাকা সেই মুখ, দৃষ্টিভ্রম নয়, ভ্রান্তি নয়, যেন স্পষ্ট দেখছেন, মেঝেতে

লম্বা দীর্ঘ ছায়া ফেলে সেই যুবক দরজায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সেই ভীষণ দৃষ্টি। 'তুমি!' অধ্যাপক উঠলেন। গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে ফাইল আর থিসিস আঁকড়ে ধরলেন। যাকে তাঁর সনাক্ত করার কথা ছিল এই ভোরেই এবং যা তিনি কখনই পারতেন না, সেই যুবক···অধ্যাপক সোজা চোখ রেখে ফাইল ব্যাগ নিয়ে দাঁড়ালেন। খট্-খট্ শব্দ তুলে পিস্তলের গুলি খুলে আবার একটি একটি করে ভরতে ভরতে সেই শব্দহীন যুবক এগিয়ে আসছে। 'তোমার নাম দীপায়ন, দীপু, আমি জানি···দীপু···' বড়ো গোল টেবিল, যার উপরে ফুলদানিতে তাজা রজনীগন্ধা, তার একদিকে অধ্যাপক, অন্যপ্রান্তে সেই যুবক— যেন কী এক দুর্লজ্ঘ্য টানে আটকে গেছেন, যেন ঘুরতেই হবে, ঘুরে যেতেই হবে, যতক্ষণ এই যুবক চায়। কিন্তু আস্তে আস্তে যেন অবধারিত হয়ে উঠছে পিস্তলটা, আর ভয় করছে না। এক্ষুনি গর্জে উঠলে নিশ্চিত মৃত্যু। এবং যেহেতু মুক্তি নেই, মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলেন অধ্যাপক। থমকে দাঁড়ালেন। এক-পা দু-পা করে পিছুতে শুরু করলেন। তিনি জানেন, এক্ষুনি অথবা যে-কোনো মুহূর্তে যুবকটি তার কাজ শেষ করে নিতে পারে। হঠাৎ, পিঠটা গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল দরজার কোণে। ব্যথা-যন্ত্রণার কোনো অনুভূতি নয়, একটা মরীয়া চেষ্টা। ছিটকে লাফ দিলেন বাইরে। ছুটতে শুরু করলেন। বাঁ-হাতের বগলে থিসিসের ফাইল ফাইলটা ছিঁড়ে গেল, শুধু কাগজগুলি কোনমতে চেপে, ডানহাতে শক্ত কব্জিতে আকড়ে ধরেছেন ব্যাগ। পিছনে তাকাবার সাহস নেই। বিস্তীর্ণ বারান্দায় যে রেলের কুলিরা তখনও ঘুমোচ্ছিল, একে একে তাদের অনেককেই মাড়িয়ে, টপকে ছুটতে ছুটতে ডানদিকের সিঁড়িতে গড়িয়ে নামতে লাগলেন। ভোরবেলার শান্ত নির্জন প্ল্যাটফরম্, এখন বিশ্বাসই করা যায় না আর, কাল রাতে রীতিমতো ঝড় হয়ে গেছে এখানে; এবং আজ এখন যার হাজতবাসের কথা, বোধহয়, চাঁদ-সদাগরের লোহার দুর্গে ফুটোটাই সত্যি, সেই যুবক,···একবার মাত্র পিছনের দিকে তাকালেন অধ্যাপক, প্যান্টের পকেটে দু-হাত রেখে অত্যন্ত শান্তভাবে এগিয়ে আসছে। যেন 'কোথায় পালাবে?' ভঙ্গিতে উপেক্ষা। অধ্যাপক ছুটতে লাগলেন। উত্তেজনাহীন যুবকের মন্থর-হাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বৃদ্ধের দৌড়। প্ল্যাটফরম পেরিয়ে রেলের ইয়ার্ড, অসংখ্য লাইন, শেলেটের উপর নিরক্ষর শিশুর আঁকিবুকির মতো লাইনের পর লাইন, যেন দুর্লজ্ঘ্য নিয়তির মতো টানছে, ঝাঁপিয়ে পড়লেন অধ্যাপক, গা ঘেসে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ি, পায়ের

তলায় কাঠের পাটাতন, পাথরের কুচি, পায়ে পায়ে হোঁচট, অনিদ্রার ক্লান্তি আর ঘুম, তবু জীবনের টানে, বাঁচার তাগিদে ছুট, ছুটতে হয়, হাঁপ ধরে দাঁড়াবার স্থযোগ নেই, আর ধরে রাখা যাচ্ছে না বগলের কাগজগুলি, স্থতো ছিঁড়ে গড়িয়ে পড়ছে, ভারতের কৃষি-অর্থনীতির উপর জ্ঞানগর্ভ গবেষণা, অনেক নিষ্ঠা অনেক সাধনার সম্পদ, যা হয়তো দরিদ্র ভারতবর্ষের চেহারাই বদলে দিত, একটি একটি করে টাইপ করা সাদা-কাগজ খসে খসে পড়ে ভোরের বাতাসে উড়তে লাগল এবং ছাই গাদায় কয়লা-কুড়োনি ন্যাংটো শিশুরা হঠাৎ কাগজ-কুড়োনি হয়ে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে তাড়া করল, অধ্যাপক, পিছনের সেই শব্দহীন যুবক আর অসংখ্য শিশুর কলরবের মধ্যে অসহায়ভাবে যেন কাকে খুজলেন, কোনো মুখ, দীর্ঘ ত্রিশ বছরে পুরো একটা জেনারেশানের উপর নিজের প্রতিষ্ঠা, হাজার যৌবনের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে কনভোকেশানের আনুষ্ঠানিক প্যারেডের মতো অনেক পথ পেরিয়ে এখন যেন অন্য কোনো উপায় নেই বলেই উর্ধশ্বাসে ছুট, রেল-ইয়ার্ডের কুলি-পয়েন্টস্‌ম্যান আরও সব মানুষের চারদিক থেকে চিৎকার কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই, ছুটতে ছুটতে, ছুটতে ছুটতে একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখানে ইয়ার্ড ফুরিয়ে গিয়ে সোজা সমান্তরাল রেখায় দু-জোড়া রেল লাইন কোথায় স্থদূরে অচেনা ভারতবর্ষে গিয়ে মিশেছে, যেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতো রেল-লাইনের সরলরেখায় ছুটে আর লাভ নেই, উঁচু থেকে বাঁ-পাশের খাদে, ঝোপ-জঙ্গল, বন-বাদাড়ের ভিতর দিয়ে, দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, যেন বেহুঁস হয়ে গড়িয়ে নামতে লাগলেন, ইটের টুকরো, পাথরের কুচি, ভাঙা-কাচ আর বুনো জঙ্গলের কাঁটায় কাঁটায় পায়জামা ছিড়ে কুচিকুচি, পায়ে হাঁটুতে রক্ত, মুখে রক্ত আর গ্যাঁজলা, যখন মৃতপ্রায়, যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া বরং ভালো ছিল বলে ভ্রম, ঠিক তখনই সমতলে জল-কাদায় ধানের খেতে মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কৃষি-অর্থনীতির থিসিসের সেই মূল্যবান পরিশিষ্ট অংশটা, যেটুকু তখনও বগলে ছিল, ধানের খেতের কাদায় পড়ল, হাতের চাপে গেঁথে গেল। প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে সবুজ কচি ধানের ডগায় ভোরের বাতাস আর মাথার উপরে সারা আকাশ জুড়ে আকাশ। কাদামাটির পচা-গন্ধ, সারা মুখে পিল্‌পিল্ করে ধানগাছের স্থগন্ধ, দু-হাতের কনুই ডুবে গেছে মাটিতে। যেন কুমিরের দাঁতে আঁকড়ে ধরেছে মাটি আর কোন উপায় নেই। এবার মৃত্যু—ধুকতে ধুকতে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা শুধু, এবার পিস্তলটা গর্জে

উঠলে আর পালাবার শক্তি নেই, মরতে হবে, বুকে ধড়ফড়্ বাড়ছে, নিঃশ্বাসে কষ্ট, চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে—ঢলে পড়েছেন, আস্তে আস্তে যেন শিথিল শরীরটা নেতিয়ে পড়ছে কাদায়, কাদামাটিতে মাখামাখি—এবং ঠিক তখনই কারা যেন ছুটে এল, জড়াজড়ি করে ধরে তুলল। ঠিক শেষ মুহূর্তে ঝাপসা চোখে দেখে নিতে চাইলেন অধ্যাপক…এই ভোরবেলায় মাঠের কাজে এসেছিল যারা, নেংটি-পরা রোগা রোগা কালো-মানুষগুলি ধরাধরি করে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে আল ধরে ধরে এঁকে বেঁকে আরও গভীর গভীর মাঠের দিকে চলল —এবং নিজের শবযাত্রায় শুয়ে যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন, আততায়ী যুবক ফিরে যাচ্ছে নিঃশব্দে, যেন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আবার দেয়ালে-টাঙানো গান্ধীজি। বুকে বরাভয় হাত তুলে যেন আততায়ী-কেই সহাস্যে কিছু বলতে চাইছেন। থাবলা দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরলেন অধ্যাপক। দুঃস্বপ্নের ক্লান্তিতে তিনি তখনও ঘামছেন। বুক কাঁপছে। তাঁকে ঘিরে তখন অনেক মানুষ। সবই চেনা-মুখ। যেন তিনি নিজেই এক নিকৃষ্ট অপরাধী, ইন্টারোগেশান চেম্বারে লাইট-ট্রিটমেন্ট আর জেরা চলবে তাকে ঘিরে। একরাশ বিরক্তিতে ঝাপসা-চোখে তাকালেন চারদিকে। সেই ফার্স্ট-ক্লাশ ওয়েটিংরুম। শকুনের মতো হিংস্র পোষাক-পরা মানুষগুলির মধ্যে…একেবারে মুখোমুখি, সামনের সোফায়, ভালো করে লক্ষ্য করলেন; ভুল নয়, দীপু…সত্যি দীপু…আর-পি-এফের অফিসার আর পুলিশের বড়োকর্তার ঠিক মাঝখানে। ওর শাণিত তীক্ষ্ণ চোখের-দৃষ্টি তাঁকে বিঁধছে। অধ্যাপক বিস্মিত হলেন না। চোখ বুঁজে গা এলিয়ে দিলেন। যেন যেকোনো কিছুই ঘটে যেতে পারে এখন, কিছুই আর অসম্ভব নয়। 'ডু ইউ রিকগ্নাইজ হিম্, স্যর !'

অধ্যাপক সাড়া দিলেন না। বাঁ-হাতের অসহ্য যন্ত্রণাটা উঠে এসে সমস্ত বুককে কুঁচকে দিচ্ছে। 'হি ক্লেম্স্ ইউ টু বি হিজ্ ফাদার…'

যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠছে। 'দি বয়, আই এনকাউণ্টারড লাস্ট নাইট হ্যাড এ ডিফারেণ্ট ফেস্…' বলতে চাইলেন। পারলেন না। ঠোঁট কাঁপল শুধু। জল। ভীষণ তেষ্টা ! শেষ-তৃষ্ণার জল, সন্তানের হাতে,…

'হি ওয়াজ ক্যারিং আন্লাইসেন্সড রিভলবার অ্যাণ্ড সাম্…'

কম্পিত হাত দুটি বাড়িয়ে অধ্যাপক অসহায়ভাবে কিছু যেন ধরতে চাইলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ, একেবারে অতর্কিতে লুটিয়ে পড়লেন। ছুটে এল মানুষগুলি। চারদিকে তখন অসংখ্য পিস্তল। কেউ দয়া করল না। হাত-পা-ছুঁড়ে দাপাতে দাপাতে অধ্যাপক, একবার, শুধু একবার চোখে চোখ রেখে তাকাতে চাইলেন। সন্তানের মুখ। গত ত্রিশ বছরে নিজের সুস্থতা দিয়ে যে সন্তানকে তিনি সুস্থ রাখতে পারেন নি।

আমাকে জাগতে দাও

মণীন্দ্র রায়

আমারই বুকের হাড় থেকে তুমি,
আর আজ, নারী, তুমি কোথায় ?......
তাল তাল অন্ধকার আর অশ্রু, অশ্রু আর অন্ধকার,
আর আমার স্বপ্ন, আমার নির্মাণ ; তবু
তোমাকে বুকে নিয়ে আমি কেঁপে উঠি।

তোমার দেহকে আমি ছুঁই ;
তোমার স্তনের ওপর হাত রাখি—
কৃষকের হাত স্পর্শ করে যেমন তার ধানের শীষ ;
তবু যতোবার জাহাজ ভাসাই তোমার উপকূলের দিকে,
চারিদিকে শুধু জলে-ডোবা অগ্নিগিরির গর্জন ;
আর ঘূর্ণি, আর মৃত্যু !
কোথায় আমার মাটি, আমার আশ্রয়, আমার স্বপ্ন !
এই শূন্যতা আমাকে প্রহার করে।

যেন দিনের পর দিন আমার ছিল শুধু কাঠামোয় খড় বাঁধা,
আর ঐ কাদা-ছানা, ঐ রঙের আয়োজন ;
আর আরূঢ় এখন তুমি বেদীর ওপর অলৌকিক ;
আর তোমার চোখে তুলির শেষ-টান এঁকে আমি অসহায়,
ন্যুব্জ শীর্ণ কারিগর, দাঁড়িয়ে আছি ধুলোর ওপর, একা ;
যেন কোটি কোটি আলোকবর্ষেও রচিত হয় না আমাদের সাঁকো—
ছুঁতে পারি না আজ আর তোমাকেও !

২

মনে পড়ে সেই আমার গুহাবাসের দিনগুলি···
সারাদিন শুধু কুটিলা নাগিনীর মতো বিদ্যুৎ, আর বজ্র, আর বৃষ্টি,
যেন ছয়ঋতু গালিয়ে শুধু বর্ষা; সারাবছর···সারাবছর,

আর প্লাবন আর অন্ধকার. আর কোটি গাছের অরণ্য;
আর দিকে দিকে শুধু দাবানল আর ভূকম্পন আর ধ্বংস,
আর গুহার উদরে সিক্ত পশুর মতো উলঙ্গ আমি, মানুষ ;
চারিদিকে শুধু অতিকায় সরীসৃপের নিশ্বাস আর হিংসা আর চিৎকার !
আর আমার ক্ষুধা, আমার নির্জন, আমার ভয় !···
এই রাক্ষসী পৃথিবীর হিংস্র উদাসীনতায় মরীয়া
বুকের হাড় থেকে উপড়ে আনলাম আমি তোমাকে—
হে আমার উদ্ধার, আর রচনা, আমার প্রেম,
রোপন করলাম তোমাকে আমার স্বপ্নের কেন্দ্রে ;
আর তুমি নারী, তোমার ওষ্ঠে একি বিদ্যুৎ···শোণিতে আমার সাহস···
দৃপ্ত তেজে ধারণ করলাম পাথরে-গড়া কুঠার,
আর প্রকৃতির মুখোমুখি আমি, তোমার জ্ঞানফলের রসায়নে বলীয়ান,
জ্বলন্ত মশাল হাতে পাতাল থেকে ছুটেছি স্বর্গের দিকে,
আর ঈশ্বরের প্রাসাদে আমি প্রতিবাদ—
পাপের দুঃসাহসে হাতে তুলে নিয়েছি আইন,
আর প্রতি পদক্ষেপে সেদিন খুলে গেছে দরজার পর দরজা,
দরজার পর দরজা···
আর বিজয়ীর মতো আরোহণ করেছি তোমার মিনারে,
আকাশের বুকে উড়িয়ে দিয়েছি আমার নিশান—
আমি এসেছি !

সে বিস্ময়, যেন আবিষ্কার !
লোহাকে হাতে তুলে নিয়ে বলেছি, তুমি হও !—
আর দৈত্যের মতো নতশির, শক্তিকে বহন করেছে সে তার মাথায়,
আমি জলের শরীর থেকে টেনে বার করেছি বাষ্প,
আমি চুম্বকের আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে এনেছি বিদ্যুৎ,
আর তুমি, নারী—আমার প্রকৃতি, আমার প্রিয়া—
আমার মাথার ওপর পরিয়ে দিয়েছ সেদিন সোনার মুকুট,
আর কানে কানে বলেছ—আমার রাজা !

কী উল্লাসে মথিত করেছি সেদিন তোমার হৃদয়,
জন্মাতে চেয়েছি তোমার প্রেমে !……

আর আজ, প্রাকারের বাইরে আমি ভিখারী,
তোমার উৎসবের উল্লাস খড়্গ চালায় আমার শরীরে,
আমি ছিন্ন !
কবন্ধের মতো পড়ে আছে ঐ আমার শরীর—
ধুলোয় আর রক্তে আমার অবহেলায়,
তুমি নিষ্ঠুর !

৩

আমার যন্ত্রণা আমাকে ঘুমোতে দেয় না—
সেই ঘুম যা জননীর মতো ধারণ করে আছে এই সংসার,
প্রতিটি রাত্রির শিয়রে যা রূপকথার মতো অবারিত,
চেতনার গভীরে যা সেবার মতো,
অন্ধকারের মাটিতে যা শিকড়ে শিকড়ে ঢেলে দেয়
সবুজ হয়ে ওঠার উদ্যম—
পাথরে পাথরে বন্দী আমি, পৌঁছতে পারি না সেই আকাশে।
আমার সমস্ত বেদনা শুধু পাখা ঝাপটায় এই খাঁচার ভিতরে !

আর তুমি, অপরূপ দুটি আয়ত চোখ মেলে, নারী,
চেয়ে আছ আজ কোন্ দিগন্তে ?
রাত্রির স্নায়ুর ভিতরে ঝিঁঝির শব্দের মতো
আমার শোণিতে শুধু আজ তোমারই ঝঙ্কার !··
আমার পাঁচটি কামনাকে যেন একই শরীরে তৃপ্ত করেছ তুমি
দ্রৌপদীর মতো ;
আমার মৃত্যুর শিয়রে তুমি সাবিত্রী, ফিরিয়ে এনেছ আমাকে
যমের দরজা থেকে ;
ভীমা তুমি, ভৈরবী, খড়্গ ধরেছ আমারই শত্রুর সংহারে—
তোমার দৃপ্ত তেজের প্রতি পদক্ষেপে তুমি রুদ্রমধুর,

কেঁপে উঠেছে তোমার স্তনাগ্রচূড়া।
তোমার তৃতীয় নয়নে জলে উঠেছে আগুন ;
আবার আমারই স্বপ্নের জননী তুমি
মাটিতে লুটিয়ে কেঁদেছ তারই হত্যার শোকে সুভদ্রা !
জানি, আমার প্রেমে দেবতার চক্রান্ত ব্যর্থ করে
দময়ন্তীর বরমাল্য দিয়েছ তুমি আমারই গলায় ;
আমারই ক্ষুধার লড়াইয়ে ব্যাধের অরণ্যে তুমি বধূ আমার
ফুল্লরার ঝাঁপি ব'য়ে ঘুরেছ তুমি আমারই পাশে কাঁটার পথে ;
আর আজ, আমার তৃষ্ণার সমুদ্র থেকে বেরিয়ে-আসা
লাবণ্যের প্রতিমা তুমি, উর্বশী,
আমার উত্তোলিত বাহুর শেষ করাঙ্গুলি থেকে মুক্ত ঐ তোমার আঁচল,
আরূঢ় হয়েছ তুমি আকাশে ;
আমার চিৎকার শাণিত বর্শার মতো উন্মাদ
ছুটে চলেছে আজ শূন্যে—
তুমি কোথায় ?

৪

কোথায়, কোথায় তুমি নারী, আমার উদ্ধার ?
কোথায় তোমার করুণার অবারিত প্রপাত !
এই বাঁজা মাটির খোয়াই, আর উলঙ্গ ক্ষতচিহ্নের মতো ভূমিক্ষয়—
কতোকাল আর আমি ধারণ করব আমার বুকে ?

আমি যেদিকে চোখ মেলি, শুধু তুমি !
পৃথিবীর যতো মাঠের ওপর পেতেছি আমি রেললাইন
দেখেছি তুমি ধোঁয়ার মতো এলোচুলের রাশি উড়িয়ে
ছুটেছ যেন কিশোরী মেয়ের লাবণ্যে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ;
বাঁধের পর বাঁধে কংক্রীটের বাহুতে ধরা পড়েছ তুমি নদী,
স্লুইস-গেটের ফাঁকে ঢেলে দিয়েছ তোমার উচ্চকিত খুশির উল্লাস ;
আমার সমস্ত নিঃসঙ্গতার কেন্দ্রে তুমি গান গেয়ে উঠেছ বেতারে বেতারে ;
দুঃখে আমার টেবিলে রেখেছ প্রিয়জনের ফোটো,

যন্ত্রে যন্ত্রে বুনে গেছ তুমি বিদ্যুতের সুতো,
বাসরঘরে নববধূর মতো উদ্‌ঘাটিত করেছ পরমাণু-হৃদয়ের বিস্ময় ;
আবার রুখে উঠেছ তুমি বিস্ফোরণে, উড়িয়ে দিয়েছ ঐ অবাধ্য খনির পাথর ;
চিরদিনের আহ্বান তুমি, তোমারই খোঁজে আমি মহাকাশ থেকে মহাকাশে
তোমার বুকের মধ্যে আমি ভারহীন, যেন পুতুল,
শূন্যে ঝাঁপিয়ে তোমারই ভালোবাসায় জেনেছি আমার দ্বিতীয় জীবন।
তুমি অপরূপ !

জানি তুমি কতো বিরাট, কতো দুঃসহ !
তবু, কোটি কোটি ছুটন্ত ঘোড়ার মতো উদ্দাম ঐ বিদ্যুৎ
কী করে ধারণ করেছ তুমি তামার তারের মতো তন্বী তোমার শরীরে !
বিস্ময়ে আমি হতবাক ! নারী,
আমারই বাহু-বন্ধনে ধরা দিয়েছ তো তুমি একদিন,
আমার এই আর্ত দুঃসময়ে
কোথায় চলেছ তুমি, কোথায় ?

দিনের পর দিন তুমি বদলে যাও,
বদলে যাও আমার চোখের সামনেই।
তুমি, চিরদিনের প্রেয়সী আমার,
পিকাসোর ছবির মতো বদলে ফেলেছ তোমার আদল,
তোমার মুখের মধ্যে ভেসে উঠেছে আজ শত শত মুখের উদ্ভাস ;
চিনতে পারিনা তোমাকে, ছুঁতে পারিনা।
তোমার নতুন নামের বন্যা ভাসিয়ে দেয় তোমার পুরনো নাম ;
তোমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি বিপন্ন,
বিদেশীর মতো ভাষাহীন।

কবে যেন আমারই প্রেমে তুমি আকাশে রেখে গেছ জ্যোৎস্না ;
আমারই অশ্রুর সাগর থেকে তুলে এনেছ মুক্তো ;
পাখির কামনা নিয়ে যতোবার আমি উড়ে গেছি তোমার জানলায়
বিম্ববতী তুমি, শুনিয়েছ আমাকে রূপকথা ;

আমারই জন্যে প্রদীপ তুলে দাঁড়িয়ে থেকেছ দরজায়—
তোমার এই স্বপ্নগুলোকে আমি টাঙিয়ে রেখেছি অবচেতনার দেয়ালে,
সেখানে চোখ রাখলেই প্রতিমার জ্যোতির্বলয়ের মধ্যে
উদ্ভাসিত তোমার মুখ,
ধ্বনিত হতো তোমার নিশ্বাস আমার রক্তে,
আমি বেঁচে উঠতাম।

৫

আর আজ তুমি, নারী,
তোমার দিকে তাকিয়ে আমি অসহায়—
যেন হেস্টিংসের সেই ডুয়েলের তরবারি হাতে
হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি এই বিশ শতকে ;
আমার চোখের সামনে রাত্রির স্কাইস্ক্র্যাপারের মতো
আলোকিত শত শত জানলায় রহস্যময়ী তুমি, দুর্বোধ ;
ঘড়ির কেন্দ্র থেকে উৎসারিত দুটি কাঁটার মতো
সময়ের ওপর দিয়ে আমি শুধু অন্ধের হাত বুলাই ;
জানিনা তোমাকে, চিনি না,
তোমার দৃশ্য থেকে দৃশ্যে যেতে আমি হোঁচট খাই !

তোমার নতুন পথের তেমাথায়
আমি গেঁয়ো মানুষের মতো নাজেহাল,
চেয়ে দেখছি তোমার খেলা, দেখছি—
ফুটপাতের ঘাম আর চিৎকার থেকে
কোণাচে হয়ে উঠে আসছে তোমার কবিতা ;
ক্যাবারের কোমর-দোলানো নাচে উলঙ্গ তুমি, উন্মাদ,
আমার রুচির ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছ ছিটকে পড়া ঝাড়লণ্ঠনের শাণিত হাসি
আবার নীল রুমালে জড়িয়ে তোমার অবাধ্য চুলের দীপ্তি
মাঠের পর মাঠে চালিয়ে যাও তুমি ট্র্যাকটর,
ঝাঁপিয়ে পড়ো সমুদ্রের বুকে ডুবুরী,
আর হাজার ফুট অন্ধকারে জলজ উদ্ভিদ আর তারামাছের জগতে তুমি নতুন তারা।

তোমার এই বিপরীত, এই সংঘাত,
ছুঁচের চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় আমাকে উটের মতো।
আমার সারা তৃষ্ণায় এখন শুধু জলের ঘ্রাণ।

জানি, আমারই শ্রমের ফসলে ভরে তুলেছ তুমি তোমার ভাণ্ডার;
আমারই বুকের তৃষ্ণা আর পেশীর উল্লাস
জেহাদী ভালোবাসা আর মনীষার তীক্ষ্ণ প্রহারে
গুঁড়িয়ে দিয়েছি আমি অবরোধের প্রাকার, বাড়িয়ে চলেছি সীমানা,
চেতনার গলিতে গলিতে জ্বালিয়ে তুলেছি আমি মশাল;
যন্ত্রের পর যন্ত্রে, আয়ু আর আরোগ্যে, মেধা আর ধ্যানে
মেলে ধরেছি আমার মণিপদ্মের পাপড়ি।
তুমি এসেছ!
আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সারা শরীরের অনুভবে টের পাই, তুমি এসেছ!
আমাকে দেখতে দাও।

৬

দেখতে দাও আমাকে তোমার ঐ মুখ,
আমাকে বদলে দাও।
আমাকে রোপন করো তোমার ঐ নতুন মাটিতে, আমাকে যুক্ত করো।
ত্রিশূলে বিদ্ধ করো আমার এই হৃদয়, আমাকে মুক্ত করো।
পাথরে পাথরে ঘর্ষণে তুমি আগুন, তুমি নতুন;
তোমার ঐ ত্রিতল রূপের কোণাকুণি আমি দাঁড়িয়ে রয়েছি নির্বোধ;
কী কথা বল তুমি, নারী,
কী কথা?....

আমি যেদিকেই কান পাতি, শুধু চিৎকার!
অফিস আর আদালত থেকে, হাসপাতাল আর মন্দির থেকে,
চিৎকার ফেটে পড়ছে ফ্যাক্টরির সাইরেনের মতো তীক্ষ্ণ।
নীরবতার অনিদ্র রাত থেকেও চুঁইয়ে পড়ছে তার নির্যাস—
উন্মুক্ত ক্ষতস্থান থেকে রক্তের মতো ফোঁটায় ফোঁটায়;

চিৎকার গর্জে উঠছে একরোখা বাপান্তে, মিছিলে আর বিস্ফোরণে,
লাখো লাখো পায়ের তলা থেকে, বুকের গহ্বর থেকে,
জিহ্বার আঘাত থেকে কলরোল,
আর তখনি ঘন অন্ধকারের অলিন্দ থেকে
কে যেন হেঁকে উঠল,
শোনো ঐ—!

৭
বেজে উঠেছে তোমার ঘণ্টা।
এবার তবে বোধন!···

কোলাহলের হট্টরোলে
ঠেলাঠেলি আর হাতাহাতি, হারিয়ে যাওয়া আর এগিয়ে আসার ভিড়ে
জ্বলে উঠল ঐ তোমার উৎসব—
তরঙ্গের সমুত্থিত শিখরে আরূঢ় এখন তুমি, নারী,
প্রতিমার মতো অলৌকিক!
আর আমি, মাটির ওপর দাঁড়িয়ে ন্যুব্জ শীর্ণ কারিগর,
ভ্রূণের মতো প্রতীক্ষায় আমি তোমারই সামনে,
অজানা জন্মের দ্বারে স্তব্ধ!
জায়া তুমি, এসো, আমাকে পার করে দাও ঐ তোরণ।
আমার চারিদিকে আজ কালো অন্ধকারে জ্বলে
কোটি কোটি বিস্ময়ের সৌরপ্রদীপ!
কী মহান আরতি তোমার
শতাব্দীর সিঁড়িতে আজ উদ্‌ঘাটিত ঐ নক্ষত্রসভায়।
আমাকে গ্রহণ করো, নারী, যোগ্য করো।
আমার এই বুকের খাপ থেকে ঝলকে উঠুক তোমার
উলঙ্গ তরবারির মতো স্তোত্র—
আমাকে জাগতে দাও॥

অভিমন্যু

চিত্তরঞ্জন ঘোষ

প্রথম খুন

'মানুষকে মারাটাও আমাদের একটা বিজ্ঞান হিসেবে শিখতে হবে। প্রথম দিকে আমাদের নার্ভ ফেল করতে পারে। যেমন গোলের সামনে এসে খেলোয়াড়দের অনেক সময় হয়। সুতরাং প্রথম কথা—নার্ভ। আদর্শ ও সংকল্পের জোর চাই তার জন্যে। বাকীটুকু বারবার অ্যাকশনের অভ্যেসে ঠিক হয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, শরীরের যে কোনো যায়গায় মারলেই লোক মরে না। কতগুলো দুর্বল যায়গা—ভাল্‌নারেবল্‌ যায়গা আছে। কাজল, ভাই, তুমি একটু এদিকে এসো তো, হ্যাঁ এখানে দাঁড়াও। এই যে মাথা, আমরা সাধারণত এইখানে মারি। কিন্তু খুলির ওপরে শুধু চামড়া কাটে এতে, বা সাময়িক অজ্ঞানও হয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। মাথায় মারলে অনেক জোরে মারতে হবে, যাতে খুলি ফেটে ব্রেনটা নষ্ট হয়, ঘিলু থেকে রক্তপাত হয়। খুব কাছ থেকে গুলি করলে অবশ্য রগে গুলি করতে পারো, ওতো ব্রেন্‌ নষ্ট হবে। কিন্তু আমাদের কাজ প্রধানত ছোরা দিয়ে। ছোরা নাকে-চোখে মারা যেতে পারে। কিন্তু তাতে খ্যাঁদা-কানা হবে, মরবে না। ছোরার কাজ আসলে গলা থেকে আরম্ভ। কাজল, মুখটা তোল। আর একটু। হ্যাঁ, এইটে শ্বাসনালী। এটাকে দু'টুকরো করে দিতে পারলে নীট্‌ কাজ হবে। কাজলের গলার এই যায়গাটা—যাকে বলা হয় অ্যাডাম্‌স্‌ অ্যাপ্‌ল্‌—এর ঠিক ওপরে ছোরা চালিয়ো না। এখানে ছোট হাড় ও শক্ত কার্টিলেজ্‌ এমনভাবে রয়েছে যে ছোরা পিছলে বা ঠিক্‌রে যেতে পারে। সেইজন্য একটু পাশ থেকে ছোরাটা ঢোকানো উচিত। কাজল, দেখি, এই যায়গাটা। যে কোন পাশ দিয়েই সহজে ঢুকবে ছোরা। বেশি করে ঢুকিয়ে একটু টেনে দিতে হবে, যাতে শ্বাসনালীটা ঠিক মত কাটে। বুকে ছোরা মারলে পাঁজরার হাড়ে আটকে যেতে পারে। বুকের বাঁ দিকে হৃৎপিণ্ড আছে—সেটা তোমরা সবাই জানো। কিন্তু এর চেয়ে পেট ভালো, কারণ ছোরা খুব সহজে ঢোকে। কাজল, জামাটা তোলো। হ্যাঁ পেটের এই

খানে! ঢুকিয়ে খানিকটা টেনে দেবে, যাতে অ্যালিমেণ্টারি কেনাল্—সব নাড়ীভুঁড়ি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। পেছন দিক থেকেও ছোরা মারা ভাল। আমি এইবার একটা ডামি ছোরা দিয়ে কাজলের ওপরে ডেমন্‌স্ট্রেট করছি।'

কাজলের মাথায় লাঠি। রগে গুলি। চোখে ছোরা। গলার শ্বাসনালী দ্বিখণ্ডিত। বাঁ বুকের ছোরা পিছলে গেল। পেটের পাতালে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত অনেকগুলি ক্ষতরেখা রক্ত। খুলি ফাটা। রগ ফুটো চোখের রক্তের ধারা। ছেঁড়া টুটি। রক্তের ফিনকি। হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ। দপদপ। গলগল করে বেরোচ্ছে রক্ত। কাজলের নাড়ীভুঁড়ি পেটের বাইরে।

'কাজল, তুমি বসো গিয়ে, মনে রেখো, তোমরা হোচ্ছো জরুরি স্কোয়াডের লোক। শত্রুকে শেষ করার তোমাদের বিপ্লবী দায়িত্ব আছে। যেখানে দরকার হবে, সেইখানে এই জরুরি ও পবিত্র কাজ করতে তোমাদের যেতে হবে। তোমাদের সাফল্য কামনা করি। বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।'

কাজলের চোখে একটা স্লো মোশানের ছবি। নাচের মতো। রক্তনৃত্য। একের পর এক ধীরগতি স্পষ্টরেখ ছোরা। কোনো এক তরুণের অঙ্গ স্পর্শ করে ফিরে যায়। আবার আসে। আসতেই থাকে। বারবার। তরুণের ছটফটানি স্লো মোশানে—বিকৃত অঙ্গভঙ্গির কোনো এক অত্যাধুনিক নাচ। ছোরাটা বুরুশের মতো শরীরে লাল রং বোলাচ্ছে। মুখ; বুক, পেট। রক্ত জমিয়ে তৈরি একটা বড় সাইজের পুতুল।

প্র্যাক্‌টিস্। কাজলের ওপর প্র্যাকটিস্ করে মণি, ভন্টু, দিলীপ, আর কাজল করে ওদের ওপর। ওরা প্র্যাকটিস্ করে। সুবীরদের পার্টির ছেলেদের মারবার জন্যে। এই ট্রেনিং বছর কয়েক আগে হলে ওরাও এইখানে শিক্ষার্থী থাকত—সতীর্থ। এখন কাজলের ডামি ছোরার ডগায় সুবীরের গলার শ্বাসনালী দু টুকরো হতে থাকে বারবার। কাজল প্র্যাকটিস করে।

চমৎকার। খুব ভাল হাত হয়েছে কাজলের। ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। শিল্পীর হাত। নিপুন, স্বচ্ছন্দ। বোল্‌ড্ স্ট্রোক্।

এইবার কাজ। অ্যাকশন। তপন চাকলাদার। পাশের এলাকা। কী অপরাধ? সুবীরদের পার্টির ছেলে। আমাদেরও ওরা খুন করে। আর কোনো প্রশ্ন নয়। সৈনিক, আদেশ মান্য কর। লোকাল বন্ধুরা সাহায্য করবে। আগে গিয়ে দেখে এসো যায়গাটা, পালাবার রাস্তাটা।

একটি কোপ। তপন ছিটকে গেল। কাজল পাগলের মতো ঝাপিয়ে পড়ল

ছোরাটা ঢুকিয়ে টেনে দেবে। মৃত্যুকে নিশ্চিত কর। এই প্রথম কাজ। সফল হও। নাহলে পার্টিতে মুখ দেখাবে কী করে! নেতারা কী বলবেন! সুবীরের পার্টি আমাদের ছেলেকে খুন করেছে, ওদের ঘৃণা কর। নার্ভ ঠিক রাখো। নাড়ীভুঁড়ি উপছে উঠছে রক্ত। ভাল্‌নারেব্‌ল্ যায়গা বেছে নাও। এত রক্ত দেখে ঘাবড়িয়ো না। মানুষের দেহে অনেক রক্ত।

সফল। আঃ! একটা সুখ। বা স্বস্তি। ব্যর্থ হয় নি সে। পার্টির গৌরব। বরং এতটা গৌরব যেন প্রাপ্য নয়। মৃত্যুটা এত সহজ। বাধা নেই। নিরস্ত্রের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ। চোরাগোপ্তা। একটা ঘেন্নার দিক আছে। আতঙ্ক ও আঘাতে তপনের রক্তমাখা মুখের কাতরানি ও গোঙানি, তার ওপরে চালাও ছোরা। তবে সুবীরদের পার্টির ওপর প্রতিশোধ নিতে হবে, সুতরাং ছোটখাটো এসব বিরক্তি গায়ে মাখতে নেই। আর একটা কথা কাজলকে পীড়িত করল। শারীরিক যন্ত্রণা ছাড়াও একটা লাঞ্ছনা আরোপ করেছে সে তপনের ওপরে। আমার গায়ে জোর বেশি বলেই কি আমি একজনকে জুতো মারতে পারি। আর ছোরা? কোনো খুদে দোকানদারকেও সে চড়া গলায় কথা বলে না, পাছে অসম্মান হয়।

'কাজল, কয়েক দিন গা ঢাকা দাও।'

অতএব গুপ্ত নিবাস। বিশ্রী। বড়ো একা। বিরক্তিকর। বই নেই, বন্ধু নেই, একটা সিনেমা দেখার উপায় নেই। যেন সে বন্দী। একা থাকলেই নানা চিন্তা। প্রথম হাঁটা, প্রথম কথা, মেয়েদের প্রথম শাড়ি, প্রথম যৌন উত্তেজনা। আরো একটা আছে, প্রথম খুন। জনগণের স্বার্থে, বিপ্লবের স্বার্থে কাজল তার প্রথম খুন করেছে। খুনও কত মহৎ, কত পবিত্র।

তপনের খুনের স্লো-মোশান ছবি। কাজল অনেক কিছু মনে করতে পারে না। পুরনো প্রিণ্ট যেন। কতগুলো ঝাপসা লালচে ছবি। তপনের চোখে আতঙ্ক। ছোরার ব্যূহের মধ্যে সে। ছোরাগুলো ছুটে যাচ্ছে তীরের মতো।

একা, তাই এই চলচ্ছবি বারবার দেখতে হয়। কাঁহাতক আর এক জিনিস দেখা যায়। কিন্তু ছবি তাকে ছাড়তে চায় না। একঘেয়ে ছবি। হাত থেকে দাগ ধুয়ে গেছে, চোখ থেকে দৃশ্য সরে গেছে, কিন্তু মনে ছবিটা লেপ্টে আছে। নতুন ছবি চাই। বাড়ি ফিরলে মা-র সঙ্গে দেখা হতো। একটু মুক্ত থাকলে দেখা করা যেত উত্তরার সঙ্গে। হয়তো ওকে নিয়ে একটা সিনেমায় যাওয়া যেত। কতদিন যে সিনেমা দেখা হয় না। দূর

শালা, কাল আমি একাই একটা সিনেমা দেখব—নটার শোয়ে।

কাজল, তোমার দ্বিতীয় খুনের নির্দেশ এসেছে। কাজল, তুমি জরুরি স্কোয়াডের লোক, লৌহ-স্নায়ুর লোক, বিপ্লবের অগ্রদূত, মনকে নরম কোরো না।

দ্বিতীয় খুন

একটা কিছু করতে পেরে কাজল বেঁচে গেল। বন্দী একঘেয়েমির বদলে উত্তেজনা। মা আর উত্তরাকে মাথা থেকে একটু সরিয়ে রাখা যাক। ওরা তেমন কিছু করে না, কিন্তু কীরকম এক উদ্ভট বাধা।

তপন ছিল ছাত্র। করুণাময় সুতাকলের শ্রমিক। এদের খুন করে বিপ্লবের কী উপকার করতে হবে কে জানে! যাকগে, এসব ভাবা সৈনিকের কাজ নয়। সে অ্যাক্‌শনের পুরোধা। আর ওরা অন্য পার্টি। শত্রু পার্টি।

করুণাময় মধ্যেখানে। চার দিক থেকে ছোরা। থোরা মাংস। কিন্তু ছোরার ঘা খেয়ে লোকটা বিশ্রী আর্তনাদ করতে লাগল: 'আমায় মারছ কেন? আমি কী করেছি? আমার বৌ-ছেলে আছে, বুড়ি মা আছে, তারা না খেয়ে—'

বিশ্রী অসহ্য আর্তনাদটা সত্যি কাজলের নার্ভে ঘা দেয়। শ্বাসনালী ভাল্‌নারেবল যায়গা। আরে বৌ-ছেলে-মা তো সবারই আছে। তা বলে কি বিপ্লব বন্ধ হয়ে থাকবে। কাজলেরও তো আছে। বৌ-ছেলে নয়। মা।

এবার কাজল বন্দীদশাটা খানিকটা না ভেঙে পারল না। কয়েকদিন বাড়িতে গেল। মাকে সে কিছুই বলে নি। কিন্তু বেশ বোঝা যায়, মা প্রায় সবই জানেন। মাকে একটু জড়িয়ে ধরতে কাজলের ভাল লাগল। বিধবা মা প্রসাধন ব্যবহার করেন না, কিন্তু তাঁর দেহে একটা সুগন্ধ আছে, যাকে কাজল মনে করে পরিচ্ছন্নতার গন্ধ। মা খুব পরিষ্কার স্বভাবের লোক—দেহে বা পোষাকে এক কণা নোংরাও সহ্য করতে পারেন না। ফুসফুস ভরে নিঃশ্বাস নিল কাজল। রক্ত আর গুপ্তনিবাসের গন্ধ বেরিয়ে গেল। এত ধপধপে মা-র কাপড় যে হাতে রক্ত থাকলে বড্‌ডো নোংরা হয়ে যেত। আর কাপড়ের ওপর দিয়েই কাজল অনুভব করতে লাগল মা-র ভাল্‌নারেব্‌ল্‌ যায়গাগুলো। তার বাহুর মধ্যে মা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। যেন কান্না চাপার চেষ্টা।

কথাবার্তা কম। কাজল শুরু করেছিল। কিন্তু আটকে আটকে যায়। আগে সহজ ছিল সব। কিছুদিন থেকেই সে ভাবটা কমে এসেছিল। এখন

খুবই আড়ষ্ট। কাজল বলতেই চায়—সব। কিন্তু—। মা বহুদিন পরে ছেলেকে পেয়ে উদ্বেল, তবে মসৃণ তরী অদৃশ্য জলমগ্ন চড়ায় ঠেকে যাচ্ছে।

'মা, গোটা কত টাকা দেবে?

মা বিনা প্রশ্নে টাকা দিলেন। উনি জানতেন, ও উত্তরার সঙ্গে দেখা করতে যাবে।

উত্তরা অবশ্য কাজলকে একটা পয়সাও খরচ করতে দিল না। বলল, 'রাখো ওগুলো তোমার দরকারে লাগবে।'

উত্তরা আগে পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিল। এখন প্রায় বসে গেছে। কাজলের মতের সঙ্গেও তার কিছু পার্থক্য আছে। দেখা হলে সাধারণত এই নিয়ে তর্ক হয়। আজ উত্তরা সে দিক দিয়েও গেল না। বড় খুশি লাগছে তার। আজ সে কিছুতেই এই খুশিতে টোল পড়তে দেবে না।

সিনেমা-হলে পাশাপাশি বসে উত্তরার কাপড়ের গন্ধ পাচ্ছিল কাজল। নতুন তাঁতের-কাপড়ের গন্ধ। ওর চুলের হাল্কা গন্ধের সঙ্গে মিশেছে। কাজলের বুক ভরে হঠাৎ একটা কথা মনে হলো—জীবন সুন্দর। কিন্তু উত্তরাকে সব কথা না বলতে পারলে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। উত্তরা ও মাকে বলতে পারি না কেন? অন্যায়বোধের জন্যে? না এতে কোনো অন্যায় নেই। উত্তরা ও মাকে যা বলতে বাধে তাতে নিশ্চয়ই কোনো অন্যায় আছে। না, আমি বলি না গোপনতা রক্ষার জন্যে। কিন্তু আমার ক্ষতি করে ওরা দুজন কি গোপনীয়কে প্রকাশ করে দেবে?

উত্তরা মাথাটা রেখেছে কাজলের কাঁধে আর ফিসফিস করে আউড়ে যাচ্ছে: 'অভি, আমার অভিমন্যু।' মহাভারতীয় দৃষ্টান্তে উত্তরা এই নাম বহু দিন আগেই কাজলকে দিয়েছে।

কাজল, কমরেড কাজল, তোমার-তোমার তৃতীয় খুনের নির্দেশ এসেছে। হারি আপ।

তৃতীয় খুন

ছেলেটার নাম জানে না কাজল। লোকাল বন্ধুরা দেখিয়ে দিল। ছেলেটার ওপর ছুরি বিশেষ চালাতে হয় নি। মণি পেছন থেকে এত জোরে লোহার রড হাঁকড়েছিল যে ছেলেটার ঘিলু বেরিয়ে পড়েছিল। আঁতকে উঠে যেন ছেলেটার দম বন্ধ হয়ে গেল। তবু কাজল তার পেটে দু'বার ছুরি

চালাল কারণ, শত্রুর মৃত্যুকে নিশ্চিত করে ফেলবার কথা।

'কাজল, সাবধান। পুলিশের লোক। বেরিও না একদম।'

বন্দী। চোখের ওপর নাম-না-জানা ছেলেটার ফাটা ঘিলু, মা-র ধীর গম্ভীর মুখ, উত্তরার কত ভঙ্গি। নেই বন্ধু, বই, আড্ডা, সিনেমা। চোখ মেলে অনেক দূরে তাকানো নেই। গলা ছেড়ে বেসুরো গান নেই। নেই হাসি, খুনসুটি। শিশু নেই, আকাশ নেই। কিন্তু তপনের রক্তমাখা দেহটা এখনও আছে, আছে করুণাময়ের প্রশ্নটা : 'আমায় কেন মারছ ?'

সত্যি মেরে কতটা উপকার হচ্ছে ? অবশ্য এ চিন্তা উচ্চ নেতৃত্বের কাজ। কিন্তু হয়তো সব কিছুই কাজলের এখন হাতের বাহিরে। এখন মারো, নয়তো মরো। বাঁচবার জন্যে এখন মেরে যেতে হবে। তবে এই ভাবে একদিন বিপ্লবের দরজায় পৌছবে।

কিন্তু সত্যি কি পৌছবে ? জীবনের সর্বত্র আপোষ, জোচ্চুরি, সুবিধাবাদ। আর হঠাৎ দুটো খুন ক'রেই বিপ্লব ? একবার কাজল বারোটা জাল ভোট দেওয়ায় তার ইজ্জত বেড়ে গিয়েছিল। যখন সে গলা ফুলিয়ে মা-র কাছে কথাটা বলল, মা-র মুখটা দুঃখে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল। মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে মুসলমান ক্যাণ্ডিডেট্ দিয়ে সাম্প্রদায়িকতা বাঁচিয়ে রাখব। সাধারণের রাস্তায় শনির প্রকোপের বিরুদ্ধে মুখ খুলব না। বহু নেতা ও সহকর্মীর বাড়িতে গিয়ে সে দেখেছে, অন্দরে মেয়েদের অবস্থা সামন্তযুগীয় বা দাসযুগীয়। এ সবই মাথার ওপরে পুরো বহাল থাকবে, আর দুটো খুন করে তলা দিয়ে সুড়ুক করে গলে চলে যাব স্বর্গভূমিতে—শর্ট্কাট্। খুন তো কম হলো না, বিপ্লব কতটা এগোলো ? পার্টির লোকরাই বা কতটা নিঃস্বার্থ ও নির্লোভ হলো ?

হঠাৎ একদিন গুপ্তবাসের কয়েদ থেকে রাতে বাড়ি এসে হাজির। মা বললেন, 'আয়।'

খাওয়া-দাওয়া হলো। কিন্তু কথাগুলো যেন দাঁড়াবার জমি পাচ্ছে না। আগে কথার অভাব হতো না। মা শিক্ষিত পরিবারের মেয়ে। বুদ্ধিমতী। অধ্যাপিকা। বাইরের জগতের খবর রাখেন।

'শুয়ে পড়। রাতে তোর বোধহয় ভাল ঘুম হয় না। তোর চোখে কালি পড়েছে।' মা ফর্সা চাদর সমান করে বললেন।

কাজল শুয়ে পড়ল। মা একটু দাঁড়ালেন। দরজার দিকে পা বাড়িয়েও এসে বসলেন তার মাথার কাছে। ঘন ঘন কয়েকবার তার রুক্ষ চুলের ভেতরে আঙুল

চালিয়ে বললেন, 'খোকা, তোর ফাদার রবার্ট্সন্‌কে মনে আছে?'

'ইংরেজীর প্রোফেসর—আমাদের কলেজের? বুড়ো?'

'হ্যাঁ। আমাদের সময় বয়স কম ছিল। ওঁর কাছে একটা গল্প শুনেছিলাম।'

রবার্টসনের গল্প : একদিন ঈশ্বরপুত্র রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, মধ্যেখানে একটি মেয়েকে ফেলে চারদিক থেকে লোকে পাথর ছুঁড়ে মারছে। সারা দেহে মেয়েটির রক্ত। এখুনি মারা যাবে। প্রভুপুত্র তাদের থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' তারা বললে, 'মেয়েটি ব্যভিচারিণী। তাই তাকে পাথর মেরে হত্যা করব।' ঐ দেশে তখন ঐ নিয়ম ছিল। প্রভুপুত্র বললেন, 'হ্যাঁ, ও যখন অন্যায় করেছে, তখন শাস্তি ওর প্রাপ্য। তবে প্রথম পাথরটা তার হাত থেকে আসুক, যে মনে ও কর্মে কোনোদিন কোনো ভুল বা পাপ করেনি, সে মারবার পরে বাকী সবাই ওকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেলো।' দেখা গেল, সবার উদ্যত হাত আস্তে আস্তে নেমে গেল। প্রথম পাথরটি কেউ মারতে পারল না।

কাজল বলল, 'এ গল্প আমিও শুনেছি। আজ এটা আমায় বলছ কেন?'

'কেন বলছি তা তুই জানিস।'

চতুর্থ খুন

কাগজের রিপোর্ট : উক্ত অঞ্চলের তিন মাথার মোড়ে কয়েকটি বোমা ফাটে, এবং দেবকুমার নামে এক তরুণ নিহত হয়। তার দেহে ছুরিকাঘাতের অগণ্য চিহ্ন ছিল। এখনও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করেনি।

গুপ্তবাসে ফিরেই কাজলের প্রথম মনে পড়ল রবার্টসন ও মা-র মুখ। রবার্টসন, সাদা দাড়ি, আস্তে কথা বলেন, ঈষৎ বিষণ্ণ, মুখে হাসি। মার ওঁকে মনে হয়—পবিত্র। আসলে নিজের কলেজ সম্পর্কে মা-র খুব মমতা—আজও। 'চিন্তায় কর্মে যে কোনো অন্যায় করেনি সে মারুক প্রথম পাথর।' মা। বিষণ্ণ। গম্ভীর। বুদ্ধিতীক্ষ্ণ অনুভূতিময় চোখ। এই চোখ সে অনেক চুমু খেয়েছে। মা : 'খোকা, ফিরে আয়। আমি জানি, প্রথম পাথর মারার অধিকার তোর নেই।' প্রাণ নেওয়ার কী অধিকার তোর আছে? যা দিতে পারিস না, তা-কি নিতে পারিস? অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—দুজনেই অপরাধী। কিন্তু শাসন করা তারেই সাজে সোহাগ কর যারে।'

মা, তুমি আমার কব্জির জোর কমিয়ে দিচ্ছ কিন্তু তুমি আমায় থামাতে পারবে না। মহৎ আদর্শ আমার। সবাইকে আমি ত্যাগ করব। তোমাকেও।

গভীর রাত্রিতে যখন কোনো দিকে চোখ চলে না, তখন কাজল মনের অতলে ডুবুরী হয়ে জল-পাঁক ঘুলিয়ে তুলল। কোথায় তার পাপ, কী অন্যায় সে করেছে সারা জীবনে। অতলে যখন তার হাত দুটো ক্লান্ত, তখন মনে হলো এ-হাত তার নয়, পার্টির। না, নেতার।

কাজল, কমরেড কাজল, তোমার সব কিছুই পার্টির।

'খোকা, তুই যন্ত্র নোস্, মানুষ। যার হাত দিয়ে ঘটনাটা ঘটে, সে দায়িত্ব এড়াতে পারে না। তোর বন্ধু হরেন যখন পার্টি ফাণ্ড ভেঙেছিল, তখন তাকে খারাপ ব্যক্তি হিসেবে ধরে পার্টি তাকে অস্বীকার করেছিল। ভাল কাজ করলে পার্টি গৌরবটুকু আত্মসাৎ করত।'

হ্যাঁ, মা, টাকা ভাঙার কথায় অন্য কথাও মনে পড়ছে। আমাদের চালিত অনেক ইউনিয়নের কথা জানি, সেখানে ঘুস না দিয়ে অফিস থেকে কোনো কাজ বার করা যায় না। পার্টি এখনও তাদের মাথায় করে রেখেছে।

'খোকা তোর হাত যদি পার্টির হাত, তাহলে ঘুসের কলঙ্ক তোকেও লেগেছে। খোকা, আমায় যখন জড়িয়ে ধরবি, ঐ হাতে ধরবি তো? উত্তরাকে আদর করবি ঐ হাতে? তোদের যখন ছেলেমেয়ে হবে তাদের কোলে নিবি ঐ হাতে?'

কমরেড কাজল—

হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত।

পঞ্চম খুন

অনিল ছেলেটা কাজলের ভীষণ চেনা। একসঙ্গে পার্টি করেছে। এখন ভিন্ন মত। অনিলের ওপর পাঁচ ঘণ্টা শারীরিক অত্যাচার চালানো হয়েছে। বিশ্রী লাগছিল কাজলের। পাঁচটা ঘণ্টা—

কমরেড কাজল, নার্ভ ঠিক রাখো, জরুরি স্কোয়াডের লোক।

অনিল ছেলেটা টস্‌কায় নি। কঠিন। অনমনীয়। রক্তমাখা চোখে কাজলকে দেখল অনিল। ছেঁড়া, কাটা, ভাঙা, হাত-বাঁধা অনিলকে দেখে নরম হচ্ছিল কাজলের মন। কিন্তু বাগে পেলে অনিলও তাকে খুন করত। সুতরাং—

গুপ্তবাস থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কাজল উত্তরার কাছে: 'মা-র কাছে গেলেই সেন্টিমেণ্টাল রাবিশ শুনতে হয়। পোলিটিক্যালি ডিফার কর তুমি জানি। কী বলতে চাও, বল।'

অভি, আমার অভিমন্যু, একটু ঠাণ্ডা হও। কত দিন তোমাকে দেখি না। তুমি রোগা হয়ে গেছ। চোখটা এত ঘোলাটে কেন, অভি! তোমার চোখে তো স্বর্যের আলো ঠিকরোয়। ঐ চোখ আমায় যখন দেখত, তখন আমার শরীর শিরশির করে উঠত। মনে হতো, তুমি আমায় ধীরে, খুব ধীরে আদর করছ।

উত্তরার মত: 'মিনিমাম্ রক্তপাত চাই বিপ্লবের জন্যে। সাধারণ দরিদ্র লোক এত বেশি যে শ্রেণীশত্রুকে কাবু করা শক্ত নয়। কিন্তু সাধারণ লোককে আমরা এক করতে পারি নি, তাই আমরা দুর্বল, ভীত, আর সেই আতঙ্ক থেকে আমরা হত্যা করছি তাদেরই যারা আমাদের। অন্য মতকে শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করতে হবে। ফ্রান্সে পলিট ব্যুরোয় মতপার্থক্য হলে দুটো মতই ছাপিয়ে দেওয়া হয় আলোচনার জন্য। আমি সংগঠনের মধ্যে থাকব, কিন্তু ম্যাক্সিমাম্ স্বাধীন চিন্তা নিয়ে থাকব।'

কমরেড কাজল—

ষষ্ঠ খুন

কী নাম, কেমন চেহারা, ভাল করে দেখতেও ইচ্ছে করল না কাজলের। সব এক। পেড়ে ফ্যালো মধ্যেখানে। চার দিক থেকে এক সঙ্গে কোপাও। আতঙ্কিত চোখ। ছটফটানি। গোঙানি। রক্ত। খোবলানো দেহ। ছেঁড়া জামা-কাপড়। লাল। একতাল মাংস। ধুলো-কাদা-মাখা। সব এক।

অবশ্য আলাদাও। ভিন্ন নাম। ভিন্ন ভঙ্গি। চোখের ভাষা আলাদা। পোষাক আলাদা। ঠেকাবার চেষ্টা নানা রকম। পৃথক মানুষ, পৃথক জীবন। জগৎ ভিন্ন, অনুভূতি ভিন্ন। আলাদা মা, ভাই, বোন, বৌ, সন্তান। আলাদা ঘরে হাহাকার।

খোকা, প্রথম পাথরটা···। কী অধিকার তোর! যাকে মারলি তার চেয়ে তুই কীসে ভাল?···মিনিমাম্ ব্লাডশেড্। এক নই আমরা। ম্যাক্সিমাম্ স্বাধীনতা।···যা দিতে পারিস না তা কি নিতে পারিস?··অভি, আমার অভিমন্যু।···

কমরেড কাজল—

সপ্তম খুন

'মা, সাত নম্বর খুনটা আমি করব না।'

'খুব ভাল, বাবা।'

'পার্টিকে বলতে যাচ্ছি—প্রথম পাথরটা তোলার মত কব্‌জির জোর আমার নেই।'

'ওরা তোর কোনো ক্ষতি করবে না তো?'

'তা করতে পারে।'

'কী, কী করবে? চুপ করে থাকিস না, বল। খুন করবে?'

'করতে পারে।'

'তোর নিজের পার্টির লোক! কেন? কেন?'

'আমি ছ'টা খুনের সব কথা ফাঁস করে দিতে পারি। আমি তা প্রাণ গেলেও করব না। কিন্তু—'

'পালিয়ে যা, খোকা।'

'পাড়ার মোড়ে মোড়ে লোক রাখা আছে।'

'গা ঢাকা দিয়ে—'

'পালিয়ে যাওয়া মানে পালিয়ে বেড়ানো। এক গুপ্তবাস থেকে আর এক গুপ্তবাস। এক অন্ধকার থেকে আরো ঘন এক অন্ধকার। বল কী চাও তুমি? সাত নম্বর খুনটা করব?'

'না, না।'

'তাহলে আর একটাই পথ। পার্টিতে গিয়ে বলতে হবে।'

'না, না।'

'সাধারণ মানুষের ভাল হবে ভেবে আমি সব কাজ করেছি—খুনও। আজ তাদের স্বার্থেই পার্টিকে একথা আমার জানাতে হবে—ফল যাই হোক।'

'খোকা, উত্তরা এসেছে। দাঁড়া ওকে পাঠিয়ে দিই।'

কুরুক্ষেত্রে রণাঙ্গন। মধ্যেখানে তরুণ অভিমন্যু। তাকে ঘিরে ধরেছে সপ্তরথী। তীরের পর তীর। অসংখ্য তীক্ষ্ণ তুলি। সর্বাঙ্গে রক্তক্ষত। ভাল্‌নারেবল্‌ পয়েন্ট্‌স্‌। পালাও অভিমন্যু, পালাও। না, পিঠে তীর বিঁধে কোনো ক্ষত্রিয় রণাঙ্গন ত্যাগ করতে পারে না। কুলধর্মে মানা। সপ্তরথীবেষ্টিত অভিমন্যু যুদ্ধ করে। মধ্যে পেড়ে ফেলে তীর দিয়ে কোপায় রথীরা। রক্তস্নাত অভিমন্যু যুদ্ধ করে। রথীরা মৃত্যুকে নিশ্চিত করে। যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন অভিমন্যু যুদ্ধ করে। তীরের শাণিত ফলকে এফোঁড় ওফোঁড়। আসন্ন মৃত্যু অভিমন্যু ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে। সুভদ্রা, তুমি কাঁদো, অভিমন্যু যুদ্ধ করে। উত্তরা, তুমি নিঃস্ব হও, অভিমন্যু যুদ্ধ করে। অন্যায় সমরের ব্যূহে বন্দী অভিমন্যু। অন্যায়? সমরে নাকি

কিছু অন্যায় নয়! ন্যায়ের জন্য অভিমন্যু যুদ্ধ করে। অভিমন্যু নিহত। সব তীর বুকে। পিঠে বেঁধে নি একটাও। নিহত অভিমন্যু যুদ্ধ করে।

উত্তরা এসে দাঁড়িয়েছে।

'কেঁদো না, উত্তরা। আমার কাছে এসো এই যে আজ তোমায় বুকে নিয়েছি চুমু খাচ্ছি, আমার খুব ভাল লাগছে। এতদিন নিজেকে বড় নোংরা মনে হতো। কেঁদো না, উত্তরা। আমায় পার্টিতে গিয়ে বলতে হবে কথাটা। আমার পার্টির হয়তো অন্যদের পার্টিরও, তরুণ ছেলেরা এখনও ঘাটে-মাঠে। তাদের ফেরাতে হবে। আমি ফিরতে পারি না। উত্তরা, আমি ঢোকার পথ জানি, আমি তো বেরোবার পথ জানি না। আমায় তাই লড়াই করতে করতে যেতে হবে, তাতে যতদূর যেতে পারি। মা, এ ঘরে এসো। তোমায় একটু প্রণাম করি। চলি। কেঁদো না মা। আমায় যখন ওরা সাত দিক থেকে ছোরা হাতে ঘিরে ধরবে, তখন আমি বলব,—কমরেড্, প্রথম ছোরাটা সে মারো যার হাতে কোনো ময়লা নেই। কিন্তু ওরা কি সে কথা মানবে? সমরে নাকি অন্যায় নেই। জোরটাই বড় কথা। কিন্তু আমি তো সমরে ন্যায়-অন্যায় মানি। ন্যায়ের পক্ষে আছি এ কথা না জানলে ছ'টা খুন আমি করতে পারতাম না, মা।'

দুই নারীর দু'জোড়া চোখের মধ্য দিয়ে কাজল লম্বা পা ফেলল।

মুক্তিপথিক রজনী পাম দত্ত

দিলীপ বসু

১৯৪৬ সালের মে-দিবস। ময়দানে অল-ইণ্ডিয়া ট্রেড্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের বেশ বড়ো জনসভা। ওদিকে কাল বৈশাখীর কালো মেঘ আকাশে জমা হচ্ছে।.

মে-দিবসের এই শ্রমিক জনসভায় লম্বা, ঋজু, এক মাথা ভর্তি কাঁচা পাকা চুল, চোখ দুটি বুদ্ধির দীপ্তিতে জলজল করছে, সুদর্শন, একজন ইংরাজ বক্তৃতা করছিলেন। কণ্ঠস্বরটি গম্ভীর, বক্তব্য পরিষ্কার, তিনি বলছিলেন যে-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালাচ্ছে। সেই সাম্রাজ্যবাদের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই কি ভাবে ব্রিটিশ শ্রমিক শ্রেণীকে শোষণ করে এবং তাদের দালাল দক্ষিণপন্থী লেবার পার্টির নেতৃত্বের সাহায্যে ব্রিটেনে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামকে দুর্বল করে রাখে। আর ব্রিটেনের লেবার পার্টি যে ভারতের ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণযন্ত্রেরও অনেক সময় ধারক ও বাহক হয়ে ওঠে, তার উদাহরণ দেখতে পাই, আমরা ১৯৩০-৩১-এ 'শ্রমিক নেতা' ম্যাকডোনাল্ডের সরকারের দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দমনে।

এই সুদর্শন ইংরাজটিই আমাদের সুপরিচিত কমরেড রজনী পাম দত্ত। তাঁর পিতা উপেন্দ্র কৃষ্ণ দত্ত বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবিদ রমেশচন্দ্র দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র। উপেন্দ্রকৃষ্ণের জন্ম ১৮৫৮ সালে; কুড়ি বছর বয়সে তিনি ইংলণ্ডে যান ডাক্তারি পড়তে। পড়া সাঙ্গ করে সুইডেনের এক মহিলাকে বিবাহ করে কেম্ব্রিজে প্র্যাকটিস্ সুরু করেন—এক কন্যার পরে দুই ছেলে, বড়ো ক্লেমেনস, ছোট রজনী, পাম্ নামের মাঝের উপাধিটা মার কাছে থেকে পাওয়া। প্রসঙ্গত, আজকের সুইডেনের প্রধান মন্ত্রীর পদবিও পাম্—কমরেড্ দত্তের মামার বাড়ির বংশ।

উপেন্দ্রকৃষ্ণের ছোট ভাই অনিলকৃষ্ণ দত্তের বাড়িতে শুনেছি, রজনী পাম্ দত্ত রাতে জন্মেছিলেন বলে কলকাতার আত্মীয় স্বজনের অনুরোধে পিতা উপেন্দ্রকৃষ্ণ তাঁর নামকরণ করেন 'রজনী'।

কেম্ব্রিজের দত্ত বাড়িতে পড়াশুনার আবহাওয়া ছিল যথেষ্ট, আর সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিনচন্দ্র পাল, দাদাভাই নৌরোজির মতন তখনকার দিনের প্রখ্যাত

ভারতীয় নেতারা আড্ডা জমাতেন সে বাড়িতে। তর্ক জমে উঠত তখনকার মডারেট (বা নরমপন্থী) ও একস্ট্রিমিস্টদের (চরমপন্থী) মধ্যে। কমরেড রজনী পাম দত্তের মুখে শুনেছি যে, ১৯০৬-০৭ সালে তাঁর দশ বছর বয়সে সেই প্রথম 'রাজনৈতিক' সভাতে যোগদানের (অবশ্যই শ্রোতা হিসাবে) সুযোগ তাঁকে উত্তর জীবনে রাজনৈতিক কাজকর্মে দীক্ষিত হবার পথ পরিষ্কার করে দেয়। সেই দশ বছর বয়সেই তিনি ব্রিটেনে প্রথম 'উদারনৈতিক' (লিবারেল) গভর্ণমেণ্টের গঠনে যে চিঠি দৈনিকপত্রে লেখেন তা' সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

যাই হোক, মেধাবী ছাত্রটি স্কুল থেকে স্কলারশিপ পেয়ে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হবার পূর্বেই ১৯১৫-তে প্রথম মহাযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য গ্রেপ্তার হয়ে একবছর কারাজীবন যাপন করলেন। বিশেষ কৃতী ছাত্র, বয়েস মাত্র ১৯, পরের বছর তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো অক্‌সফোর্ডে পড়তে। কিন্তু এক বছর পড়তে না পড়তেই, ১৯১৭-তে আসন্ন রুশ অক্‌টোবর বিপ্লবের সম্ভাবনাকে স্বাগত জানিয়ে সভা করার অপরাধে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত হলেন। উত্তর জীবনে রুশ বিপ্লবের ৪০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় যখন তাঁকে অনারারী ডক্টরেট প্রদান করে, তখন তাঁর বক্তৃতাতে সে কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

অক্‌সফোর্ড তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করলেও পরের বছর পরীক্ষা দিতে অনুমতি দিয়েছিল। কর্তৃপক্ষ তাঁকে তিনটি শর্ত দেন (ক) পরীক্ষার দিনই অক্‌স্‌ফোর্ড পৌছতে হবে, (খ) পরীক্ষা শেষ হলেই অক্‌স্‌ফোর্ড ত্যাগ করতে হবে, এবং (গ) পরীক্ষা চলাকালীন অক্‌স্‌ফোর্ডে যেহেতু বাস করতেই হবে, সে সময়ে কোনো জনসভাতে বক্তৃতা করা বা যোগ দেওয়া চলবে না। পরীক্ষার ফল বেরলে দেখা গেল, অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাসিক্‌সে (গ্রীক, লাতিন) তিনি সব কটি পেপারেই ফার্স্ট ক্লাস অনারস্‌ পেয়েছেন। আমাদের দেশের এক শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন ক্লাসিকসে অকসফোর্ডের ফার্স্ট ক্লাস্‌ স্কলার।

এইরকম কৃতি ছাত্রের কিন্তু কোনো অধ্যাপনার কাজ জুটল না, কারণ তাঁর বিপ্লবী মতবাদ। মনে রাখতে হবে, ১৯১৮-এর জগতে রুশ বিপ্লবের ঠিক এক বছর পরেই কমিউনিস্টদের সম্পর্কে শ্রেণীবিদ্বেষী মনোভাব ও পীড়ন আজকের থেকে বৃটেনে অনেক বেশি তীব্র ছিল। বুর্জোয়া অপপ্রচারের নানা রকম যন্ত্রের বিরামহীন চেষ্টা ও রুশ বিপ্লবের ঘটনাবলী সম্পর্কে সঠিক কিছু না

জানায়, তথা লেনিনের লেখা তো বটেই, এমন কি মার্কস-এঙ্গেলসের লেখার সঙ্গেও যথেষ্ট পরিচিতি, বিশেষ করে ইংরাজীতে, না থাকাতে কমিউনিস্ট মতাদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট ভ্রান্ত এবং আজগুবি ধারণা তখন চালু ছিল। যেমন কমিউনিস্টরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি স্বীকার করে না, অতএব তারা স্বামী-স্ত্রী বা পিতাপুত্রের সম্পর্ক মানে না। মার্কস অবশ্য ১৮৪৮-এই 'কমিউনিস্ট ইস্‌তেহার'-এ জবাব দিয়েছিলেন যে, আমরা কমিউনিস্টরা নয়, তোমরা বুর্জোয়ারাই ব্যক্তিগত পারিবারিক সম্পর্ক উচ্ছেদ করতে চলেছ।

যাই হোক, রজনী পাম্‌ দত্তের এই সময়ে একটা সাধারণ স্কুলে চাকরী জোটে, থাকতে হতো স্কুলেরই ডরমিটরি বা হোস্টেলে।

ইতিমধ্যে তিনি রাজনীতিক্ষেত্রে 'ইন্‌ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির' (I L P) সঙ্গে যুক্ত থেকে ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন।

কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা—

প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর ব্রিটেনের জঙ্গী সোশ্যালিস্টদের (এঁরা সমাজতন্ত্র মতবাদ হিসাবে গ্রহণ করলেও, কি করে সেটা হাসিল করতে হবে, শ্রেণী সংগ্রাম কোন্‌ পথে চালিত হবে, ব্রিটেনের লেবার পার্টির সঙ্গে কি সম্পর্ক হবে ইত্যাদি প্রশ্নে, তথা কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা আংশিক ভাবে বুঝতেন)। সামনে একটাই প্রধান কাজ ছিল—একটি কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা। অথচ সাম্রাজ্যবাদ ও বিরাট ঔপনিবেশিক শাসনের কেন্দ্র খোদ ব্রিটেনে মার্কসবাদের সঠিক প্রয়োগ করে লেনিনবাদী ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলা সহজ কাজ নয়। সমস্যা দুটি—একদিকে কমিউনিস্ট পার্টিকে যথার্থ শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি হতে হলে তাকে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলন, তথা সংস্কারপন্থী লেবার পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হবে। এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের গোটাকতক দিক মেনে নিয়ে কাজ করতে হবে। তা' না হলে সঙ্কীর্ণতাবাদে আচ্ছন্ন হয়ে যাবার ষোলআনা সম্ভাবনা এবং লেনিন এই সঙ্কীর্ণতাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর 'বামপন্থী কমিউনিজম—শিশুসুলভ রোগ' (১৯২০) লিখেছিলেন। অন্যদিকে ঠিক একই ভাবে আবার সংস্কারবাদী সংশোধনবাদী মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যাবার ভয় থাকে।

পুরো দুটি বছর নানারকম আলাপ আলোচনার মাধ্যমে শেষ অবধি ১৯২০ সালের ৩১শে জুলাই ও ১-লা আগস্টে কমিউনিস্ট পার্টি গড়বার 'ঐক্য

কনভেনশন’ ডাকা হলো। ২১১ জন প্রতিনিধির প্রতিনিধিপত্র নিয়ে ১৬০ জন প্রতিনিধি এই কনভেনশনে যোগ দেন। তার মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিনিধিরা, ‘কমিউনিস্ট’ ঐক্য গ্রুপরা, শপ্ স্টুয়ার্ড প্রতিনিধিরা, গিল্ড কমিউনিস্টরা। ইন্‌ডিপেনডেণ্ট লেবার পার্টির বামপন্থী অংশ থেকে যোগ দিয়েছিলেন, আমাদের কমরেড রজনী পাম দত্ত ও ভারতের সাপুরজী সাকলাতয়ালা, যিনি পরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমিউনিস্ট সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হন।

এর পরে জানুয়ারি ২৯-৩০, ১৯২১ সালে পুনরায় লীড্‌স শহরে আর একটি কনভেনশন ডাকা হয়, এবং ১৯২১-২৩ এর মধ্যে পর পর তিনটি পার্টি কংগ্রেস ডাকা হয়। গোড়ার দুটিকে ‘ঐক্য কনভেনশন’ হিসাবে নিলে চতুর্থ পার্টি কংগ্রেসে (লণ্ডন মার্চ ১৮-১৯, ১৯২২) পার্টি সংগঠনের সমস্যাবলী সম্পর্কে খুঁটিয়ে অনুসন্ধান করে রিপোর্ট দাখিল করার জন্য, কার্যনির্বাহক সমিতির বাইরের কমরেড রজনী পাম দত্ত, কমরেড হ্যারি পলিট (যিনি ১৯৩১ সাল থেকে আমৃত্যু ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ছিলেন) ও তদানীন্তন সম্পাদক হ্যারি ইনকপিনকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়।

পঞ্চম পার্টি কংগ্রেসে (লণ্ডন, অকটোবর ৭-৮, ১৯২২) এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টিকে ঢেলে সাজানো হয়। কমিশনের রিপোর্ট সর্ববাদীসম্মত ভাবে গৃহীত হয় এবং কমরেড দত্ত ও পলিট সর্বাপেক্ষা বেশি ভোটে কার্যনির্বাহক সমিতিতে নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে ১৯২০ সালের কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের (কমিনটার্নের) দ্বিতীয় অধিবেশনের পরে শ্রীমতি সালম মুরিক ব্রিটেনে আসেন কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের সাহায্যার্থে এবং যাতে কিছু ব্রিটিশ প্রতিনিধি দ্বিতীয় কমিনটার্ণ কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে। কমরেড সালম্ ফিনল্যাণ্ডের মেয়ে, রাশিয়ার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে তরুণ বয়স থেকেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। কমরেড রজনীপাম দত্তের সঙ্গে উইলিয়াম গ্যালাকারের (যিনি ১৯৩৫ থেকে ১৯৫০ অবধি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন) মারফত কমরেড সালমের আলাপ দাঁড়ায় পরিণয় সূত্রে এবং ১৯২২ সালে তাঁরা বিবাহিত হন। কমরেড সালম্-দত্ত একাধারে কবি, সুলেখিকা ও ব্রিটেনের চার্টিস্ট আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ আছে। উত্তরজীবনে কমরেড সালমের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছিল; তখন তিনি হৃদরোগে

আক্রান্ত, তবে শয্যাগত অবস্থায় কমরেড রজনী পাম্ দত্তের যাবতীয় নথিপত্র এবং প্রেস কাটিংয়ের কাজ করতেন। স্বামী-স্ত্রী দুজনেরই ছিল উত্তর ইউরোপের সঙ্গে যোগাযোগ, দুজনেই ছয় ফুটের উপর লম্বা, আর কমরেড সালম্-দত্ত যে যুবতী বয়সে বিশেষ সুন্দরী ছিলেন, সেটা ১৯৫৩-তেও লেখকের চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি মারা গেছেন আজ কয়েক বছর এবং কমরেড রজনী পাম্ দত্ত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে স্ত্রীর লেখা কবিতার গুচ্ছ ছাপিয়েছেন। তাঁদের কোনো সন্তানাদি নেই, এবং হৃদরোগে আক্রান্তা স্ত্রীকে কমরেড রজনী দত্ত কতো যত্নে সেবা করতেন, সেটা দেখার সুযোগও তাঁর বাড়িতে চা-পানের আসরে লেখকের হয়েছিল।

লেবার মান্থলী

১৯২১ সালের জুলাই মাসে রজনী পাম দত্ত, কমরেড রবিন পেজ আরনট, দাদা ক্লেমেনস্ দত্ত প্রমুখের সহায়তায় 'লেবার মান্থলী' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। সম্প্রতি গত জুলাইয়ের 'লেবার মান্থলী'-র পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান লণ্ডনে হয়ে গেল। গত ৫০ বছরে এর পাতায় পাতায় যে কি বিচিত্র ও অতি মূল্যবান সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, তার সামান্য একটি তালিকা দিলেই এ প্রবন্ধে স্থানাভাব ঘটবে।

এই পত্রিকাতেই লেনিনের বহু লেখা প্রথম ইংরাজিতে প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে দুই সোভিয়েত লেখকের "মানবতা-বাদ" সম্পর্কে পত্রাঘাত এবং প্রত্যুত্তর চলে এবং সোভিয়েত দার্শনিক, এ্যাডোরাটস্কিকে মেনে নিতে হয় যে, রোলাঁর মানবতাবাদের সঙ্গেই তাঁর মতের মিল বেশি এবং সেটা তিনি ডায়ালেকটিক বস্তুবাদ ও তার বিচার পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ স্বীকার করার ভিত্তিতেই গ্রহণ করতে চান।

বার্নার্ড শ রজনী পাম দত্তকে বিশেষ স্নেহ করতেন এবং তাঁর মৃত্যুর পরে দত্তের বার্নার্ড শ'র সম্পর্কে লেখা নিশ্চয়ই একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয়। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সঙ্গে মতের অমিল খুব বেশি থাকলেও তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরের কার্যকলাপ (বিশেষ করে তাপ-পারমাণবিক অস্ত্র নিষিদ্ধকরণে, ১৯৬২-তে কিউবাতে ক্ষেপণাস্ত্রের ব্যাপারে এবং ভিয়েতনামে আমেরিকান বর্বরতার বিরুদ্ধে) সকল প্রগতিশীল শিবিরের তথা 'লেবার মান্থলী' পত্রিকার বিশেষ আকর্ষণীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। রাসেলের মৃত্যুর পরে কমরেড দত্তের

রচনাটি নিশ্চয়ই বিশিষ্ট সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

তাছাড়া প্রতি মাসেই কমরেড রজনী পাম দত্ত আর. পি. ডি নামে যে ঐতিহাসিক 'Notes of the Month' (মাসিক-পঞ্জী) লিখতেন, তার বহু লেখা যেমন রাজনৈতিক বিশ্লেষণের দিক থেকে, তেমনি ভাষা, শব্দচয়ণ, তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও কশাঘাতে দৃপ্ত আবার সমাজতন্ত্রের জয়গানে মুখর—বোধ হয় একেই বলে 'রাজনৈতিক সাহিত্য'। আমরা নিচে মাত্র একটি উদাহরণ দিচ্ছি।

লেনিনের ২১শে জানুয়ারি, ১৯২৪-তে মৃত্যুর পরে মার্চ মাসের 'নোটস্ অফ দি মান্থ' কমরেড দত্ত লিখছেন:

"To write of Lenin in English is like a barbarian endeavouring to describe a civilised man. The very atmosphere and language is so soaked in conventional and insincere relics of bourgeois thought in decay that it is almost impossible to drive through them to the profoundly simple and tremendously significant things for which Lenin stood." প্রসঙ্গত, এই লেখাতেই প্রথম ইংরাজী ভাষাতে বোধ হয় 'Leninism শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

বেশি উদ্ধৃতি দিয়ে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করা ঠিক হবে না, তবে প্রসঙ্গত লেখকের যে কয়েকটি প্রসঙ্গ বিশেষ মনে আছে, এখানে উল্লেখ করি: ১৯৪১ এ আগস্ট মাসের নোটস (জার্মানীর সোভিয়েত আক্রমণের পরে), ১৯৪২-এর অক্টোবরের 'নোটস্ (আমাদের আগস্ট ১৯৪২ এর সংগ্রাম সম্পর্কে), ১৯৪৫-এ জাপানের ওপর এ্যাটম্ বোমা ব্যবহার করার পরে চার্চিলের ফুলটন বক্তৃতা সম্পর্কে ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯২৪-৩৬

কমরেড দত্তের ছিল টি. বি. বা যক্ষার ধাত। ডাক্তারের পরামর্শে তাঁর পক্ষে ইংলণ্ডের স্যাঁতসেতে আবহাওয়াতে বাস করা মারাত্মক হতো। ওদিকে কমিনটার্নের কাজের জন্যেও ঠিক হল তিনি থাকবেন ব্রাসেলসে। অবশ্যই ব্রাসেলসের পুলিস তাঁকে শান্তিতে বাস করতে দেয় নি এবং 'লেবার মান্থলী'-র বহু 'নোটস্' ব্রাসেলসের জেলে বসে লেখা।

১৯২৮-এ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ষষ্ঠ কংগ্রেসে তাঁকে ডাকা হয়

ঔপনিবেশিক সমস্যা সম্পর্কে বিশেষ রিপোর্ট করতে। কিন্তু তখন তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যে এটা করা সম্ভব হয় নি, তার ভাই পড়ে অটো কুসিনেনের ওপর।

এই সময়েই, ১৯২৪-এ প্রথম তিনি 'মডার্ন ইণ্ডিয়া' নামে ছোট একটি পুস্তক লেখেন। পুস্তকটি অবশ্য ভারতীয় প্রেস লাইন দিয়ে ছাপা হলেও ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। পরে অবশ্য তাঁর বিখ্যাত বই 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' ভারতে ব্রিটিশ শাসন, আমাদের জাতীয় মুক্তি-স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ে সুবৃহৎ প্রামাণিক গ্রন্থ, এবং সেদিক থেকে 'মডার্ন ইণ্ডিয়া'র গুরুত্ব আজ আর নেই। তবে এই সময়ে তাঁর লেনিনের জীবনের শিক্ষা নামক ছোট বইয়ে লেনিনবাদ সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি বিশেষ জোর দিয়ে দেখান যে, লেনিনবাদের অন্যতম প্রধান শিক্ষা হচ্ছে: সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে ঔপনিবেশিক দেশের জাতীয় মুক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ও মৈত্রী। কারণ, বুঝতে হবে যে ঔপনিবেশিক দেশকে শোষণ করে যে অতি মুনাফা (Super-profit) সাম্রাজ্যবাদীরা সংগ্রহ করতে পারে, তারই সামান্য একটু অংশমাত্র সাম্রাজ্যবাদী দেশের সংস্কারবাদী শ্রমিক নেতাদের (ব্রিটেনের লেবার পার্টির নেতাদের) উচ্ছিষ্ট স্বরূপ দিয়ে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা এই শ্রমিক নেতাদের প্রায় দালালে পরিণত করে ফেলে। কাজেই সাম্রাজ্যবাদকে ধ্বংস করতে না পারলে যেমন উপনিবেশের মুক্তি হবে না, তেমনি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিক আন্দোলনও সংস্কারবাদিতার মোহ থেকে মুক্তি পাবে না। অতএব একই সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে উপনিবেশের জাতীয় মুক্তিস্বাধীনতা আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিক আন্দোলনের সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম একই সূত্রে গাঁথা।

আর তাই দেখি, ১৯২৪-এ ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য, উত্তরজীবনে তার অন্যতন নেতা ও পলিট-ব্যুরোর সভ্য, জর্জ এলিসন ভারতে গা-ঢাকা দিয়ে শ্রমিক আলোলন করতে এসে ধরা ধরা পড়ে দেড় বছর জেল খেটেছেন। কমরেড এলিসনের মৃত্যুতে লেখকের অপরিসীম গর্বের বস্তু যে ব্রিটিশ কমরেডদের সঙ্গে কমরেড এলিসনের শবাধারবাহক হবার তার সৌভাগ্য হয়েছিল।

১৯২৮-এ, কমরেড বেন্ ব্রাডলী এলেন ভারতে, আর ফিলিপ স্প্র্যাট্ (সম্প্রতি মারা গেছেন) এবং পরে লেসটার হাচিনসন। কমরেড ব্রাড্‌লীও আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁর মৃত্যুতে স্বাধীন ভারত গভর্ণমেণ্ট শোকমাল্য

পাঠিয়েছিলেন। এরা তিনজনেই মিরাট মামলায় কয়েক বছর বন্দীজীবন যাপন করেছেন। কমরেড ব্রাডলী গল্প করেছেন: "মিরাটে মামলার পর আমাকে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট সোজা বম্বেতে জাহাজে তুলে দিল, দেশে ফেরার জন্য (অবশ্যই তাঁকে ভারতে থাকতে দিতো না—deport করেছিল)। বম্বের শ্রমিকরা কমরেড ব্রাডলীকে জোর করে দেশে ফেরত পাঠানোর খবর পেয়ে জাহাজ ঘাটায় এক মিটিং করে সগর্বে বলে—আমরা তাঁকে আমাদের সমাজতান্ত্রিক ভারতে ফিরিয়ে আনবো।" সকৌতুকে লেখককে কমরেড ব্রাডলী জিজ্ঞাসা করতেন; "সে প্রতিজ্ঞা কবে পূর্ণ হবে?"

ফ্যাসিবাদের অভ্যুত্থান

১৯৩৫-এ স্বদেশে ফিরে সপ্তম কমিনটার্ণ কংগ্রেসে কমরেড ব্রাডলী ও রজনী পাম দত্ত দুজনেই উপস্থিত ছিলেন। কমরেড ডিমিট্রভের ঐতিহাসিক রিপোর্টের উপর আলোচনা চলে প্রায় ১০ দিন। তার জবাব দিতে গিয়ে কমরেড ডিমিট্রভ এক জায়গায় কমরেড দত্তের আলোচনা-বক্তৃতার সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন—কমরেড দত্তের পয়েণ্ট ছিল যে-কোনো প্রতিক্রিয়াকেই ফ্যাসিবাদ বলে অভিহিত করার ঝোঁক আমাদের এড়াতে হবে। এতে ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন সংকীর্ণ হয়ে ক্ষতি হয়।

কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসের অনতিপূর্বেই কমরেড দত্ত তাঁর বিখ্যাত 'Fascism and Social Revolution' লিখেছেন, পরে লিখেছেন 'World Politics'। প্রথমটির ভারতীয় সংস্করণ নিঃশেষ, দ্বিতীয়টির একটা বাজে ছাপা সংস্করণ পাওয়া যায়।

১৯১৮-এর জার্মান বিপ্লব পরাস্ত হবার পর কি কি ভাবে, ধাপে ধাপে, জার্মান সোস্থাল-ডেমোক্রাসির বিশ্বাসঘাতকতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির যুক্তফ্রণ্টের আবেদন তাঁরা অগ্রাহ্য করে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের পথ সুগম করে দিলো, তার বিশদ প্রামাণিক তথ্যমূলক চিত্র পাওয়া যাবে এ বই দুটিতে।

প্রথম মহাযুদ্ধের অন্তে আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে, অন্যদিকে ফ্যাসিবাদের সাম্রাজ্যবাদী তোষণ-নীতির পুরো চক্রান্ত ফাঁস করে দেওয়া হয়েছে এই বইতে।

দত্ত-ব্র্যাড্‌লী থিসিস।

১৯৩৬-এ কমরেড দত্ত ও ব্র্যাড্‌লী যুক্তভাবে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে একটি থিসিস খাড়া করেন। সপ্তম কমিনটার্ন কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্টের মূল নির্দেশ অনুযায়ী ঔপনিবেশিক দেশে (যেমন তৎকালীন ভারতে) সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পপুলার বা জাতীয়-মুক্তি ফ্রন্ট কীভাবে গড়তে হবে তার বিশদ ব্যাখ্যা এতে পাওয়া যাবে। একদিকে যেমন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের সংগঠন হিসাবে গড়ে তুলতে হবে, তেমনি জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে অন্যান্য সংগ্রামী শক্তিকে নিয়ে আসতে হবে। যেমন: ট্রেড ইউনিয়ন ঐক্য সাধন করে তাকে জাতীয় কংগ্রেসের সমষ্টিগত অংশীদার (collective affiliation) করতে হবে; তেমনি সর্বভারতীয় কৃষক সভা, ছাত্র ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করে তাকেও সমষ্টিগত অংশীদার করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আবার, সর্বভারতীয় উইমেনস্ ফেডারেশন (নারীদের সংগঠন), যারা রাজনীতি বাদ দিয়ে নারীদের সামাজিক অধিকার ও ন্যায়বিচার নিয়ে আন্দোলন করতেন, এ সবই কংগ্রেসের মধ্যে সমষ্টিগত অংশীদার করে জাতীয় কংগ্রেসকে সর্বাঙ্গীন জাতীয়-মুক্তিফ্রন্ট হিসাবে গড়ে তোলার প্রস্তাব ছিল।

দত্ত-ব্র্যাডলী থিসিস লেখা হয় ব্রাসেলস্ শহরে বসে এবং সে সময়ে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ব্রাসেলসের কাছেই জার্মানীর সীমান্তে 'ব্ল্যাক ফরেস্টে' কমলা নেহরুর চিকিৎসার জন্য অবস্থান করছিলেন। কমরেড ব্র্যাড্‌লীর কাছে শুনেছি, কমরেড দত্ত সে সময়ে কয়েকবার নেহরুজীর সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তাছাড়া নেহরুজী, ব্যাডেনউইলারে যে বাড়িতে খরচ দিয়ে বাস করতেন (paying guest), সে বাড়িতে কমরেড দত্তও বেশ কিছু সময় বাস করেছিলেন। কমরেড রজনী পাম দত্তের কাছে শুনেছি, সে সময়ে নেহরুজীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ হয়েছিল।

কমলা নেহরুর মৃত্যুর পর নেহরুজী ভারতে ফিরলেন; তখনকার এরোপ্লেনের ব্যবস্থা যা ছিল (রাত্রে চলত না) তাতে নেহরুজীকে এক রাত্রি রোমে কাটাতেই হবে। মুসোলিনীর বড়ো ইচ্ছা, নেহরুজীর ফ্যাসিবিরোধী মনোভাব জানা থাকা সত্ত্বেও, তাঁকে শোকে সমবেদনা জানাবেন তাঁর নিজের বাড়িতে এনে। নেহরুজী ভদ্রতা ও বিনয় সহকারে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সে সময়ে কমরেড রজনী পাম দত্ত বরাবরই নেহরুজীর পাশে ছিলেন—

সে কথা নেহরুজীর মৃত্যুর পর লণ্ডনের শোকসভায় কমরেড দত্ত বলেছিলেন।

যাই হোক, ১৯৩৬ সালে কমলা নেহরুর মৃত্যুর সময়ে জওহরলাল নেহরু লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। তাঁর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের বক্তৃতায় একদিকে যেমন তিনি সমাজতন্ত্রের বাণী ও লক্ষ্যের কথা প্রচার করলেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের শক্তিকে বাড়াবার জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কিষাণ সভা ইত্যাদিকে সমষ্টিগত অংশীদার করার দাবি তুললেন। অবশ্যই কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী শক্তির চাপে নেহরুজীর এই প্রস্তাব গৃহীত হলো না। নেহরুজীর ১৯৩৬-এর লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের ভাষণ ইউরোপের প্রগতিশীল মহলে বিশেষ আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং রজনী পাম দত্তের 'লেবার মান্থলী' পত্রিকাতেও তার সংক্ষিপ্ত বয়ানও প্রকাশিত হয়।

১৯৩৭-৪১

১৯৩৭-এ দীর্ঘ তের বছর পরে স্বদেশে ফিরে কমরেড রজনী পাম দত্ত একাধারে ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির পলিট-ব্যুরোর সভ্য, তার দৈনিক পত্রিকা 'ডেলি ওয়ারকারের', সম্পাদক এবং পরে ইন্‌ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি, লেবার পার্টির কিছু ব্যক্তিকে নিয়ে যে 'পপুলার ফ্রন্ট' কমিটি গঠিত হয়, তার সভ্য হিসাবে বহু জনসভা ও অন্যান্য নানারকমের আন্দোলনে বহু দায়িত্ব ও কার্যভার গ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সাল থেকেই বিশেষ করে স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইউরোপের দেশে দেশে 'পপুলার ফ্রন্ট' গড়ে উঠে। আন্তর্জাতিক বাহিনী ও ব্রিটেনেরও জনকয়েক বিশিষ্ট লেখক ও বুদ্ধিজীবী, যেমন র‍্যালফ ফক্স, ক্রিষ্টোফার কড্‌ওয়েল, জন কর্নফোর্ড স্পেনের গৃহযুদ্ধে প্রাণ দেন।

ফ্যাসিবাদের বিশ্বজয়ের ক্ষুধার বড়ো প্রকাশ, স্পেনে ফ্যাসিষ্ট জেনারেল ফ্র্যাঙ্কোকে সাহায্য করা। আর ঠিক সেই কারণেই স্পেনের গৃহযুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে সংগ্রামে সাহায্য করা ছিল দুনিয়ার প্রগতিশীল ও কমিউনিস্টদের অন্যতম প্রধান কাজ। তবু ইঙ্গ-ফরাসী এবং পরোক্ষ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তোষণ-নীতির সুযোগ নিয়ে ফ্যাসিবাদ তার আগ্রাসী নীতি চালিয়ে একের পর এক ইউরোপের দেশগুলিকে গ্রাস করতে লাগল। সাম্রাজ্যবাদীরা মিউনিক চুক্তিতে (১৯৩৮) হিটলারের হাতে চেকোস্লোভাকিয়া তুলে দিল, এবং ১৯৩৯-এ ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার যখন পোল্যাণ্ড আক্রমণ করল ইঙ্গ-ফরাসীদের পক্ষেও তখন

আর তোষণ করা সম্ভব হলো না। অন্যদিকে তাদের খোলাখুলি চক্রান্ত ছিল হিটলারকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ। অন্যদিকে বিশেষ করে, পোল্যাণ্ড আক্রমণের অনতিপূর্বেই হিটলারের জার্মানী সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তির দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে বুঝিয়ে দিল যে, সে তাদের হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তখনই আক্রমণ করতে চায় না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু হলো সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসাবে—একদিকে জার্মান সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ, অন্যদিকে ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করা দরকার—ব্রিটিশ পার্টির মধ্যে মতভেদ দেখা গেল। একদিকে কমরেড পলিট ও ক্যাম্পবেল বললেন, দুই ফ্রন্টে লড়তে হবে—অর্থাৎ যুদ্ধকে সমর্থন করে ফ্যাসিবাদের বিরোধিতা করতে হবে, অন্যদিকে কমরেড দত্ত প্রমুখ অনেকে বললেন, সরাসরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরোধিতা করতে হবে। দ্বিতীয় লাইনের জিত হলো, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনেরও মত ছিল এই দিকে। কমরেড রজনী পাম্ দত্ত ব্রিটিশ কমিউনিস্ট প্যার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবে নির্বাচিত হলেন। ১৯৪১-এ সোভিয়েত ইউনিয়নকে হিটলার-ফ্যাশিস্তরা আক্রমণ করার পরে যখন আগেকার দ্বন্দ্বের নিরসন হয়ে সে লড়াই জনযুদ্ধে পরিণত হলো, তখন কমরেড পলিটকে আবার সাধারণ সম্পাদক রূপে ফেরত আনা হলো। প্রসঙ্গত বলতে পারি, কোনো অবস্থাতেই কমরেড পলিট ও রজনী পাম দত্তের অকৃত্রিম বন্ধুত্বে চিড় খায় নি।

'ইণ্ডিয়া টু-ডে'।

পপুলার ফ্রন্টের যুগে 'বামপন্থী বুক ক্লাব' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা ভিকটর গোলানস স্থাপন করেন। কমরেড দত্তের বেশ কয়েকটি বই ইনি প্রকাশ করেন এবং ১৯৩৬-৩৭ সালে কমরেড দত্তের ভারত সম্পর্কে বই লেখবার চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই বিখ্যাত বইটিই 'ইণ্ডিয়া টু-ডে'।

প্রায় তিন বছর পরিশ্রম করার পর ১৯৩৯ সালের নভেম্বরে যখন বইটি লেখা শেষ হলো, তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলার অপরাধে ভিকটর গোলান্স বইটি ছাপতে অস্বীকার করেন, যুক্তি—বইটা বে-আইনী। অবশ্য চেপে ধরাতে তাঁর পক্ষের উকীল যখন বললেন, বইটা বে-আইনী নয় তবে ভারতে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে খতম করার উদ্দেশ্যেই লিখিত, তখন ভিকটর গোলান্স বইটার বহু অংশ ছেঁটে দিয়ে (censure করে) ছাপান। অবশ্য তা

সত্ত্বেও ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট বইটির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে। তখনকার বে-আইনী ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বইটি গোপনে প্রকাশ করে।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ, পরে সাম্রাজ্যবাদী যুগের লগ্নি-পুঁজির শোষণের নতুন চেহারা, ভারতের ক্রমবর্ধমান জাতীয় মুক্তিস্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বৈত দোদুল্যমান চরিত্র—সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ ও সংগ্রাম, এ সবই প্রচুর তথ্য ও বিশ্লেষণ সহকারে উপস্থিত করা হয়েছে। অবাক হতে হয় ভেবে যে, এটা একজন মানুষের কাজ।

তাঁর বইটির কয়েকটি মূল্যায়ন সম্পর্কে নিশ্চয়ই যথেষ্ট তর্কের অবকাশ আছে, যেমন গান্ধীজির ভূমিকা। এ সম্পর্কে আজকাল অনেক রকম মূল্যায়ন পাওয়া যায়। কমরেড দত্তের মতে, জাতীয় আন্দোলন যখন একেবারে প্রাথমিক স্তরে তখন গান্ধীজির সংগ্রামকৌশল (সত্যাগ্রহ প্রভৃতি) আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং অনেক সময়ই আন্দোলনকে যেন গোড়া থেকে গড়ে তোলে। কিন্তু জাতীয় মুক্তিস্বাধীনতা আন্দোলনে শ্রমিক-কৃষক তার নিজস্ব ভূমিকায় অবতীর্ণ হ'লে গান্ধীবাদ তথা গান্ধীজির সংগ্রামী কৌশল আন্দোলনকে রুখে দেবার কাজে ব্যবহৃত হয়।

প্রায় ৩০ বছর পরে 'ইণ্ডিয়া টুডে'-এর নতুন সংস্করণের জন্য একটি আলাদা ভূমিকা লিখে কমরেড দত্ত তাঁর পূর্বের গান্ধীজির ভূমিকার মূল্যায়নের কথা উল্লেখ করে গান্ধীজির শেষ জীবনের হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য মৃত্যুবরণের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে দেখিয়েছেন, জনগণের সঙ্গে গভীর যোগ থাকাতেই দ্বৈত দোদুল্যমান ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও গান্ধীবাদের প্রগতিশীল চেহারা ছিল।

কমরেড দত্তের আরো অন্যান্য বিখ্যাত বইয়ের মধ্যে রয়েছেঃ Crisis of Britain and British Empire এবং International। প্রথমটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ যুগের ও উপনিবেশে জায়মান জাতীয় মুক্তিস্বাধীনতা আন্দোলনের বিশ্লেষণ ও প্রচুর তথ্য পাওয়া যাবে। দ্বিতীয়টিতে তিনটি আন্তর্জাতিকের বিশদ ইতিহাস পাওয়া যাবে। উপস্থিত, যতদূর জানি, কমরেড দত্ত আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা লিখতে ব্যস্ত। তিনি আজ কয়েক বছর ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব পদ থেকে (এক নাগাড়ে ১৯২২ সাল থেকে ৩৫ বৎসরাধিক পলিট ব্যুরোর সভ্য ছিলেন) সরে গিয়ে 'লেবার মান্থলী'র সম্পাদনা ও অন্যান্য কাজে ব্যস্ত। তাঁর ৭৫ বছর বয়স উপলক্ষে সোভিয়েত গভর্ণমেণ্ট তাঁকে লেনিন-নামাঙ্কিত মেডেল পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আমরা তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মহাবিশ্বে আমরা কি নিঃসঙ্গ

শঙ্কর চক্রবর্তী

এই বিরাট মহাবিশ্বের অন্য কোন গ্রহজগতে মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর অস্তিত্ব সম্ভব কিনা, বিজ্ঞানীরা এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন। যদি সত্যিই কোন বুদ্ধিমান সভ্যতা কোথাও থেকে থাকে, তারাও কি আপন দোসরকে খুঁজে পাবার জন্যে আমাদেরই মত সমান ব্যগ্র নন? তাদের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যা হয়ত আমাদের চেয়ে বহুগুণ বেশি উন্নত। সভ্য জগতের সন্ধান কাজে তারা হয়ত আমাদের অনেক আগেই নেমে পড়েছেন। হয়ত এমন এক অসাধারণ শক্তিমান রকেট যন্ত্রের উদ্ভাবন করেছেন তারা, আলোর কাছাকাছি বেগে যে পথ পাড়ি জমাতে পারে, যে বেগ আয়ত্ত করা আজও আমাদের স্বপ্নের অতীত।

হয়ত এমনই এক অভিযানে এক মহা উন্নত সভ্যতার অধিকারীরা সুদূর অতীতে এসেছিলেন আমাদেরই এই পৃথিবীতে। হয়তো তাঁরা এসেছিলেন একাধিকবার—যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন প্রাচীন পৃথিবীর কিছু কিছু মানবগোষ্ঠির সঙ্গে। তাদের অপরিমিত শক্তির মহিমা অবাকবিস্ময়ে স্তম্ভিত ও মুগ্ধ করেছিল আমাদের পূর্বপুরুষদের। দেবতারূপে পূজিত হয়েছিলেন তারা। তাঁদের প্রতি নৈবেদ্যরূপে গড়ে উঠেছিল সুবিশাল মন্দির এবং ভাস্কর্যের অত্যাশ্চর্য সব নিদর্শন। পৃথিবীর মানুষকে তাঁরা শিখিয়েছিলেন বহুতর জ্ঞান এবং নানা যান্ত্রিক এবং কারিগরী বিদ্যায় তাঁদের অধিগত করিয়েছিলেন। তারপর তাঁরা ফিরে গিয়েছেন, আবার ফিরে আসবেন এমন প্রতিশ্রুতিও তাঁদের ছিল।

অতীত পৃথিবীর বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন এবং বিভিন্ন দেশের ধর্মগ্রন্থগুলোর বিস্তৃত আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখা যায় অন্য জগত্ থেকে আসা এক মহাশক্তিমান প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে সর্বত্র। এদের সব কিছুই ছিল দুর্বোধ্য, তাঁরা পরিগণিত হয়েছেন দেবতারূপে। আধুনিক মহাকাশচারীর পোষাকের সঙ্গে আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায় এমন বহু পোষাক পরিহিত মূর্তির দেয়ালচিত্র পৃথিবীর নানা দেশের গুহাগাত্রে অঙ্কিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। এগুলো কি শুধু প্রস্তর

যুগের শিল্পীর কল্পনা। অগ্নিময় রথের অজস্র নিখুঁত বর্ণনা ছড়ানো রয়েছে পৃথিবীর ধর্মগ্রন্থগুলোতে—যে রথে চড়ে দেবতারা নেমে আসতেন পৃথিবীতে। এই বর্ণনাগুলোর বাস্তবতার সঙ্গে কি কোন সম্পর্ক ছিল না? দেবতারা বহুবার পৃথিবীর মানবীদের গর্ভ সঞ্চার করে সঙ্কর প্রাণী সৃষ্টি করেছেন—যার অজস্র বর্ণনা পাওয়া যায়। একটা প্রশ্ন কিন্তু সর্বত্রই মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে—কে এই দেবতারা? তাদের সম্বন্ধে কিছু জানার যে কোন প্রচেষ্টাই কিন্তু নিষিদ্ধ।

প্রাচীন পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের বহু বৈজ্ঞানিক নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে, তৎকালীন বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী বিদ্যার সমৃদ্ধির বিচারে যেগুলি এক পরম বিস্ময়, কোন যুক্তিতেই যাদের অস্তিত্বের কোন সুষ্ঠ ব্যাখ্যা আজও পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। এটাই বা কি করে সম্ভব হলো? এমনিধারা অজস্র প্রশ্ন সুদীর্ঘ কাল ধরে উত্তরের অপেক্ষায় রয়েছে।

বিশাল এই মহাবিশ্ব

এই সুবিশাল মহাবিশ্বের মাঝে ছায়াপথ নামে যে বিশ্বটিতে আমরা বাস করি, সেটি গড়ে উঠেছে দশ হাজার কোটি তারার সমবায়ে। আমাদের বিশ্বের ব্যাস একলক্ষ আলোক-বর্ষ। আলোর বেগ সেকেণ্ডে ১৮৬০০০ মাইল। সেই হিসেবে আমাদের বিশ্বের ব্যাপ্তি পৌছোবে এক বিরাট অঙ্কের কোঠায়।

আলোক ও রেডিও দূরবীন যন্ত্রের সাহায্যে জ্যোতির্বিদরা অনুসন্ধান করে চলেছেন আমাদের বিশ্বকে এবং এমনিধারা আরো অগণিত বিশ্বকে। আমাদের ছায়াপথ থেকে অন্যতম প্রতিবেশী তারাজগত অ্যাণ্ড্রোমিডার দূরত্ব হলো কুড়ি লক্ষ আলোক-বর্ষ। এর মধ্যেও রয়েছে দশ হাজার কোটি তারা এবং চেহারার ধরণে ও মাপে এ প্রায় আমাদের ছায়াপথেরই মত। এরকম বহু কোটি তারা-জগত ধরা দিয়েছে দূরবীনের কাছে। রেডিও দূরবীনের সাহায্যে এমন একটি তারাজগতের সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা, যেখান থেকে পৃথিবীতে আলো এসে পৌছতেই সময় লাগে প্রায় ৭০০ কোটি আলোক-বর্ষ। অর্থাৎ সেই আলো ঐ তারাজগত থেকে যাত্রা শুরু করেছিল এমন একটা সময়ে যখন পৃথিবীর হয়ত আদৌ সৃষ্টিই হয়নি।

এই বিরাট মহাবিশ্বের হয়তো বেশির ভাগ অংশটাই আজো আমাদের দূরবীনের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। এরই মাঝে এক ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র অংশ হলো আমাদের সৌরজগত, যে জগতের মধ্যমণি সূর্যকে নিয়ে চেহারার মাপে,

উজ্জ্বলতার কৌলিন্যে গর্ব করার আমাদের বিশেষ কিছু নেই।

সৌরজগতের মধ্যে একমাত্র পৃথিবীতেই মানুষের মতো জটিল এবং বুদ্ধিমান প্রাণীর উদ্ভব এবং বিকাশ সম্ভবপর হয়েছে। প্রাণসৃষ্টি এবং প্রাণধারণের পক্ষে অনুকূল কতকগুলো বিশেষ নিয়ম পৃথিবী সুদীর্ঘকাল ধরে মেনে চলার ফলেই এটা ঘটতে পেরেছে।

সৌরজগতের মধ্যে বিজ্ঞানীরা কতকগুলো কার্যকারণ নিয়ম শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়েছেন, যা থেকে এই সিদ্ধান্তেই পৌছতে হয় যে মহাবিশ্বে সৌরজগতের উদ্ভব কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং একটি নিয়ম। সেই নিয়ম অনুসরণ করলে দেখা যাবে আমাদের ছায়াপথেই গ্রহজগতের সংখ্যা দাঁড়াচ্ছে অগুণতি। বিজ্ঞানীদের অনুমান এই সব গ্রহজগতের মধ্যে পৃথিবী জাতের প্রায় দশ লক্ষ গ্রহের সন্ধান আমরা পাব যেখানে বায়ুমণ্ডল এবং অন্যান্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা জটিল প্রাণীজগতের উদ্ভবের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুকূল।

পার্থিব পরিবেশ ছাড়া প্রাণের উদ্ভব সম্ভব নয়, পৃথিবীতে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় এ ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এই মহাবিশ্বে বহু গ্রহজগতে হয়ত জীবনের অনুকূল পরিস্থিতি পৃথিবীর বহু আগেই সৃষ্টি হয়েছিল। কাজেই সে সব ক্ষেত্রে মানুষের তুলনায় অনেক উন্নততর প্রাণী ও সভ্যতার বিকাশ যে ঘটেছে এরকম একটি ধারণা সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দেয়া যায় না।

প্রশ্ন তোলা যায়, এতো বিজ্ঞানীদের নিছক একটা অনুমান মাত্র। এ ঘটনার সমর্থনে যুক্তি প্রমাণ তো আজও কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতর্ক ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্তে পৌছেছেন, তাকে চট করে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

বিশ্বজোড়া এই উন্নত সভ্য জগতগুলোর সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের পারস্পরিক যোগাযোগ কি কোনদিন সাধিত হতে পারবে। দুটো উপায়ের কথা বিজ্ঞানীরা ভাবছেন। একটি হলো সুদীর্ঘ মহাকাশযাত্রার সময়কালীন মানুষের সমগ্র জৈবিকব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপকে মন্থর করে তোলা। এক পরম শীতল পরিবেশের মধ্যে যদি গভীর তন্দ্রায় আচ্ছন্ন করে রাখা যায় মানুষকে, একমাত্র তাহলেই এটা সম্ভব হতে পারে। এ নিয়ে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে।

আর একটি উপায়ের কথা বর্তমানে বিজ্ঞানীদের স্বপ্নের স্তরেই রয়েছে। সুদূর ভবিষ্যতে মহাকাশ অভিযানের কোন এক পর্যায়ে মানুষ যদি এমন এক মহাশক্তিমান রকেট যন্ত্রের উদ্ভাবন করতে পারে, যে ছুটবে আলোর বেগের

শতকরা নিরানব্বই ভাগ বেগে তখন কতকগুলো বিচিত্র ঘটনা ঘটতে থাকবে। আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রতিপাদ্য অনুযায়ী সেই রকেটের অভিযাত্রীদের ঘড়ির গতি পৃথিবীর ঘড়ির তুলনায় অনেক মন্থরগতিতে চলতে থাকবে। মানুষের হৃদযন্ত্রের স্পন্দনটাও যেন ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো। ঐ বিপুল বেগের অধিকারী মানুষের ক্ষেত্রে হৃদযন্ত্রের গতি এতটাই মন্থর হয়ে আসবে যে তার শরীরের ক্ষয় আর প্রায় ঘটবে না বললেই চলে। ঐ হিসেবে দেখা যাবে মহাকাশচারীদের নভোচারণকালে যখন মোটে ১৪'১ বছর অতিবাহিত হয়েছে, পৃথিবীর মানুষের ক্ষেত্রে তখন কেটে গেছে একশ বছর। এই ফোটন রকেটের কলাকৌশলকে আয়ত্ত করে পৃথিবীর মানুষ কবে মহাবিশ্ব জয়ের অভিযানে অগ্রসর হবে, সে চিন্তা আমাদের কাছে সুদূরপরাহত। তবে হয়ত মহাশক্তিমান কোনো যানে সুদূর অতীতে অন্য তারাজগতের কোনো গ্রহবাসী একদল প্রাণী এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। ঘটনাটা হয়ত ঘটেছিল বর্তমান কালের আনুমানিক দশ হাজার বছর আগে থেকে শুরু করে চল্লিশ হাজার বছর পর্যন্ত মধ্যবর্তী যে কোনো একটা সময়ে। সেটা ছিল পৃথিবীর প্রাচীন প্রস্তর যুগ। এ জাতীয় একটি ধারণা পোষণ করছেন এরিক ফন দানিকেন তাঁর Chariots of the Gods গ্রন্থে। বইটির বাঙলা অনুবাদ করেছেন অজিত দত্ত। রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোর রচনাকালটা মনে রেখেই দানিকেন এ জাতীয় একটি ধারণার বশবর্তী হয়েছেন কারণ মহাকাশের ঐ আগন্তুকদেরই না আমরা দেবতারূপে বারেবারে ঐ পুস্তকগুলোতে উল্লিখিত হতে দেখি।

ভিনগ্রহবাসী আগন্তুকেরা তৎকালীন পৃথিবীর মানুষদের সমগ্র চেতনার ওপর এক বিরাট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, সন্দেহ নেই। আমাদের সরল পূর্বপুরুষেরা তাঁদের পূজো করেছিলেন দেবতারূপে। মহাকাশের আগন্তুকদেরও হয়ত সে দেবসম্মান গ্রহণ করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। হয়ত অন্য গ্রহ-জগতের কোনো অনুন্নত সভ্যতার অধিকারীদের কাছে আমাদের পৃথিবীর মহাকাশচারীরাও দূর ভবিষ্যতে একদিন লাভ করবে ঠিক একই ধরণের স্তুতি। মহাকাশের সেই আগন্তুকদের কাছ থেকেই হয়ত বিভিন্ন জ্ঞানের নির্দেশ নিয়ে আমাদের পূর্বপুরুষেরা এক বিচিত্র কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। সেই পারস্পরিক সংযোগের একটা পরিচয় যেমন পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে ছড়িয়ে রয়েছে, তেমনি পৃথিবীর কিছু কিছু বিচিত্র বস্তুও তার একটি জলন্ত প্রমাণ আমাদের সামনে তুলে ধরে না কি?

যে বিস্ময়গুলোর ব্যাখ্যা নেই

প্রথমেই উল্লেখ করা যায়, অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে প্রাচীন ম্যাপগুলো ছিল তুর্কী নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল পীরি রুইসের কাছে, সেগুলোর কথা। বিস্তৃত পরীক্ষার পর ম্যাপগুলোতে বিভিন্ন মহাদেশ এবং মহাসাগর-গুলোর সীমারেখা যে শুধু নির্ভুল বলে প্রমাণিত হলো তাই নয়, সবচেয়ে বিস্ময়জনক ব্যাপারটা ছিল এই যে ঐ ম্যাপগুলোর সঙ্গে বর্তমানের কৃত্রিম উপগ্রহ-গুলো থেকে তোলা পৃথিবীর ছবির এক আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

এ ম্যাপগুলো যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা রচনা করেন নি, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এটা অত্যন্ত নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে ম্যাপগুলো অতি সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি এবং অনেক দূর আকাশ থেকে ছবিগুলো তোলা হয়েছে। ছবিগুলো কোনো ভিন গ্রহ থেকে আগত তথাকথিত দেবতার কাছ থেকেই কি পেয়েছিল পৃথিবীর মানুষ!

পিস্কো উপসাগরের ওপর খাড়া লাল পাহাড়ের গায়ে ৮২০ ফুট উঁচু একটি অদ্ভুত ছবি খোদাই করা আছে। একটা ত্রিশূল কিংবা একটা ত্রিধাবিভক্ত পিলসুজের মত দেখায় ওটাকে। মাঝের শাখাটায় একটা লম্বা দড়ি দেখে প্রশ্ন জাগে, অতীতে ওটা কি দোলকের কাজ করতো? সমগ্র নির্মাণ কাজটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়, যদি না অনেক উঁচু থেকে আসা মহাকাশচারীকে সংকেত করার উদ্দেশ্যে ওগুলো তৈরি হয়ে থাকে।

পেরুর স্থাকসাইহুআমানের কাচে পরিণত শিলার নমুনা পাওয়া গেছে। আমরা জানি পাথর গলাতে প্রয়োজন হয় প্রচণ্ডতম উত্তাপের। গোবি মরুভূমি এবং ইরাকের প্রাচীন এলাকাতেও রয়েছে কাচে পরিণত বালি—নেভাদা মরুভূমিতে পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বালি যেমন কাচ হয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনি। তবে কি ঐ সব জায়গা সুদূর অতীতে ব্যবহৃত হয়েছিল পারমাণবিক রকেটের অবতরণ ক্ষেত্ররূপে।

দুনিয়া জোড়া এমনি আরো কত সব অদ্ভুত নিদর্শন ছড়ানো রয়েছে, তৎকালীন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অত্যন্ত নিম্নমানের সঙ্গে যাদের অস্তিত্বের কোন ব্যাখ্যাই খুঁজে পাওয়া যায় না। যেমন মিশরে আর ইরাকে পাওয়া স্ফটিক-কাটা লেন্স (যা বর্তমানে সিজিয়াম অক্সাইডের সাহায্যে নির্মাণে করা সম্ভব, যে অক্সাইড কেবলমাত্র তাড়িত-রাসায়নিক পদ্ধতিতেই তৈরি করা

যায়), এশিয় কোহিস্থানের পার্বত্য এলাকায় গুহাচিত্রে আঁকা দশ হাজার বছর আগেকার নক্ষত্রপুঞ্জের নিখুঁত অবস্থিতি, পেরুর মালভূমিতে পাওয়া প্ল্যাটিনামের অলংকার, চীনদেশের একটি কবর থেকে পাওয়া অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি বেল্টের কয়েকটি অংশ, দিল্লীর ক্ষয়হীন লৌহস্তম্ভ ইত্যাদি। পুরনো প্রশ্নটাই আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, বর্তমানযুগের সমপর্যায়ভুক্ত অতি উচ্চমানের সংস্কৃতি ও প্রযুক্তিবিদ্যার জ্ঞান প্রাচীন পৃথিবীর অপটু মানুষদের দিয়েছিল কে ?

আর একটি আশ্চর্য ব্যাপার হলো পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অংকিত গুহাচিত্রগুলিতে অন্যান্য ছবির সঙ্গে পাওয়া ডুবুরীর পোষাক পরা মাথায় শিরস্ত্রাণ শোভিত কতকগুলো ছবি। কোনো কোনো ছবির মাথায় আবার শিং আঁকা—বর্তমানের মহাকাশচারীদের পোষাকের সঙ্গে যার অদ্ভুত মিল খুঁজে পাওয়া যায়। শিংগুলোকে রেডিওর এরিয়ালের সঙ্গে তুলনা করা যায় স্বচ্ছন্দে। এগুলোকে হয়তো শিল্পীর নিছক খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, যদি না পৃথিবীর একাধিক জায়গায় এদের সন্ধান পাওয়া যেত।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থগুলোতে স্বর্গ থেকে নেমে আসা দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের যোগাযোগের বহু ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই বর্ণনার অনেকগুলোতে দেবতাদের পোষাক এবং যানের বিস্ময়কর নিখুঁত সব বর্ণনা রয়েছে। রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল প্রভৃতি গ্রন্থে দেবতারা অগ্নিময় রথে করে পৃথিবীতে নেমে আসতেন এ জাতীয় বর্ণনার ছড়াছড়ি। দেবতাদের সঙ্গে পৃথিবীর মানুষের যৌনসংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে সংকর মানুষ তৈরির বিচিত্র সব উপাখ্যানও ছড়িয়ে রয়েছে ধর্মগ্রন্থগুলোতে। একটা প্রশ্ন দেখা দেয়—রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, গিলগামেশের মহাকাব্য, এস্কিমো-রেড ইণ্ডিয়ান-স্ক্যাণ্ডিনেভীয়-তিব্বতী এবং আরো অনেক পুঁথির কাহিনীকাররা সকলেই যে উড়ন্ত দেবতাদের এবং আকাশযানের কথা, একই ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কথা বলেছেন, সেই একই ধারণা পৃথিবীর সব কাহিনীকারদের মাথায় এলো কিভাবে ? পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে লিখিত একই ধরণের কাহিনীর মূলে থাকা চাই প্রাগৈতিহাসিক ঘটনা। তাঁরা যা দেখেছিলেন, তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

মিশরের পিরামিড ও মমি

মিশরের পিরামিডগুলো আর এক বিস্ময়কর ঘটনা। পাথর কুঁদে ঐ বিরাট মন্দিরগুলো তৈরি করা হয়েছিল কিভাবে ? পাথরের চাঙরকে কাঠের

রোলারের ওপর দিয়ে গড়িয়ে বহন করা যায়, কিন্তু মিশরীয়রা তাদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খেজুর গাছগুলোকে একাজের জন্যে কোন ভরসায় কেটে ফেলত? কোনো জায়গা থেকে বিশেষ নির্দেশ কি ছিল এর মূলে? মিশরে শিঅপ্‌সের পিরামিড একটি আশ্চর্য ব্যাপার। এই পিরামিডের উচ্চতাকে দশ কোটি দিয়ে গুণ করলে তা পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের সমান হয়ে দাঁড়ায়। পিরামিডটির মাঝখান দিয়ে একটি মধ্যরেখা টানা হলে, তা পৃথিবীর মহাদেশ এবং মহাসাগর-গুলোকে সমান দুভাগে ভাগ করবে এবং পিরামিডটি আবার মহাদেশগুলোর কেন্দ্রে অবস্থিত। এমনিধারার আরো বহু আশ্চর্য তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় পিরামিডটির জ্যামিতিক ছকের মধ্যে। পিরামিডটির স্থান নির্বাচন যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা নিশ্চিতভাবেই পৃথিবীর আকার এবং মহাদেশ ও মহাসাগর-গুলোর অবস্থান সম্বন্ধে সঠিক ধারণা পোষণ করতেন। পীরি রইসের ম্যাপের কথা এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে। দানিকেনের মতে পিরামিডের স্থান নির্বাচনের ব্যাপারে পুরোহিতদের মারফত মহাকাশের আগন্তুকেরাই হয়ত নির্দেশ দান করেছিলেন।

মিশরের মমিগুলোও এক দুর্বোধ্য ব্যাপার। মৃত্যুর পর প্রলেপলিপ্ত অবস্থায় থাকার একটাই ছিল উদ্দেশ্য—তারার দেশ থেকে আসবেন দেবতারা, তারপর নবজীবন দান করে জাগিয়ে তুলবেন যত্ন করে রাখা দেহগুলোকে। স্বভাবতই যে প্রশ্নটা মাথা তুলে দাঁড়ায়, তা হলো এই, প্রাচীন মিশরীয়েরা কোথা থেকে জানল, দেহকোষগুলো জীইয়ে রেখে দেহটাকে সুরক্ষিত জায়গায় যত্ন করে রাখলে হাজার হাজার বছর বাদেও তাকে নবজীবন দিয়ে জাগিয়ে তোলা সম্ভব।

একটি আশ্চর্য পরীক্ষার ফলাফল জানা গিয়েছিল ওকলাহামা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানীদের কাছ থেকে। ১৯৬৩ সালের মার্চ মাসে মিশর রাজকুমারী মিনির মমি পর্যবেক্ষণ করে তাঁরা দেখলেন যে জীবকোষগুলো এখনো এমন তাজা অবস্থায় রয়েছে যে তাদের আজো জীবন্ত করে তোলা সম্ভব। রাজকুমারীর মৃত্যু হয়েছে অবশ্য কয়েক হাজার বছর আগে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মমির সন্ধান পাওয়া গেছে। মমির সংরক্ষণ ব্যবস্থা মনে করিয়ে দেয় মানুষের দেহকে হিমায়িত করে জৈবিক প্রক্রিয়াকে মন্থর করে তোলার জন্যে বিজ্ঞানীদের বর্তমান প্রচেষ্টার কথা, সুদীর্ঘ মহাকাশযাত্রার জন্যে যে ব্যবস্থার ওপর তাঁরা বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করছেন। দুটি প্রচেষ্টার মধ্যে অবশ্য কয়েক হাজার বছরের ব্যবধান।

উড়ন্ত চাকী

ফ্লাইং সসার বা উড়ন্ত চাকীর ব্যাপারটা নিয়ে বহুদিন বিজ্ঞানী মহলে একটা তাচ্ছিল্যের ভাব বর্তমান ছিল। এ প্রসঙ্গে দানিকেন কয়েকটি ঘটনার কথা তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, যেগুলো বিজ্ঞানীরাও সহজে বাতিল করে দিতে পারছেন না। আসলে এগুলো কি? ভিনগ্রহ থেকে আসা মহাকাশযান না কি শুধুই দৃষ্টিবিভ্রম? এ প্রশ্নের কে সঠিক জবাব দেবে?

১৯০৮ সালের ৩০শে জুন সাইবেরিয়ার তাইগা অঞ্চলে একটি বিরাট রহস্যজনক ঘটনা ঘটেছিল। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের লোকেরা একদিন দেখল, একটি প্রকাণ্ড আগুনের গোলা আকাশ থেকে নেমে এল তৃণভূমির দিকে। ওটাকে একটা বড় উল্কা বলে ধরে নিয়েছিলেন সবাই কিন্তু যেখানে ওটা পড়েছিল, বেশ কয়েক বছর বাদে সেখানকার সমগ্র অঞ্চল জুড়ে অনুসন্ধান করে এক-টুকরো লোহা, নিকেল বা এক চাঙড় পাথর পর্যন্ত পাওয়া গেল না—উল্কার বস্তুপিণ্ডের এতটুকু চিহ্ন কোথাও মিলল না।

১৯৬৩ সালে সোভিয়েত বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর একদল অভিযাত্রী ঘটনাস্থল-টিকে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে অভিমত দিলেন সাইবেরিয়ায় যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তা নিশ্চয়ই পারমাণবিক। তাঁরা দেখেছেন, বিস্ফোরনের কেন্দ্র থেকে এগার মাইল দূর পর্যন্ত গাছের মাথার দিককার ডালপালা অঙ্গার হয়ে গেছে। এ থেকে বোঝা যায়, দাবাগ্নি নয়, এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই আগুনটা হঠাৎ ধরে গিয়েছিল এবং তেজস্ক্রিয়তার ফলেই যে অঙ্গারীভবনটা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। এই প্রলয়কাণ্ডের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন হয়েছিল তার পরিমাণ একটি এক মেগাটন (দশ লক্ষ টন) শক্তিধর পারমাণবিক বোমার ধ্বংসের ক্ষমতার সমান। সাইবেরিয়ার তাইগা অঞ্চলের বিস্ফোরণটা হয়ত অজানা কোনো মহাকাশযানের সঞ্চিত শক্তি ধ্বংস করার ফলেই ঘটেছিল। ঘটনাটির মূল কারণ আজও এক অব্যাখ্যাত রহস্যের পর্যায়েই রয়ে গেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত On the track of discovery গ্রন্থে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

উন্নত সভ্যতার সন্ধানে

পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা অন্যান্য নক্ষত্রলোকের বুদ্ধিমান গ্রহজগতের সঙ্গে যোগাযোগ

স্থাপনের চেষ্টা করে চলেছেন। পরিকল্পনাগুলোর কথা আমাদের বিস্ময়রোমাঞ্চে ভরিয়ে তোলে। এদের রচনার পেছনে অবশ্য রয়েছেন পৃথিবীর বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা।

১৯৬১ সালের নভেম্বর মাসে আমেরিকার ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গ্রীণব্যাংকে জাতীয় জ্যোতির্বিদ্যা মানমন্দিরে সমবেত হয়েছিলেন কয়েকজন সেরা মার্কিন বিজ্ঞানী। এঁদের বিবেচ্য বিষয় ছিল 'মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান জীব প্রসঙ্গ'। এরা একটি সূত্র নির্ধারণ করেন। এ সূত্রের ক্ষুদ্রতম হিসেব অনুযায়ী যে কোনো মুহূর্তে শুধু আমাদের ছায়াপথেই চল্লিশটির মতো এবং বৃহত্তম হিসেবে পাঁচ কোটির মতো বিভিন্ন সভ্যতা হয় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করছে, কিংবা অপেক্ষা করছে ভিনগ্রহ থেকে সংকেত পাবার আশায়।

আমেরিকার গ্রীনব্যাংক মানমন্দিরে Project Ozma (রূপকথার Oz নামক বিচিত্র দেশের অপরূপ রাজকন্যা Ozma-র স্মরণে এই নামকরণ) পরীক্ষাকাজ সুরু করেছিলেন জ্যোতির্বিদ ড্রেক। তিনি কাছাকাছি দুটি তারা ইটাউ সেটি এবং এপসাইলন এরিদানির (দুটিরই দূরত্ব দশ থেকে এগার আলোকবর্ষের মধ্যে) ওপর কড়া নজর রাখলেন। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রে কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত লিপিবদ্ধ হতে লাগলো সেখান থেকে আসা একুশ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখা হলো, লিপিবদ্ধ বেতার তরঙ্গের মধ্যে কোথাও কোনো সুসঙ্গত সংকেত লুকিয়ে আছে কিনা। কোন সংকেত অবশ্য পাওয়া গেল না—কিন্তু ড্রেক বা অন্য কোনো বিজ্ঞানী এ বিফলতায় দমেননি।

মঙ্গলের দুটো চাঁদ ফোবো এবং ডাইমোর (ভীতি ও সন্ত্রাস) ওপর বিজ্ঞানীদের কড়া নজর রয়েছে, ও দুটির ত্বরণ (অ্যাকসিলারেশন) বড় অদ্ভুত —ঠিক কৃত্রিম উপগ্রহের মত। মঙ্গলে কি কোনদিন বুদ্ধিমান প্রাণীদের বাস ছিল, যারা ঐ দুটির স্রষ্টা। তারা গেল কোথায়? ওরা কি পৃথিবীতে এসেছিল কোনদিন? মঙ্গলে মানুষ না নামা পর্যন্ত অবশ্য এ প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যাবে না। সত্যিই যদি সেখানে প্রাচীন কোন সভ্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে যে প্রত্নতাত্ত্বিক আশ্চর্য নিদর্শনগুলো সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়ানো রয়েছে, তাদের একটা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া হয়ত সম্ভব হবে।

মহাকাশজীববিৎ (অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট) সেগানের মতে শুধু পরিসাংখ্যিক গণনা থেকেই বলা যায়, আমাদের ইতিহাসের কালে বহির্জগত থেকে অন্ততঃ একবারও এ পৃথিবীর মাটিতে সভ্য মানুষের পদার্পণ ঘটেছিল।

চিন্তার সংক্রমণ

আশ্চর্য একটি বিষয় হলো, একটি মস্তিষ্ক থেকে আর একটি মস্তিষ্কে চিন্তার সংক্রমণের ব্যাপারটা, যেটি প্রায় প্যারাসাইকোলজীর পর্যায়ে পড়ে। একটি মগজ কি সত্যিই পৃথিবীর অপর একটি মগজের সঙ্গে যোগাযোগ সাধন করতে পারে—এতটা বিরাট ক্ষমতা কি একটি মগজের রয়েছে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, একটি মানুষের মগজের ধূসর বহিঃস্তরের মাত্র এক দশমাংশ কর্মশীল থাকে। বাকি অংশকে কি কোনো শক্তির দ্বারা কাজ করানো যায় না? তাহলে সেই মগজের কার্যকরী ক্ষমতা কি অসীম সম্ভাবনাময় হয়ে উঠবে না?

এডগার কেস নামে আমেরিকার কেণ্টাকীর এক চাষীর ছেলের কথা দানিকেন্ তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। অচৈতন্য অবস্থায় সে যে কোন রোগের সঠিক ওষুধ ও চিকিৎসাব্যবস্থা বাতলে দিতে পারত। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা কেসের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিভাবে এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় সে দিয়ে থাকে, এর জবাবে কেস বলেছিল—যে কোনো রোগের উপযুক্ত বিধান পাবার জন্যে পৃথিবীর যে কোনো মগজের সঙ্গে সে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। রোগীর মগজের কাছ থেকে প্রথমে সে তার রোগের সঠিক বৃত্তান্তটা জেনে নেয়। তারপর সে দ্বারস্থ হয় সেই রোগের প্রতিবিধানের সবচেয়ে ভাল উপায় জানা আছে যে মগজের তার অধিকারীর কাছে, তা সে পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন। সব ব্যাপারটাই ঘটছে কেসের সমাধিস্থ অবস্থায়। সে যখন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তখন এ ব্যাপারে তার কোনো ক্ষমতাই প্রকাশ পায় না। চিকিৎসাবিদ্যায় কেসের আদৌ কিন্তু কোনো অধিকারই ছিল না।

কেসের ঘটনাটার পেছনে সত্যিই যদি কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থেকে থাকে, তাহলে একদিন এক গ্রহজগত থেকে আর এক গ্রহজগতের মানুষের সঙ্গে মস্তিষ্কের মাধ্যমে যোগাযোগ সাধনের সম্ভাবনাটা একেবারে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় কি?

এই প্রবন্ধের বহু আলোচ্য বিষয় নিয়ে দানিকেন তাঁর গ্রন্থে অবতারণা করেছেন। পৃথিবীর বহু রহস্যের খুব সামান্যই আমরা এ পর্যন্ত সমাধান করতে পেরেছি। তবে বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এক বিপুল অগ্রগতি ঘটছে, সেটাই আশার কথা। এদের দৌলতে বাকি রহস্যগুলোর কিনারা হয়তো একদিন করা সম্ভব হবে।

যুদ্ধ

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

তিন চাকা তো নয়, পঙ্খিরাজের বাচ্চা। হাওয়ায় যেন ডানা ভাসিয়ে উড়ছে। ব্রেকে আঙুল নেই, অথচ বনবন করে আরো কয়েক পাক প্যাডেল মেরে নেয় পাগলা। গতির সঙ্গে নিজেকে ও এক করে মিশিয়ে ফেলে। ওর এই তিন চাকা পঙ্খিরাজ মোটর গাড়ির চেয়ে কম যায় কিসে! মাস চারেক আগের কেনা গাড়িখানার মালিকানা সত্ব যদিও ওর নয় তবু কি এসে যায়, দিনের শেষে দুটো করে টাকা ও নেপালবাবুর হাতে গুঁজে দিয়ে আসতে পারলেই ওর কাম ফতে। পাগলা পারলে যেন গাড়িখানাকে চকাৎ করে চুমু খায়। আর সে দৃশ্য যদি কেউ দেখে ফেলে বিন্দুমাত্র লজ্জা নেই পাগলার। এমনভাব করে ও, যেন বউয়ের চেয়েও বেশি প্রয়োজনীয় সঙ্গী হচ্ছে ওর এই তিন চাকা রিকসাখানা।

রাস্তাঘাটে এখন কাকপক্ষীও বসে নেই, ফাঁকা সরল রেখার মতো এই রাস্তার অনেকখানি অবধি ও দেখতে পাচ্ছে। এই ফাঁকা রাস্তায় চালকবিহীন এই রিকসাটাকে ও রেসের ঘোড়ার মতো চালাতে চাইছে। এত রাতে ওর কেরামতি দেখার জন্য একজনও কেউ ছুটে আসবে না, কি আসে যায়! কিচ্ছু পরোয়া নেই ওর, মারো প্যাডেল। রাস্তাটা নির্জন বলেই যেন উত্তেজনা আরো জড়িয়ে ধরেছে ওকে। উত্তেজনায় অনেক আগেই ব্রেক থেকে আঙুল সরিয়ে রেখেছিল, এবার হ্যাণ্ডেল থেকেই হাত দুটো তুলে নিয়ে সার্কাসের দড়ির খেলার মতো একটা ভঙ্গি করে এগোতে লাগল। মনসাতলার মাঠ অবধি এইভাবে পঙ্খিরাজ চালাবে ও, তারপর বাঁ দিকে বাঁক নিয়ে বস্তির দিকে ঢুকতে হবে। রাস্তাটা ওখান থেকেই শুরু হয়েছে গাব্‌বু খোঁড়া। ওখানে এসে আর মর্জি চলবে না, স্লো সাইকেল চালাতে হবে ওকে। কখনো কখনো গাঢ্‌ডায় চাকা আটকে গেলে নিচে নেমে ওকে টানা রিকসার মতো টানতে হবে।

পাগলা প্যাডেলের তালে তাল রেখে হাততালি বাজাতে লাগল। মনটা আজ বেশ খুশি খুশি। কোন কোনদিন আপসে এরকম হয়ে যায়, সোয়ারির পর সোয়ারি। নেপালবাবুর টাকা মিটিয়ে দিয়েও এখন ওর পকেটে সাত টাকা

বত্রিশ। ন' টাকার মতোই থেকে যেত যদিনা ও দুপুরে মাসির দোকানে গরম গরম মাছের ঝোল আর ভাত খেত। বেড়ে রান্না করেছিল মাসি।

সন্ধ্যায় একটু মাল টানার বাসনা জেগেছিল। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লড়াই করে সেটুকু আজ দমিয়ে রেখেছে ও। টাকা পয়সা কিছু কিছু করে এবার থেকে জমাতে হবে। অবশ্য মাল না টানার পেছনে আরো একটা কারণ রয়ে গেছে, ইউনিয়নের গনি কদিন থেকে ওর পিছনে ঘুর ঘুর করছে। মাস দুয়েকের চাঁদা বাকি পড়েছে ওর। একটাকা করে দু মাসের জন্য দু টাকা। অনায়াসেই আজ টাকা দুটো দিয়ে দিতে পারত ও, কিন্তু নেপালবাবুকে গাড়ির ভাড়া দু'টাকা দেওয়ার পর গনির হাতে দু টাকা দিতে বড় গায়ে লাগে। আরো দুটো দিন সময় চাইতে হয়েছে ওকে। সময় চাওয়ার পর আর মালখানায় যাওয়া যায় না, গনির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে ইজ্জত থাকবে না। অগত্যা ও বাড়ির দিকেই ফিরতে শুরু করল।

রিক্সা তো নয় পক্ষিরাজের বাচ্চা। সকাল বেলা ঐ নিয়ে কি যেন একটা ফোড়ন কেটেছিল ডাবু, গাঁক গাঁক করে তেড়ে এনেছিল ও, রিক্সার তুই মর্ম বুঝবি কি বে! এ তোদের সেফটিপিন, ক্লিপ, আর চিরুণী ফেরি করা নয়, পায়ে ঘুঙুর বেঁধে বাঈজিদের মতো ট্রেনে ট্রেনে ঘোরা নয়, এ হচ্ছে আসলি পক্ষিরাজ যেমন চালাব, তেমনি চলবে।

ডাবু হচ্ছে ওরই ভাই। পিঠোপিঠি ভাই। পাল্টা তেড়ে এসেছিল পাগলাকে, বাবুদের পায়ে তেল মেখে তো সাইকেল পেয়েছিস, তাতেই অতো। নিজের পয়সায় যেদিন রিক্সা কিনবি, সেদিন বলবি।

কথাটা যেন মূলে আঘাত করেছিল পাগলাকে। মাথায় একবার রাগ চড়ে গেলে ওর আবার আপন পরের বালাই থাকে না। সাইকেলের পাম্পার ছুঁড়ে মেরেছিল ডাবুকে। ডাবু তৈরি ছিল বলে ওর গায়ে লাগে নি। সরে গিয়ে একটা লাঠি তুলে নিয়েছিল হাতে, আয় শালা, আয়—

ততক্ষণ আবার মাথা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে পাগলার। শান্তভাবে পাম্পারটা কুড়িয়ে আনতে গিয়ে টের পায়, ঘরের ভিতর হাউ মাউ করে চেঁচাতে শুরু করেছে মা। বুড়িটার গলায় যে এত জোর রয়েছে এখনো, ভাবতে কেমন অবাক লাগে ওর। এখনি যেন রাজ্যির লোক জড় করে ফেলতে পারে বুড়ি।

পাগলা পাম্পার হাতে ঘরে ঢুকে পাল্টা চেঁচাল, চোপ ; এখনি তুলে নিয়ে গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসব। কেবল রাত দিন ধরে প্যানপ্যানানি কান্না।

ডাবুও ঘরে ঢুকে শান্ত করার জন্য মার দিকে এগিয়ে যায়।

কাচের গুলির মতো টলটলে চোখ বুড়ির। গাল ঝুলে পড়েছে, মাথায় কাঁচাপাকা মেশানো খড়কে কাঠির মতো চুল। পরণে নোংরা একটা কাপড়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আয়তন কমে এই এতোটুকুন চেহারা।

বুড়ি কাপড়ের খুঁটে কফ টানতে টানতে বলে, তোরা দুজনে মারামারি করবি আর আমি চুপ মেরে বসে বসে দেখব, না?

তাহলে ও আমার ব্যবসা নিয়ে কথা বলে কেন? মায়ের দিকে তাকিয়েই দাঁত ঘষতে ঘষতে বলে ডাবু।

পাগলা পাম্পার দিয়ে পিঠ চুলকায়, তুই আমার সাইকেল নিয়ে কথা বলবি, আর আমি ছেড়ে দেব তোকে। তুই যদি কিছু না বলিস, আমিও বলব না।

একটা সমঝোওতা হয়ে যায় যেন। পাগলার ভারি বয়ে গেছে ওর ব্যবসা পত্তর নিয়ে কথা বলার। মা-টা টিঁকে আছে বলেই সংসারের সুতোটুকু এখনো ছিঁড়ে যায় নি। মা চোখ বুজলেই আলাদা হতে দুদিনের বেশি সময় লাগবে না। তখন শালা স্বাধীন।

চোখে মুখে হুহু করে বাতাসের ঝাপটা লাগছে। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলটা একটু বাঁক ঘুরে যাচ্ছিল, সটাক করে হাত নামিয়ে ও হ্যাণ্ডেল ধরল। প্যাডেল যেন আপনা আপনি ঘুরে যাচ্ছে এখন। পাগলা বুঝতে পারল, প্যাডেলে ওর পা দুটো আপনা আপনি এখন চক্কর খাচ্ছে। বেশ মজা লাগল ওর।

বাড়ি ফিরে গিয়ে হয়ত রোজকার মতো এখন ডাবুকে ঘুমিয়ে থাকতে দেখবে পাগলা। বুড়ি ঠায় বসে থাকবে বিছানায়। যতক্ষণ না দুজনেই বাড়ি ফেরে ঘুম আসবে না বুড়ির। বয়সে বয়সে এমন বেঁধেছে বুড়িকে যে এখন আর ওর নড়াচড়া করার মতোও ক্ষমতা নেই। অথচ মা হওয়ার যা জ্বালা। ছেলে দুটোর জন্যই যেন হাজার বছর পরমায়ুর লোভ রয়ে গেছে বুড়ির।

পাগলা গলির মুখে বাড়ির কাছাকাছি এসে তাই প্রাণের খেয়ালে রোজ হর্ন বাজায়। ডাবু কোনো কোনো দিন বিরক্ত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, শালা পঙ্খিরাজের বাচ্চা আসছে।

ব্যাপারটায় খুব মজা পায় পাগলা। গাড়িটার স্পোকে-চেনে তালা লাগাতে লাগতে গুনগুন করে গান গায়। ভোর না হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ওকে বেরুতে হবে। সকাল দুপুর বিকেল মর্জি মাফিক ও গাড়ি চালায়। যেয়সা খাটুনি তেয়সা পয়সা। ডাবুর ব্যাপার একটু ভিন্ন রকম। ডাবুর বেরুতে বেরুতে

সকাল দশটা। অফিসের বাবুদের মতো ও সেজেগুজে মোড়ের মাথায় এসে একটা পান খায়, বিড়ি ধরায়, তারপর সুবিধা মতো একসময় বাসে উঠে, স্টেশন।

গাড়ির গতিটা একটু কমে এসেছিল, পাগলা এবার ধীরে ধীরেই বার কয়েক প্যাডেল মারল।

দুপুরে কোন কোন দিন বাড়ি ফেরে পাগলা, হাতে সময় থাকলে সাইকেল-টাকে ঘষামাজা করতে বসে যায়। সর্বাঙ্গ ওর জল-ন্যাকড়া দিয়ে ধুয়ে দেয়। চেনের খাঁজে খাঁজে তেল দেয়। বুড়ি মায়ের সঙ্গে ফষ্টি নষ্টি করে কিছুক্ষণ, মাকে বলে, এবার তোকে একটা বায়স্কোপ দেখাব। কবে ফিনিস হয়ে যাবি। শেষটায় একটা বাসনা থেকে যাবে তোর।

বুড়ি মজার চোখ করে হাসে, রোজইতো দেখাচ্ছিস। দেখতে দেখতে চোখ দুটো আমার পচে গেল।

সত্যিকার বায়স্কোপ দেখলে চোখ আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। যা সব নাচ থাকে না এক একটা ছবিতে, মরা মানুষেরও লোম খাড়া!

তোরাই দেখ! আমি কেবল তোদের দুজনের বউ দেখে যেতে পারলেই বাঁচি! পাগলা হাসে, আমার এখনও সময় হয়নি। ডাবুকে বরং দু-একমাসের মধ্যে লাগিয়ে দেওয়া যায় কি না দেখি। হ্যাঁ, ভালো দেখতে শুনতে, এমন একটা মেয়ের সন্ধান পেলে পাগলা উঠে পড়ে লাগবে। শত হোক ডাবু ওর ভাই বইতো নয়। তা ছাড়া সংসারে একটা বউ মানুষ না থাকলে কেমন যেন লক্ষ্মী-ছাড়া দেখায় সব কিছু।

দিন কয়েক আগে ডাবুর কানে কথাটা পেরেছিল ও। ডাবু সলাজ ভঙ্গি করে হেসেছিল, আমায় শালা তোমরা ফাঁসিয়ে দিতে চাইছ।

পাগলা বলেছিল, আমরা তোর গার্জেন। তোর ভালমন্দ আমরা যতখানি বুঝব, বাইরের লোক তা বুঝবে না, শুনে রাখ।

আমি কি তা অস্বীকার করেছি নাকি!

এই থেকেই ডাবুর মনের ভাব ও বুঝে নিয়েছিল। কিন্তু গতকালই দুপুর বেলা ডাবুর সঙ্গে ওর কিছু মন কষাকষি হয়ে গেল। দুপুরে বাড়ি ফিরে সাইকেল নিয়ে ডলাই মলাই শুরু করেছিল পাগলা, হঠাৎ দেখে ডাবু ঝুলতে ঝুলতে হেঁটে আসছে।

কি রে, চলে এলি যে?

এলাম, লাইনে আজ খুব হুজ্জুত হয়ে গেছে।

হুজ্জুত! কি হয়েছে? অবাক হয়ে গিয়েছিল পাগলা।

প্যাসেঞ্জারদের সঙ্গে গোলমাল হয়ে গেছে রেলবাবুদের। টেশন ঘর তছনছ করে দিয়েছে পাবলিক। পুলিশ এসে মারদাঙ্গা থামায়। লাইন বন্ধ হয়ে গেছে।

এবার থেকে ওই ফিরি করা ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সাইকেল ধর। নেপাল-বাবুকে বলে একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। দেব? উপদেশ দেয় পাগলা।

ওসব পঙ্খিরাজ ফঙ্খিরাজ আমার চলবে না। পালটা তেড়ে ওঠে ডাবু, আমাদের ইউনিয়ন আছে। ইউনিয়ন যা বলবে, তাই করব আমরা।

ব্যাস মাথায় চরাৎ করে রক্ত চড়ে গেল ওর। তোদের ঐ দালাল পার্টির আবার ইউনিয়ন।

আমাদেরটা দালাল পার্টি, আর তোদের ঐ সাইকেল রিকসার ইউনিয়নটা কোন পার্টির। টাকা মেরে মেরে তোদের ইউনিয়নের কর্তারা তো ফর্দাফাই করে দিল, তুইইতো মাঝে মাঝে এসে প্যানপ্যানানি গাস।

যা বুঝিস না, তা নিয়ে কথা বলতে আসিস না। জানিস, আমাদের ইউনিয়ন কটা লাইন চালায়। টু ফ্যাঁ করার ক্ষমতা নেই কারো। আগে শালা আমরাইতো দেখেছি মালিকের কি দাপট, আর এখন্। মালিকদের দাপট কে ভেঙেছে, ইউনিয়ন না!

ডাবু বলল, তোদের মাথায় কাঁঠাল ভাঙা হচ্ছে। গড়িয়ে গড়িয়ে যেটুকু রস তোদের মুখে লাগছে, তাই তোরা আহা আহা বলে চেঁচাচ্ছিস।

এরপর আর ঠাণ্ডা থাকা যায় না। কিন্তু অনেক কষ্টে সামলে গিয়েছিল পাগলা। পার্টি ফার্টির ব্যাপারে ডাবুটা যে ভুল পথে চলেছে, তাতে সন্দেহ নেই। দিন এলেই ও বুঝতে পারবে গরীবের পার্টি বলতে কাকে বোঝায়! কেন ও সাইকেল রিকসার ইউনিয়নের হয়ে এত কথা বলে।

অথচ আশ্চর্য! ইউনিয়নের দুমাসের টাকা বাকি পড়ে আছে ওর। দুচার দিনের মধ্যেই টাকাটা মিটিয়ে দেবেও। আজ অনায়াসেই দিতে পারত কিন্তু গা কেমন চরচর করে উঠল ওর। গনিটা বড় ভালো মানুষ। অনায়াসেই চাপ দিয়ে ওর কাছ থেকে টাকা আদায় করে নিতে পারত, নেয় নি। মানুষের সুবিধা অসুবিধার কথা বোঝে বলেই তো ইউনিয়নের একজন পাণ্ডা হতে পেরেছে ও।

পাগলা হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠেছিল। একটা নোংরা কুকুর ওর তিন

চাক্কার মুখোমুখি এসে পড়েছিল, আর একটু হলেই ওর গায়ের উপর চাকা উঠে যেত। ব্রেক চেপে একদিকে ও সাইকেলের মুখটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে এ্যাকসিডেণ্ট থেকে কুকুরটাকে বাঁচাল।

বুকটা ভীষণভাবে ধরাস ধরাস করে উঠেছিল ওর। সাইকেলটাকে এবার ধীরে ধীরে চালাতে লাগল। সামনেই মনসাতলার ফাঁকা মাঠ দেখা যাচ্ছে। মাঠের বাঁ পাশ দিয়ে বাঁক ফিরে ওকে সাইকেল চালাতে হবে। বাঁক থেকে ওদের বাড়ি মিনিট পাঁচ-সাতের ব্যাপার। বাঁকের মুখেই শিবদাসের খাটাল, তারপরই ঘিঞ্জি বস্তি। মাঝে মাঝে দু'একখানা পাকা দোতলা তেতলা বাড়ি।

সাইকেলে বসেই এবার একটা বিড়ি ধরাবার চেষ্টা করল পাগলা। বাতাসে দুটো দেশলাই কাঠি খরচ হয়ে গেল। ফলে সাইকেল থামিয়ে বিড়িটাকে ধরিয়ে নিল। আরো ধীরে ধীরে এবার সাইকেল চালাতে শুরু করল। মনসাতলার মোড়ে এসে দেখল বস্তির দিকে দুজন চারজন লোককে তবু দেখা যাচ্ছে। মোড় থেকে অনেকটা দূর ভিতর অবদি ইলেকট্রিক হয়েছে আজকাল, কিন্তু দুটো একটা তার জ্বলে, বাকিগুলো কদাচিৎ জ্বলতে দেখে ও।

ডাবুটার লাইনে আজকেও কাজ-কারবার হয়েছে কিনা কে জানে। মাসের মধ্যে বেশির ভাগ দিনই রেল লাইনে হুজ্জুতি। আজও যে হুজ্জুতি হয় নি কে বলবে! আজ আর একবার বলে দেখতে হবে ওকে লাইন পালটিয়ে রিকসা ফিক্‌সা চালাবে কিনা। যদি চালায় এক কথায় ও রিকসা জোগাড় করে দিতে পারে ডাবুকে। সবচেয়ে বড় কথা ওর ঐ দালাল পার্টির খপ্পর থেকে ডাবুকে সরিয়ে আনতে পারে পাগলা। পার্টিই যদি করবি তবে শালা ওদিকে কেন, এদিকে আয়।

মনসাতলার মুখে এসে পড়ল পাগলা। সাইকেলের পিছনের চাকা এবার ঘটাং ঘটাং করে লাফাতে শুরু করল। সাবধানে, চোট বাঁচিয়ে সাইকেল চালাতে শুরু করল ও। খাটালের পাশে বারো মাসই অন্ধকার জমে থাকে। কিন্তু রাস্তাটা ওর এমনই চেনা যে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছুই যেন ও দেখতে পায়। ঘন ঘন বেশ কয়েকবার ও হর্ন বাজাল। রাতের নির্জনতায় এই হর্নের শব্দ যেন শাঁখের মতো শুনতে বেশ লাগে পাগলার।

খাটাল ছাড়িয়ে ও মিত্তিরদের পাকা বাড়ির পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। ওপাশে গলির দিকটায় চার পাঁচটা লোককে দেখে কেমন যেন সন্দেহ হলো ওর। করে কি শালারা! এত রাতে!

অথচ ব্রেক কসে একেবারে দাঁড়িয়ে পড়তেও সাহস পায় না। দিনকাল বড় সুবিধে নয় আজকাল। খুব ধীরেধীরে এগোতে এগোতেই ও দেখতে পায়, লোকগুলি দেওয়ালে জেবড়ে বুরুশ বুলিয়ে পোস্টার লিখছে। কারা ওরা, অন্ধকারে ঠিক চিনতে পারে না। কোন পার্টির। জিজ্ঞেস করতেও সাহস হলো না ওর।

হঠাৎ একজনকে ও চিনতে পারল। চেনার সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠল। ডাবু, শেষ পর্যন্ত কিনা ডাবুটাই!

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দাঁতে দাঁত ঘসতে ঘসতে পাগলা এগিয়ে গেল। মেজাজটাই শালা টং হয়ে গেল এতক্ষণে। বাড়ির দাওয়ায় এসে পৌছতে বেশিক্ষণ ওর সময় লাগল না। আজ আর বাড়ির উঠোনে সাইকেল ঢুকিয়ে পঁ পঁ করে হর্ন বাজাল না ও। অথচ হর্ন না বাজালেও ও শুনতে পেল ঘরের ভিতর থেকে মা বিড়বিড় করছে, পাগলা, এলি বাপ।

পাগলা সাইকেলে তালা লাগিয়ে মার কাছে এসে দাঁড়াল! ডাবু কোথায়? ও কতক্ষণ হলো বাইরে গেছে। বন্ধুরা সব ডাকাডাকি করে নিয়ে গেছে। কেন? ভীষণ রূঢ় শোনাচ্ছে পাগলার গলা।

মা কেমন শিউরে উঠে ছেলের দিকে তাকাল, কেন কি! বন্ধুরা ডাকল, যাবে না। দেশ উদ্ধার করতে গেছে তোমার ছেলে। পাগলা রাগে যেন জ্বলছিল। পই পই করে ওকে বারন করেছি দালাল পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখবি না। তবু যদি কথা শোনে আমাদের।

পাগলা আর দাঁড়াল না। হ্যারিকেন জ্বালিয়ে বেড়ার গায় ঝুলিয়ে দিল। তারপর দুপদাপ পা ফেলে কুয়োতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসে ঢাকা ভাত নিয়ে খেতে বসল।

মা বলল, তোরা সব সময় মতো টাকা পয়সা দিবি না, আজ ভেবেছিলাম, ডালনা রাঁধব। কপালে নেই শুধু ডাল দিয়েই খা।

পাগলা কোন কথা বলল না। বুকের ভিতরটা জ্বলছিল ওর। ভীষণ একটা আক্ষেপ হচ্ছিল ওর ডাবুর জন্য। ডাবু ভুল পথে যাচ্ছে। আর বেশিদূর এগোতে দেওয়া উচিত নয় ওকে। এখনি ওর পাখা ছিঁড়ে না নিলে ও মরবে। নির্ঘাৎ মরবে।

অথচ আশ্চর্য, পাগলা নিজেও তেমন পার্টি করে না। যেটুকু ওর পার্টির সঙ্গে যোগ সেটুকু ও বুঝে শুনে সাচ্চা পার্টির সঙ্গেই রেখেছে। বড় বড় গাল ভরা হয়ত কথা বলতে পারবে না ও। তবু—

দলা পাকিয়ে পাকিয়ে মুখের মধ্যে ও ভাত গুঁজে দিচ্ছিল। এমন সময়, হঠাৎ ডাবুকে ও ঘরে ঢুকতে দেখল। খবরদার, ঘরে ঢুকবি না বলছি। পাগলা

ভাত মুখেই চেঁচিয়ে উঠল।

ডাবু চমকে উঠেছিল, মানে!

পার্টি ফার্টি করবি তো এ ঘরে ঠাঁই নেই। বেরিয়ে যা।

তুই পার্টি করিস না? এবার পালটা চেঁচিয়ে উঠল ডাবু।

আলবাত করি। তোর মত দালাল পার্টি না। দালাল পার্টির হয়ে তুই পোস্টার মারতে গেছিস।

কে কাকে দালাল পার্টি বলে! ডাবু তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বিছানায় গিয়ে গড়িয়ে পড়ল।

পাগলা এমনিতেই কিছুটা রগচটা। এ ঘটনার পর নিজেকে আর ঠাণ্ডা রাখতে পারল না। ভাতের থালা সমেত ধাঁই করে ডাবুর দিকে ছুঁড়ে মারল পাগলা।

মুহূর্তের মধ্যেই কি যেন সব ঘটে গেল। যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল ডাবু। থালার কানা লেগে ওর ঘাড়ের কাছ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে শুরু করল। রক্ত। দু'হাত মাখামাখি হয়ে গেল রক্তে। টলতে-টলতে ডাবু উঠে দাঁড়াল, তারপর ঘরের কোণা থেকে কাটারি তুলে নিল, আয় শালা—হিম্মত থাকে, আয়।

কাজটা যে আদৌ ভালো করেনি এতক্ষণে বুঝতে পারল পাগলা। কিন্তু ডাবুটা যে রকম ক্ষেপেছে ওর গলায় কোপও বসিয়ে দিতে পারে। আত্মরক্ষার জন্য ও তড়িৎ বেগে ঢালের মতো একটা বেতের ঝুড়ি আগলে ধরল। খবরদার বলছি। দা ফেলে দে ডাবু। দা ফেলে দে।

ডাবুর পা টলছে। সারা পিঠ বোধ হয় রক্তে ভেসে যাচ্ছে ওর। অথচ কাটারিটা ওর হাতে এখন পরশুরামের কুঠারের মতো আটকে গেছে। মরতে হয়তো শালা তোকেই নিয়ে মরব।

হঠাৎ বাঘের মতো। ডাবুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল পাগলা। কালো দুটো লোহার পাথরের মতো দেহ, রক্তে পিছলে-পিছলে যাচ্ছে। ষাঁড়ের মতো শব্দ করে শ্বাস টানছে যেন দুটো বুনো জন্তু। পায়ের ধাক্কায় জলের কলসী উলটে গেল। মাটির উনোনটা পাগলার মাথার গুতোয় একপাশ ভেঙে পড়ল। পাগলার গলার পাশে দাঁত বসিয়ে ধরেছে ডাবু। পেটের দিকটা দড়াম করে চাড় খেয়ে উলটে গেল। দরজা ডিঙিয়ে দেহ দুটো ছিটকে বেরিয়ে পড়ল বাইরে। দরজার আড়ালে চলে গেল ওরা।

ঘরের দিকে এখন আর তাকান যায় না। আশ্চর্য, বুড়িটার চোখ দুটো অমন দেখাচ্ছে কেন! একদম শাদা। কিন্তু মুখের লোল চামড়া ঘন-ঘন উঠছে, পড়ছে; যেন প্রাণপণে চিৎকার করছে বুড়ি। অথচ কেউ শুনতে পাচ্ছে না। কেউ না, কেউ না, কেউ না।

আলোয় শুধু

মিহির সেন

মাঝে ক'দিন বন্ধ ছিল। আজ আবার সন্ধ্যার পর ঝিলটার কোণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ এসে সবাইকে সচকিত করে তুলল।

উৎকণ্ঠিত মুখগুলো জানলার শিকে ঝুঁকে অন্ধকার ঝিলটার দিকে তাকিয়ে থাকল।

রেল লাইনের ওপারেই ঝিলটা। এখন বর্ষার কচুরিপানায় দূর থেকে দেখে মাঠ মনে হয়। আশে পাশে ঝোপঝাড়। ঝিলটার ওপারে জবর-দখল বিরাট কলোনী। এপারে নতুন গড়ে ওঠা বসতি। আগে নিচু জমিই ছিল, এখন ভরাট হয়ে অনেক বাড়ি উঠে গেছে। আগে দাম অনেক কম ছিল। সামান্য সঞ্চয় বা ধার করা টাকায় মধ্যবিত্তরাই প্রথম এসে উঠেছিল তাই। এখন দাম আকাশ ছোঁয়া। অভিজাতরাও নজর ফিরিয়েছে এদিকে। সম্প্রতি দু'এক বছর হলো খ্যাতনামা এক শিল্পপতিও প্রায় প্রাসাদ তুল্য এক আবাস গড়েছেন। এ-পল্লীতে বাড়িটি এখনও বেমানান। কিন্তু আশেপাশে এখন নতুন ক'টি বাড়ির ভিত উঠছে, যেগুলো উঠে গেলে আর বেমানান মনে হবে না। তখন হয়তো ও-গুলোর পাশে পুরোন পল্লীটাকেই বেমানান প্রাচীন মনে হবে।

প্রথম আর্তনাদের পর ক্ষণিক বিরতি। উৎকণ্ঠিত মুখগুলোকে আবার ঘরে ফিরিয়ে এনেছিল। কিন্তু উপর্যুপরি কতগুলো বোমার শব্দে আবার আৎকে ওঠে সবাই।

গোটা ঝিলটা জুড়েই যেন তাণ্ডব চলছে। হৈচৈ, চিৎকার, আর্তনাদ, বোমার শব্দ, পাইপ গানের গুলির শব্দ।

নিয়মিত অভ্যেস বশে মুহূর্তে সমস্ত বাড়িগুলোর দরজা জানালা শব্দ করে বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল। অন্ধকার হয়ে গেল গোটা রাস্তা। মোড়ের পানের দোকানের ঝাপ বন্ধ হয়ে গেল। কোণের মুচির দোকানটার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চোখের নিমেষে রেল লাইন ঘেঁষে বসা কাচা শাক-শব্জির সান্ধ্য-বাজারটা উঠে গেল যেন।

পাড়ার রাস্তাটা দিয়ে এক ঝাঁক উত্তেজিত পায়ের ছুটে যাবার শব্দ শোনা গেল।

গোটা পাড়া উৎকণ্ঠায়, আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছে। আসন্ন একটা আক্রমণের আশঙ্কায় ঘরে বসে কাঁপছে সবাই। প্রতিবাদের উপায় নেই। প্রতিরোধের শক্তি নেই। বিপদটা যদি এসেই পড়ে। গোটা তল্লাট জুড়ে আসবে। কারণ লড়াইটাও এ-তল্লাটের সঙ্গে ও-তল্লাটের। যুদ্ধের মতই। বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি এখানে বিচার্য নয়।

প্রায় ঘণ্টাখানেক অন্ধকার ঝিলটা রণক্ষেত্র হয়ে থাকল। এতবড় সংঘর্ষ এই তল্লাটে এই প্রথম। অন্তত সাম্প্রতিক কালের ভেতর। এদিকের দুটি ছেলেকে নাকি কাল থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তারই জের কিনা কে জানে।

সুষমা আজ সকাল থেকেই কেমন যেন বাতাসে বিপদের গন্ধ পাচ্ছিলেন। ছেলেগুলোর চলাফেরা, কথাবার্তায় কিসের যেন একটা চাপা প্রস্তুতি চলছিল। তপুর কাছেও দুচারজন বন্ধু এসেছিল। ওর জ্বর হয়েছে শুনে নাকি দেখতে এসেছে। কিন্তু ওরা যাবার পর ছেলের চোখের দিকে তাকিয়ে অশুভ একটা আশঙ্কায় বুক কেঁপে উঠেছিল সুষমার।

সত্যি জবাব পাবেন না জেনেও জিজ্ঞেস করেছিলেন, ওরা কি বলে গেল রে?

তপু চোখ সরিয়ে নিয়ে শুকনো জবাব দিয়েছিল, অসুখ, তাই সাবধানে থাকতে।

সুষমা তবু একবার জিজ্ঞেস করলেন, শুধু তাই?

তপু মার চোখে চোখ রেখে বলল, যদি গোপন কিছুও বলে গিয়ে থাকে, সেটাতো গোপন রাখার জন্যই বলে গেছে। সব কথা জানবার এত আগ্রহ কেন তোমাদের?

ওর জবাবের চাপা বিরক্তি ও ধমকের সুরে মনে আঘাত পেয়েছিলেন সুষমা। নিঃশব্দে ফিরে এসেছিলেন। তপুটা যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। ওর বয়সে অপুও তো রাজনীতি করত। পুলিশের লাঠিগুলির সামনেও পড়েছে কতবার। জেল খেটেছে। কিন্তু অপুকে সুষমা পুরো বুঝতে পারতেন। সাধারণ কৃষক মজুরদের জন্য ওদের দরদে অনেক সময় ভাবাবেগ বা উচ্ছ্বাস থাকলেও, ওদের পথটাকে পুরো বুঝতে পারতেন। নিজের মতবাদ নিয়ে বাবার সঙ্গে তুমুল তর্ক করত। কিন্তু শ্রদ্ধাও করত। অথচ তপুটাকে দেখে মাঝেমাঝে সন্দেহ হয় সুষমার, পারিবারিক বন্ধনগুলোকে কি ওরা পুরো অস্বীকার

করতে চায় ?

বেশ কিছুক্ষণ হয় ওদিক থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না দেখে সুষমা সন্তর্পনে এবার রান্নাঘরের জানলাটা একটু ফাঁক করেন। দোতলার এই কোণটা থেকে ঝিলটা প্রায় পুরোই দেখা যায়। পাশের প্লটটায় বাড়ি উঠে গেলে আর দেখা যাবে না।

আবেগে, উত্তেজনায়, উৎকণ্ঠায় বুকের ভেতর কি যেন একটা দলা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে সুষমার। হাত কাঁপছে। সমস্ত দেহটা শিথিল হয়ে আসছে।

এত দূর থেকে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। ঝোপঝাড়ে অন্ধকারে থমথম করছে ঝিলটা। কোন জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। নিঃশব্দ, নিস্পন্দ একটা বধ্যভূমির মতো পড়ে আছে জমাট অন্ধকারটা। কে বলবে। একটু আগেই ওটা ছিল এক কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গন।

ওদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে বুকটা হু-হু করে ওঠে সুষমার। কতজন মায়ের বুক খালি হলো কে জানে। এমনিতেই কিছুদিন হয় এক অভিশপ্ত বধ্যভূমি হয়ে উঠেছে জায়গাটা। প্রায় রোজই একটা-দুটো করে সদ্য নিহত বা বিকৃত মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় ওখানে। কিন্তু আজ আর গুপ্তহত্যা নয়, সম্মুখ সংঘর্ষ হয়ে গেল দু'দলের। কিন্তু আশ্চর্য, একটা লোকও তো এগিয়ে যায় না ওদের বাধা দিতে। ছেলেগুলোকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে মিটমাট করে দিতে। মানুষগুলো কি সব আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে? না, প্রাগৈতিহাসিক আপন স্বার্থবিদ্ধ পশু হয়ে গেছে? নিজের জীবনটাই যেখানে একমাত্র বিচার্য!

হঠাৎ ছুটতে-ছুটতে দীপা এসে রান্নাঘরে ঢুকল।

—মা, দাদা কোথায়?

চমকে ফিরে তাকান সুষমা। কেন, ঘরে নেই?

—না তো?

দীপার মুখ ফ্যাকাসে। গলা কাঁপছে কথা বলতে।

সুষমা ছুটে গেলেন তপুর ঘরের দিকে। বিছানা খালি। বাকি ঘর দুটোতেও নেই। হঠাৎ কি যেন ভেবে ছুটে নিচের তলায় এলেন সুষমা। যা ভেবেছিলেন, তাই। সদর দরজার খিল খোলা।

ততক্ষণে অন্য ভাড়াটেরাও ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুষমা প্রায় কান্নার সুরে জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা কেউ তপুকে বাইরে যেতে দেখেছেন?

কারো পক্ষেই সঠিক জবাব দেওয়া সম্ভব হলো না। আতঙ্কে সবাই তখন

যার যার বন্ধ ঘরে। নিজের সন্তানদের আগলাচ্ছে। তাছাড়া, তপুর উপস্থিতিই এ বাড়ির সবার কাছে এক অনুচ্চারিত আতঙ্ক। ওর জন্যই বিরুদ্ধ পক্ষর কাছে এ বাড়িটাও আজ চিহ্নিত।

সুষমা আবার ওপরে ছুটে গেলেন। তপুর বাবা এখনও বাড়ি ফেরেননি। অথবা, এ গোলমালের জন্যই ফিরতে পারেননি। কি করবেন বুঝতে পারছেন না সুষমা। দীপা বিছানায় ভেঙে পড়ে কাঁদছে। ছোট ভাই বোন দুটোও আতঙ্কে বোবা হয়ে টেবিলের কোণে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পরামর্শ করার কেউ নেই। নিজেও যেন সব কিছু গুছিয়ে ভাবতে পারছেন না। হাত-পা-গুলো কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে। অথচ এ অবস্থায় ঘরেও বসে থাকা যায় না। সম্ভব নয়। বারে বারে চোখের সামনে ভেসে উঠছে অন্ধকার ঝিলটা। জ্বর গায়ে ছেলেটা যে কোথায় ছুটে গিয়েছে, সুষমা জানেন তা।

—লণ্ঠনটা কোথায় ?

দীপা আস্তে মাথা তোলে। মাঝে বেশ কদিন ইলেক্‌ট্রিক সাপ্লাই বন্ধ না হওয়ায় লণ্ঠনটা কে কোথায় রেখেছে কে জানে। কিন্তু হঠাৎ মা লণ্ঠনটা খুঁজছে, কেন বোঝেনা দীপা। আস্তে জিজ্ঞেস করে, কেন ?

স্থির কণ্ঠে বলেন সুষমা, খুঁজে দেখে আসি।

ভয় পায় দীপা। গোটা তল্লাট যেখানে আতঙ্কে ঘর বন্দী, মা একা একজন মেয়েলোক সেখানে কোথায় খুঁজবে দাদাকে। কি করে খুঁজবে। অন্ধকারে ওৎপাতা আততায়ী ওখানে প্রতিটি ঝোপের আড়ালে। জীঘাংসা ওখানে নারী পুরুষ ভেদ মানে না।

কিন্তু কোন নিষেধ শুনলেন না সুষমা। লণ্ঠনটা খুঁজতে খুঁজতে অকম্পিত স্বরে বললেন, মা হলে বুঝতি কেন যাচ্ছি। পুরুষগুলো সব ক্লীব, পশু হয়ে গেলেও মায়েরা সন্তানের এই বিপদে চুপ করে থাকতে পারে না। আমার মন বলছে, তপু ওখানেই গেছে।

একটু বাদেই অন্ধকার নির্জন ঝিলটায় পাড়ে ক্ষীণ একটা লণ্ঠনের আলোকে সন্তর্পনে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল। কি যেন খুঁজছে কে। মাঝেমাঝে থেমে কি যেন দেখে নিচ্ছে। তারপর আবার এগোচ্ছে। নিরন্ধ্র নিঃশব্দ অন্ধকারে একটা ভৌতিক আলোর বিন্দু ভেসে বেড়াচ্ছে যেন।

একটা ঝোপের আড়াল থেকে একটা হাত বেরিয়ে থাকতে দেখে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন সুষমা। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটি কিশোর দেহ। মাথা রক্তে জবজব করছে। পিঠের ওপর আমূল-বিদ্ধ বড় একটা ছোরা।

না, তপু না। তবু সেখান থেকে নড়তে পারছেন না সুষমা। বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। চোখের সামনে যেন আপন সন্তানই অসহায় মৃত্যুর ওপর মুখ থুবড়ে পড়ে আছে।

তপুর মুখই আবার সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল সুষমাকে। অন্ধকারকে খোবলাতে-খোবলাতে ক্ষীণ আলোর বৃত্তটা সুষমার পায়ে-পায়ে এগিয়ে চলল। ঝোপ ঝাড়গুলোর আড়াল খুঁজে বেড়াতে লাগল। এখানে-ওখানে বোমার পোড়া কাগজ, চাকু, ভোজালি, জামার টুকরো, বিক্ষিপ্ত জুতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। মাঝেমাঝে এখানে-ওখানে রক্তের ধারা, রক্তমাখা জল।

স্মৃতিভ্রষ্টের মতো সেই অন্ধকারে তপুকে খুঁজে বেড়াতে থাকেন সুষমা। কতক্ষণ থেকে খুঁজে ফিরছেন ভুলে গেছেন। যেন কোন অনাদি অতীত কাল থেকে এভাবেই আপন সন্তানকে সন্ধান করে ফিরছেন। নিজের অস্তিত্বের একখণ্ডাংশের অনুসন্ধানে এ যেন এক অন্তহীন যাত্রা।

ঝিলটার পূবকোণে একটা উঁচু মাটির ঢিপি ছিল। খুঁজতে-খুঁজতে সেটার কোণ কেটে ওপারে যেতেই হঠাৎ থমকে দাঁড়ালেন সুষমা একটা স্তিমিত টর্চের আলো ওকে দেখেই যেন হঠাৎ নিভে গেল।

অজান্তেই অস্ফুটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, কে ?

জবাবে একটা সবিস্ময় শব্দ গড়িয়ে এল সামনে থেকে, ঠাকুরঝি !

ব্যাটারি ফুরিয়ে আসা ফ্যাকাসে টর্চের ফোকাসটা আবার সামনে ছড়িয়ে পড়ল। সেটায় পা রেখে-রেখে ক্লান্ত পায়ে এগিয়ে এলেন প্রায় সমবয়স্কা বৌদি।

বিষণ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন সুষমা, খোকনকে খুজছ ?

বৌদি সামনে এসে দাঁড়ালেন। ভাঙা গলায় বললেন, হ্যাঁ। আমি জানতাম, একদিন এরকম একটা সর্বনাশ না ঘটিয়ে ও ছাড়বে না। তুমি তো জান ঠাকুরঝি পর-পর দুটো ছেলে মারা যাওয়ায় ওকে কিভাবে আগলে রেখে বড় করে ছিলাম। চির রুগ্ন ছেলেটাকে কিভাবে ধুয়ে-ধুয়ে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম।

আক্ষেপের সুরে বলেন সুষমা, যেন মরণ নেশায় পেয়েছে ছেলেগুলোকে। কেন যে মরছে, কেন যে মারছে, কিছুই বুঝছি না।

বৌদি আলগাভাবে বললেন, কিন্তু খোকনদের লড়তে হচ্ছে আত্মরক্ষার

জন্য। তোমাদের ওদিকের ছেলেরা ওদের দেখলেই খুন করছিল।

সুষমার জবাবে ক্ষীণ প্রতিবাদ ফোটে, তা কেন বৌদি। আমাদের পাড়ায় ছেলেরাই তো বরং রেল লাইনের ওপারে যেতে পারে না। কাল তপুদের তুতিন জন বন্ধুকে তোমাদের পাড়ার ছেলেরা ধরে নিয়ে যাওয়াতেই তো আজকের এই হাঙ্গামা।

বৌদি দৃঢ়স্বরে বললেন, কিন্তু গত সপ্তাহে তপুদের দলের হাতে খোকনদের দলের তুটো ছেলে খুন হয়নি? রাগের মাথায় তার বদলা নিতে চেষ্টা করেছিল বোধহয় ওরা। ওরাও তো বয়সের ছেলে। রক্ত গরম।

সুষমা তিক্ত স্বরে বললেন, কিন্তু এসব যারা করছে তারা রক্ত গরমের জন্য করছে না বৌদি, ঠাণ্ডা মাথাতেই করছে। এরা চিরদিনের গুণ্ডা বদমাইস, এখন সুযোগ বুঝে রাজনৈতিক দলের ভেতর ভিড়ে পড়েছে।

বৌদি বোঝেন, খোকনদের দলের কথাই ইঙ্গিতে বলছে সুষমা। অথচ খোকনরাই সবসময় এই একই অভিযোগ করে তপুদের দলের বিরুদ্ধে। নিজের ছেলে বলেই ওদিকটা দেখতে চায় না সুষমা।

আস্তে বলেন বৌদি, ঠিক একই অভিযোগ তো খোকনদেরও তপুদের দলের বিরুদ্ধে।

কোনো জবাব দেন না সুষমা কথাটা পুরো অস্বীকার করতে পারেন না বলে। সব দলের ভেতরেই আজকাল এমন কিছু ছেলে ছোকরা চোখে পড়ে যাদের দেখে ভাল লাগে না। ভরসা করা যায় না। রাজনীতি না বুঝলেও, এক সময় রাজনীতির জন্য আত্মবিসর্জন দিতে আসা যে সব ছেলেদের দেখে মনে-মনে সমীহ করতেন, শ্রদ্ধা করতেন, এ-মুখগুলোর সঙ্গে সে-সব মুখের মিল খুঁজে পান না। এমন কি তপু, খোকন, ওদের মুখের সঙ্গেও মেলে না যেন এই মুখগুলো।

নাম তুটো একসঙ্গে মনে পড়ায় সেই পুরোন দিনগুলোর কথা মনে পড়ে সুষমার। দেশ ছেড়ে সর্বসান্ত উদ্বাস্তু হয়ে যখন একই সঙ্গে সব এখানে এসে উঠলেন, তপু খোকন তখন কতটুকু! কিন্তু কী ভাব ছিল তুজনের! সবাই দেখে আমোদ পেত। হাসাহাসি করত। পুতুলের মতো খেলত ওদের নিয়ে।

রেল লাইনের ওপারের জবর দখল কলোনীতেও একই সঙ্গে থাকত সবাই, একান্নবর্তী পরিবার গড়ে। তপু, খোকন তখন আরো বড় হয়েছে। এক সঙ্গে গলাগলি ধরে বগলে স্লেট বই নিয়ে স্কুলে যেত তুজনে। একদিন তুজনেই সারা গায়ে কাদা মেখে জামা-প্যাণ্ট ছিঁড়ে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি এসে উপস্থিত।

তপুকে নাকি ক্লাসের একটা গুণ্ডা-প্রকৃতির ছেলে মেরেছিল, তাই খোকন গিয়ে ঝাপিয়ে পড়েছিল। দুই ভাই একই সঙ্গে মার খেয়ে ফিরে এসেছে।

এমন কি কয়েক বছর আগের সেদিনটার কথাও মনে পড়ে সুষমার। সবে তখন নিজেদের ছোট্ট একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় তুলে এপারে উঠে এসেছেন।

তপু, খোকন দুজনেই কলেজে পড়ে। অপু রাজনীতি ছেড়ে দিলেও এক সময় ওর কাছ থেকেই পাঠ নেওয়া দুই ভাই তখন একই দলে। খোকনকে পুলিশের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য নিজের মাথা ফাটিয়ে এসে হাজির তপু।

অথচ কোনখান দিয়ে যে কি হয়ে গেল, আজ তপুর মামাবাড়ি আসা বন্ধ। খোকনের পিসিবাড়ি। শুধু তাই নয়, দুভাই আজ রেল লাইনের দুপারে অতন্দ্র সশস্ত্র প্রহরী, একজনের ছায়া যেন আর একজনের তল্লাটে না পড়ে।

—ওখানে কি একটা পড়ে আছে না ?

বৌদির কথায় আবার চেতনায় ফেরেন সুষমা। ঝিলের জল ছুঁয়ে কালো মত কি যেন একটা পড়ে আছে। উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে ওঠা স্তিমিত লণ্ঠনের আলোর বৃত্তটা দুজনকে টেনে নিয়ে যায়।

না, মানুষ না। একটা পচা কলাগাছের ডুম। দুজনে নিঃশব্দে আবার সামনের দিকে এগিয়ে যান।

ঝিলের দুপাশের গোটা বসতি এখনও অন্ধকারে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। কেউ আলো জ্বালাতে সাহস পাচ্ছে না। দরজা খুলে এগিয়ে আসতে সাহস পাচ্ছে না। বোবা যন্ত্রণায় ঘরে-ঘরে সেই একই অসহায় প্রার্থনা গুমরে মরছে, ঈশ্বর, আমার কোল যেন খালি না হয় !

তারই ভেতর থেকে মাত্র দুটি অসহ্য যন্ত্রণা, উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক কখন যেন ছুটে বেরিয়ে এসেছিল। অশরীরী দুটো ছায়ার মতো অন্ধকারের বুক চিরে-চিরে খুজে বেড়াচ্ছিল তাদের হারানো হৃদ্‌পিণ্ড। একই যন্ত্রণার সূত্রে বাঁধা পড়া একটি একক সত্তার মত।

প্রতিটি মৃতদেহে আপন সন্তানের মুখের আদল খুঁজে বেড়াচ্ছিল সত্তাটি। দেহের খণ্ডিতাংশে আপন অস্তিত্বের অনুসন্ধান করছিল। অন্ধকার থেকে একদিন যাদের আলোর উৎসবে এনেছিল, মৃত-আলো অতল অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিল তাদের।

একসময় ক্লান্তস্বর শোনা গেল সুষমার। যেন নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন।

—অথচ ওদের দুজনেরই তো স্বপ্ন ছিল অন্যের সুখ। জীবনের অটুট স্বস্তি।

—হ্যাঁ। নিজেদের জীবনের বিনিময়ে ওরা দুজনেই গরীবের মঙ্গল চেয়েছিল।

—শ্রমিক-কৃষকের দুঃখের কথা, শোষণের কথা বলতে-বলতে চোখে জল আসত তপুর। —আর, শোষণবাদের কথা বলতে বলতে ঘৃণায়, ক্রোধে চোখে আগুন জ্বলত খোকনের।

অথচ একই ক্রোধ, একই দুঃখ তো মানুষকে কাছে টানে বৌদি। তবু কেন ওরা আজ পরস্পরের এমন নিষ্ঠুর শত্রু?

করুণ কণ্ঠে অস্ফুট উচ্চারণ করলেন বৌদি, জানি না, আমরা সাধারণ মানুষ, জটিল রাজনীতি বুঝি না ঠাকুরঝি। কিন্তু আমাদের, গরীবদের যারা মঙ্গল চায় তারা সবাই বেঁচে থাকুক, রাজনীতির কাছ থেকে সেটুকুও কি আমরা চাইতে পারি না?

এ প্রশ্ন সুষমারও। কিন্তু উত্তর দেবার কাউকে হাতের কাছে খুঁজে পান না। পেলেও তাদের ভাষা বোঝেন না।

একই আলোর রেখায় পা রেখে নিঃশব্দে তাই এগিয়ে চলেন আবার দুজনে।

হঠাৎ দূরে একসময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেল।

দুজনেই সচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। লণ্ঠনের শিখাটা একটু কমিয়ে নিলেন সুষমা। কাদের গাড়ি কে জানে? পুলিশেরও হতে পারে। সামনে মাটির একটা ঢিপি থাকায় এত দূর থেকে অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

আচমকা কয়েকটা উপর্যুপরি বোমার শব্দে হতচকিত হয়ে পড়েন সুষমারা। গাড়িটার দিক থেকেই শব্দটা আসছে যেন। আবার কি নতুন করে শুরু হলো হাঙ্গামা!

বৌদি ফিস-ফিস করে বললেন, ঠাকুরঝি, শিগ্‌গির চলে যাও। এখানে আর থাকা উচিত নয়।

সুষমা চাপা আতঙ্কের সঙ্গে বললেন, আর তুমি?

—আমিও অন্ধকারের আড়াল দিয়ে চলে যাচ্ছি।

—না না, তা হয় না। তোমাদের দিক থেকেই শব্দগুলো আসছে মনে হয়।—সুষমার স্বরে ভয়।

বৌদি যেন কি বলতে যাচ্ছিলেন, এবার পরপর কয়েকটা গুলির শব্দ ভেসে এল ওদিক থেকে।

বোমার শব্দে, গুলির শব্দে চিৎকারের মুহূর্তে আবার ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল চারদিক।

সুষমা শক্ত করে হাত চেপে ধরলেন বৌদির। চাপা কাঁপা গলায় বললেন, বৌদি, ওদিকে যেতে পারবে না এখন। আমার সঙ্গে এস!

—কোনদিক আর নিরাপদ নেই ঠাকুরঝি, কোনদিকে যাবে তুমি?—হতাশ হাহাকারের মতো শোনায় বৌদির স্বর।

ক্ষীণ লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার কাঁপিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করেন দুজনে।

পেছনে বিস্ফোরণের শব্দ। চিৎকার। এক রাশ ভারী পায়ের শব্দ যেন এদিকেই ছুটে আসছে।

শাড়িতে পা জড়িয়ে আসছে। চারদিকে নিঃসীম নিরন্ধ্র অন্ধকার। কোন এক প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকার গুহার ভেতর দিয়ে যেন আলোর সন্ধানে ছুটে চলেছে দুটি তাড়িত মানব।

পায়ের শব্দগুলো যেন আরো কাছে এসে পড়েছে। চিৎকার করে কি যেন বলছে ওরা।

মাটির ঢিপিটার কাছে এসে একটা মৃতদেহে হোঁচট খেয়ে সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন সুষমা

বৌদি হাত টেনে ধরেন। তারপর আবার ছুটতে শুরু করেন দুজনে। কার মৃতদেহ পায়ে ঠেলে এলেন, তপু না খোকনের, দেখবার সময় নেই। স্তিমিত, অস্থির।

আচমকা একটা গুলি এসে লণ্ঠনটাকে প্রচণ্ড শব্দে চুরমার করে দিল। দপ্ করে নিভে গেল একমাত্র আলোর শিখাটা। আর মুহূর্তে বিশ্বগ্রাসী নিরন্ধ্র অন্ধকারের অতলে তলিয়ে গেল নিস্প্রাণ এই বধ্যভূমির এতক্ষণের একমাত্র সঞ্চরণশীল ছায়া দুটি।

আর সেই সীমাহীন অন্ধকারের ভেতর দিয়ে ছুটতে-ছুটতে এতক্ষণে, এই প্রথম, অবাক হয়ে লক্ষ্য করলেন সুষমা, এই অন্ধকার সমুদ্রে উজ্জ্বল একটা আলোর দ্বীপের মতো একমাত্র আলোকিত ওঁদের কলোনীর সেই শিল্পপতির প্রাসাদটি। নিরাপদ উচ্চতায় দাঁড়িয়ে ও বাড়ির নিরুদ্বেগ কৌতূহলগুলো একটু ঝুঁকে ঝিলটার অন্ধকার সন্ত্রাসকে নিরীক্ষণ করছে।

স্বপ্নের সানুদেশে

আল মাহমুদ

একদা এক অস্পষ্ট কুয়াশার মধ্যে আমাদের যাত্রা
তারপর দিগন্তে আলোর ঝলকানিতে আমাদের পথ
উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বাতাসে ধানের গন্ধ,
পাখির কাকলিতে মুখরিত অরণ্যানি।
আমাদের সবার হৃদয় নিসর্গের এক অপরূপ ছবি হয়ে
ভাসতে লাগল।

নদী, নদী,
সন্তানেরা উল্লসিত আনন্দের মধ্যে আঙুল তুলে
যে স্পষ্ট জলধারা দেখাল, তা আমাদের প্রাণ।
এই সেই স্রোতস্বিনী, যার নকশায় আমাদের রমণীরা
শাড়ি বোনেন। ঐ সেই বাঁক যার অনুকরণে
আমার বোনেরা বঙ্কিম রেখায় এঁটে দেহ আবৃত করেন।
দেখো সেই পুণ্যতোয়া,
যার কলস্বর আমাদের সঙ্গীতে নিমজ্জিত করে—
দেখো, দেখো।

আমরা যেখানে যাব, সেই বিশাল উপত্যকার ছবি
আমাদের সমস্ত অন্তরকে গ্রাস করে আছে। আমাদের পতাকায়
রূপকথার বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ
আমাদের আশাকে দোলাচ্ছে সোনালি দোলকের মত,
বারবার।

আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
রওনা দিয়েছি। দুঃখ
আমাদের ক্লান্ত করে না।
দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে

মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।
চিৎকার কান্না ও হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে
আমরা বেরিয়ে যাব। মৃত্যু
আমাদের স্পর্শ না করুক।

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেব
বাম দিকে বয়ে যাবে রুপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণতুষিত পর্বত।

জেনারেল সমীপেষু

(ব্রেশ্‌টকে স্মরণে রেখে)

সতীন্দ্রনাথ মৈত্র

জেনারেল, তোমার ট্যাঙ্কগুলো ভারী তেজী
মানুষ মারতে জুড়ি যে নেই ওদের
অথচ তোমার যন্ত্র দানব দেখ
মানুষ না হলে এগোবে না এক পাও।

বোমারু তোমার ভীষণ দক্ষ, জেনারেল
আগুনে নিমেষে পোড়ায় শহর গ্রাম
অথচ দেখ কি বিচিত্র পরিহাস
মানুষ না হলে সেও যে নেহাতই জড়।

তোমার সৈন্যবাহিনীর নাম জগৎজোড়া
বিদ্যুৎ-গতি বাহিনী তোমার জেনারেল,
অথচ মানুষ, মানুষই তারা যে সকলে

মানুষেরই হাতে ভাগ্য তোমার, জেনারেল ॥

সেই শহীদ

সিদ্ধেশ্বর সেন

টান-করে-রাখা
দুই হাতের
তালুতে
আর, খাড়াখাড়ি পায়ের পাতায়

যন্ত্রণাময় সেই প্রতীক-পুরুষ
নেয় শরীরে
আমূল
আজও তীক্ষ্ণ, কঠিন শলাকা

কেবা করে হুঁশ, তারপর
হয়ে গেলে ভুল
হাজারও বছর

আহত ক্ষতের মুখ, খুলে যায়
অনর্গল, অনর্গল
শোণিতের সিক্ততা গড়ায়

বারবার বয়ে নিয়ে যেতে হয়
ক্রুশ
বারবার হেঁচড়ে টেনে ভারী এক ক্রুশ

মরু ও প্রান্তর
জনপদ, শহর, পাঁচ-মহাদেশের উপর, দিয়ে ফের
প্রাচীনের এশিয়ায় —
সমুদ্রস্তনিত এক উত্থিতভূমির, পলিমাটির বাঙলায়

মৃতের রাজ্য থেকে তবু সে-ই ওঠে, নড়ে, বীজের গভীরে
বুঝি হেঁটে চলে যায়—শস্য, ফুল
নীড়ের ভিতরে

যেন শুচিস্নান সেরে, পৌছে-যাওয়া নতুন মানুষ
খোঁজে মুখ ঘরে ঘরে ॥

তোলো মুখ

শংকর চট্টোপাধ্যায়

তোলো মুখ—ছাখো রক্তমাখা হাত তুলে দাঁড়িয়ে মানুষ লোকালয়ে—নারীরা
প্রসবের আগে বাজাচ্ছে বিমূর্ত শঙ্খ—বল্মীকধূলিতে ঢাকা পড়ছে,
চতুর্দিক—হৃদয় নত হয়ে এসেছে পায়ের তলায়—প্রাণে যে পাগল
ছিল আজ সে জেগে উঠেছে—প্রত্যক্ষ এসে প্রবেশ করছে অন্তরে—

তোলো মুখ—তোলো তোমার দণ্ড—প্রথম আঘাত এসে পড়ুক এই
শূন্যপুরাণের পালায়—আগুনের সাপ দাঁড়াক ফণা তুলে—সমস্ত নদী
এনে জড়ো করো বুকের কাছে—চৌদ্দহাত মায়া ঢেকে রাখুক
তোমার অন্তর—মানুষ দৃশ্যমান হয়ে দাঁড়াক আজ দেবতার কাছে—

তোলো মুখ—তোমার বুকের কাছে যা কিছু বেদনা ওকে দাও—
ওকে দাও স্রোত—বল্মীকধূলিতে আজ ঢাকা পড়েছে চতুর্দিক—প্রত্যক্ষ
এসে প্রবেশ করেছে অন্তরে—আগুনের সাপ দাঁড়িয়েছে ফণাতুলে—
আজ তুমি পথে পথে ঘুরে সর্বের জয়ধ্বনি দাও মানুষের—মানুষকে দাও
কষা ও কার্মুক—

সংগ্রহশালা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

'শরীরে বিশ্রাম হোক'
বলে, প্রাণ বাইরে বেরিয়ে
কুড়িয়েছিল অজস্র নীল পাতা, টাটকা স্বাদু ফল,
কুড়িয়েছিল শুদ্ধবাক শঙ্খের কঙ্কাল, সান্ধ্যধ্বনি,
বহু মঞ্জু মানুষীর মুখভাঙা হাসি ও হাসির
উদ্বেল প্রকাশ্য পরিণাম। 'দেখি' বলে প্রসারিত হাত
ছুঁয়ে দেখেছিল ডুবে যাওয়া ঘুমন্ত জাহাজ, মৃত সব পণ্য
যারা আর ব্যবহার্য হবেনা কখনো
হবেনা গন্তব্যে ভাসমান ;
তাদের মিলিত থেরীগাথা
শুনিয়েছিল দুর্ঘটনার গল্প, ঝড়ের প্রকৃত ইতিহাস।

এখন সকালবেলা স্বপ্নভাঙা চোখে
ঘন পিঁচুলির মতো লেগে আছে বিষাদ, দুচোখ
ভাল করে খুলে তাকাতে পারছিনা, তবু
অনুভব করছি কামরাঙা গাছের নিচে অপ্রাপ্তবয়স্ক রোদে
সভা শুরু হয়ে গেছে এক-হতে-জানা বাবুই, শালিখ, বনটিয়ার ;
আলোচ্য বিষয়, মর মানুষের ভূমধ্যশরীর।

বাঙলার চাষী—১৯৭১

মহবুব আনোয়ার

অনড় থামের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছি বহুকাল
কত ঝড়-বন্যা-মৃত্যু নেচে গেল চোখের উপরে,
অনেকে তলিয়ে গেল সময়ের ক্রুর গহ্বরে,
আমাকে পারেনি ছুঁতে আকালের ব্যাদান বিশাল।
কত ঘর ভেঙে গেল—মন্বন্তরে,—বন্যার আঘাতে
ঘূর্ণিতে হারাল দিশা বড় বড় দানব জাহাজ,

সাবধানী কাণ্ডারীও এড়াতে পারেনি মৃত্যুবাজ,
অনেক বীরের কেল্লা বিলুণ্ঠিত হয়েছে হানাতে।

পাঠানের তলোয়ার মোগলের উদ্ধত শক্তিতে
পারেনি নোয়াতে এই শ্যামল কোমল দেহখানি,
পারেনি ইংরেজ বর্গী দীনের কুটির কেড়ে নিতে,
স্বদেশী বিদেশী দস্যু যতই করুক টানাটানি
বাঙলার কৃষক আমি রব অবিচল কাস্তে হাতে
কাউকে দেব না পথ ফসলের মাঠে ও গোলাতে।

প্রতিরোধ আজ

সুমিত চক্রবর্তী

প্রতিরোধ আজ—দুর্মর হাতে প্রাণ
অভ্র আকরে ঋজু রৌদ্রের গান
গতায়ু দিনের অশ্রুর অবসান।

প্রতিরোধ আজ—অনুকম্পার ঋণ
মুছে ফেলে প্রিয় দুর্বার সঙ্গীন
গ্রানিট শপথ দুর্জয় প্রতিদিন।

প্রতিরোধ আজ—নখাগ্রে কাঁপে ঘৃণা
জারী মৃত্যুর গ্রেপ্তারী পরোয়ানা
গণচেতনার বিচারের ব্যঞ্জনা।

প্রতিরোধ আজ—বুকে দুর্জ্ঞেয় ভাষা
পদ্মা-মেঘনা-যমুনা-কীর্তিনাশা
স্বপ্ন করবে প্রাঞ্জল ভালবাসা।

প্রতিরোধ আজ—প্রতিরোধে উত্তাল
বাঙলায় খোঁজে ইতিহাস মহাকাল।

আর নয় দূর মেহমান

সাধনা মুখোপাধ্যায়

মিষ্ট পিষ্টকের এক রসনাসিক্ত দায়ভাগে
বারবার ভাঙেচোরে আরোপিত রাজনীতির কাঁটা তার
দর্শনার চেক্‌পোস্ট যশোরের নিষিদ্ধ সীমানা
অঙ্গ বঙ্গ আর কলিঙ্গের
নৃপতির কব্জিবদ্ধ হস্তমুঠি শক্তিমান একদিন বৃদ্ধ হয়ে শ্লথ হয়
আরেকটি সবল হাত কম্পিত জরাকে দেখে হো হো করে হাসে
রাজা যায় রাজ্য যায় পাল সেন সুলতান হোসেন
এমনকি পরদেশীও একদিন টুপি খুলে বিদায়সূচক রণে ভঙ্গ দেয়
শুধুই ভিন্ন ধর্ম এই এক স্তোকবাক্যে ভুলে
দুজনেই দুজনকে একঘরে করে রাখি দূরে দূরে অপরিচয়ের এক পাশে
ভাবলাম স্বর্গে কোনো পৌঁছে যাব
মুখের ভাষার চেয়ে সেটা বেশি মজবুত ভিত
হয়তো জিভেরও শর্টকাট
তারপর একদিন খুলে গেছে একুশে ফেব্রুয়ারির এক
আত্মার মৃত্যু-বেদনার শোকাহত শরিকের বন্ধ করা পলেস্তরা খসা
পুরাতন আঙিনার বনেদী কপাট
দুজনেই দুজনের মুখ-আয়নায়, নিজের মর্মের ছায়া দেখি
এতদিন ব্যবহৃত ভিন্ন এক মুখোশের অন্তরে ধরা পড়ে
বহু জোড়াতালি আর মেকি
দুজনে দুজনকেই বুকে চেপে কেঁদে কেঁদে মরি
দুজনেই হেরে গেছি দুজনেরই এক ব্যথা
ভাষার বত্রিশ নাড়ি মানে না যে জন্য কোন বন্ধনের
শতেক শপথে বাঁধা দড়ি
অদেখা আমার সেই শ্রুতি-সুখ নামগুলো মনে মনে আওড়াই
রঙপুর , রাজশাহী, সন্দীপ, আড়িয়াল খান
আশার প্রহর গুণি মনে মনে আর নয় হয়তো চাক্ষুষ হবে
সেখানে সূর্য এক ভাস্বর জীবন
সেখানে মিলিত হব ঝিলে ও বাদার দায়ে কলমীলতার মতো
অবিচ্ছিন্ন জলে অঙ্গ, বুকে বুক আর নয় দূর মেহমান।

মণি সিং-এর জীবনের একটি অধ্যায়

দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

[বাঙলাদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে মণি সিং এমনই একটা নাম যা প্রায় মন্ত্রের মতো কাজ করে। সত্তরের উপর বয়েস। আকৈশোর রাজনীতি করছেন। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন থেকে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের পথে আসেন। অবিভক্ত বাঙলাদেশে শ্রমিক আন্দোলন যাঁরা শুরু করেছিলেন, মণি সিং তাঁদেরই একজন। তারপর তিনি কৃষক আন্দোলন শুরু করলেন মৈমনসিংহ জেলায়। তাঁর নেতৃত্বে সংগঠিত টংকবিরোধী আন্দোলন তো আজ ইতিহাস।

দেশবিভাগের পর, পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির জন্মলগ্ন থেকে, তিনি ছিলেন কমরেডদের 'বড় ভাই'। আজও তাই।

অল্প বয়েস থেকেই বৃটিশ ও পাকিস্তান সরকারের কারাগারে তাঁর দীর্ঘ জীবন কেটেছে। আত্ম-গোপন অবস্থায় কেটেছে জীবনের আরও বৃহৎ অংশ।

পূর্ব-পাকিস্থানে (বর্তমানে বাঙলাদেশ) হাজংদের সশস্ত্র সংগ্রামের নায়ক এই মানুষটিকে আয়ুব আমলে তাঁর দেশবাসী জেল ভেঙে ছিনিয়ে আনে। ইয়াহিয়া আবার তাঁকে বন্দী করলেও ২৫এ মার্চের পর স্বাধীন বাঙলাদেশের রাজশাহী জেল থেকে তিনি বেরিয়ে আসেন।

তারপর নতুন ইতিহাস। আজও তার নির্মাণ চলছে। এবং এখনও তিনি তার সঙ্গে একই ভাবে যুক্ত।

সম্প্রতি গঠিত বাঙলাদেশ সরকারের উপদেষ্টা-পরিষদে তিনি বাঙলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি। আর, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম নায়ক।

এখনকার অসম্ভব ব্যস্ত দিনগুলোর মধ্যেও কয়েকদিন দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর বিচিত্র ও রোমাঞ্চকর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা শোনার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়। তারই একটা অংশ এখানে লিপিবদ্ধ হলো।

প্রসঙ্গত 'বড় ভাই' বলেছিলেন : এইটা আমার লাইফের একটা মূল ঘটনা। সমস্ত ঘটনা যদি তুচ্ছ করে দেনও,—আমার কাছে আমার নিজের জীবন গড়ে ওঠার ব্যাপারে এই ঘটনার গুরুত্ব কত-খানি তা আমি জানি। আমি পরিবারের প্রিয়জন ছিলাম। মাকে চিরকালই অসম্ভব ভালোবাসতাম। কিন্তু তা সত্ত্বেও একক সিদ্ধান্তে আমি মেটিয়াবুরুজ ছেড়ে সুসং-দুর্গাপুরে থেকে টংক-বিরোধী আন্দোলন শুরু করি।

আমরাও জানি এই আন্দোলন এবং '৪৯-'৫০ সালের হাজং সশস্ত্র সংগ্রাম বাঙলাদেশের ইতিহাসে কতবড় ঘটনা।]

ঢাকা জেলে সাজা খাটার পর সম্ভবত ১৯৩৬ সালে আমাকে নদীয়া জেলার করিমপুরে অন্তরীণ করা হয়।

এগারোশো ডেটিনিউকে লিস্টি করে ছাড় দেওয়া হয়। আমিও খালাস হই।

চুয়াডাঙা স্টেশন থেকে মুক্তি পেয়ে কলকাতা এলাম। সেন্ট্রাল এ্যাভেনিউতে কৃষক-সভার অফিস। গেলাম সেখানে, কিন্তু নেতৃস্থানীয় কারোরই দেখা পেলাম না। আমার কাছে রেলওয়ে ওয়ারেন্ট ছিল। দেরি করলে সেটি বাতিল হয়ে যাবে। তাই ভাবলাম, যাই, এই সুযোগে একটু মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। সাত দিন পরে ফিরব।

আমি সুসং চলে গেলাম। সেটা ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাস।

আমি এসেছি শুনে দশাল গ্রামের পাঁচ-ছজন মুসলমান কৃষক দেখা করতে এলো। তারা বলল, ছাড়া পাইসেন যে খুব ভালো হইসে। এ্যাহন এট্টু টংক নিয়া লাগেন। আপনেই তো কইসিলেন কৃষকরা এক হইলে টংক রদ সম্ভব। এ্যাহন আন্দোলন কইর‍্যা আমাগো বাচান। আমরা হগগলডি মইরা আছি।

আমি বলি: আমি কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করি, সেখানে আমায় ফিরতে হবে। কাজের একটা লাইন আছে তো! আমি কি করে এখানে টংক আন্দোলন করব? এসেছি মায়ের সঙ্গে দেখা করতে, দুটো দিন থেকে আবার চলে যাব।

একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তারা ফিরে যায়। কিন্তু প্রত্যেক দিন পাঁচ-সাত জন করে কৃষক এসে বলতে থাকে: আমি দেশের ছাওয়াল। আমি যেন একটা আন্দোলন শুরু করি।

চার-পাঁচ দিন এইভাবে চলল। ফিরিয়ে দিচ্ছি, ব্যাপারটা খারাপ লাগে, আবার শ্রমিক আন্দোলনও হাতছানি দিচ্ছে। সে-এক মহা দোটানা!

একদিন রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম: আমি কি প্রকৃতই এদের ট্রেড ইউনিয়ন মুভমেন্টের স্বার্থে ফিরিয়ে দিচ্ছি, নাকি, আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হবে এই ভয়ে গোটা ব্যাপারটাই এড়িয়ে যেতে চাইছি?

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, বৃটিশ পুঁজি, মারোয়াড়ী পুঁজি…এ-সবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি। কিন্তু তাতে তো আমার নিজের কোনো ক্ষতি ছিল না। এইখানে আন্দোলন মানেই নিজের বিরুদ্ধে নিজের আন্দোলন। আমার পরিবারকে ঘায়েল করা।

হঠাৎ মনে হলো আমি যদি প্রকৃতই মার্কসবাদী-লেনিনবাদী হই তাহলে আমার আসল কর্মক্ষেত্র হবে মেটিয়াবুরুজ নয়, এইখানে।

আমি বুঝলাম এই আমার মহাপরীক্ষাস্থল।

সুসং-দুর্গাপুরে আলোচনা করার মতো কেউ নেই। দাদাদের সঙ্গেও আলোচনা করে লাভ নেই। বুঝলাম সিদ্ধান্তটা আমাকে একক ভাবেই নিতে হবে।

দু-এক দিনের মধ্যেই মনস্থির করে ফেললাম। আমাকে এই মহাপরীক্ষাই দিতে হবে।

মণি সিং সোজা হয়ে বসলেন। হাসি মুখে, কিছুটা তন্ময় অথচ দীপ্তচোখে আমার দিকে তাকালেন। তারপর কৌটো থেকে তামাক পাতা বের করে বাঁ-হাতের তালুতে রেখে ডান হাতের বুড়ো আঙুল ঘসে ঘসে খৈনি বানাতে বানাতে বললেন: কলকাতায় শ্রমিক আন্দোলন করার লোক পাওয়া যাবে। কিন্তু এখানে আন্দোলনের জন্য চাই স্থানীয় লোক। যেহেতু আমি রাজনীতিক ও স্থানীয় লোক সেহেতু এ-আন্দোলন আমাকেই করতে হবে। কৃষকরাও আমাকেই বিশ্বাস করবে। কারণ আমি একজন কমিউনিস্ট।

বাঁ হাতের তালুর ওপর ডান হাতে কটা কৌশলী চাপড় মেরে খৈনি বানানো শেষ হলো। এক টিপ খৈনি মুখে পুরে বলতে লাগলেন: আত্মীয় পরিজনের বিরুদ্ধে শ্রেণীসংগ্রাম করতে পারলে বুঝব আমি নিজ আদর্শের প্রতি বিশ্বস্ত। এটা পশ্চাদপদ অঞ্চল। শহর ছেড়ে কারখানা ছেড়ে এখানে পড়ে থাকতে পারলে বুঝব দেশপ্রেমের কথা আমার মুখে সাজে।

তখনও পার্টির এ-ধরনের কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। একটা পার্টি আছে, তার নির্দেশে সবকিছু চলছে—এরকম কোনো বাধ্যবাধকতা আমাদের ওপর তখনও বর্তায় নি। সুতরাং স্থির করলাম নিজে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিজেই কাজ শুরু করে দেবো।

স্থির তো করলাম। কিন্তু করবটা কি?

জমিদার অসম্ভব শক্তিশালী, তায় আত্মীয়। ইতিপূর্বেই আমার সঙ্গে একবার ঘটনা ঘটে গেছে। আরও অনেক আত্মীয়-স্বজন আছেন টংকর ধানের ওপর যাঁদের সংসার যাত্রা নির্ভর করে। তাছাড়া আমার নিজের বাড়িও আছে।

টংকবিরোধী আন্দোলন মানে মৌচাকে ঢিল। দাদারা বাধা সৃষ্টি করতে পারবে না। কিন্তু মা? অত্যন্ত কোমলহৃদয়া হওয়া সত্ত্বেও মা দৃঢ়তার সঙ্গে

বরাবর আমাকে সমর্থন করেছেন। এবার কি হবে? মা কি ঘরে-বাইরে সকলের চাপ সহ্য করতে পারবেন? যদি কান্নাকাটি শুরু করেন, আমি কি করব তখন?

তাছাড়া, আন্দোলনটা করব কি ভাবে? আমার শ্রমিক আন্দোলনের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু কৃষক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তো একেবারেই নেই!

মুসলিম কৃষকরা আন্দোলন ইত্যাদির ব্যাপারে একেবারেই অনভিজ্ঞ। তাদের জমিদার-ভীতি প্রবল। পুলিশের ভীতি আরও বেশি।

শ্রমিক আন্দোলনে দেখেছি শ্রমিকরাই বহু সময় আমাকে বলে দিয়েছে কি করতে হবে বা কি বলতে হবে। তাদের উপদেশ বহু সময় আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে। কিন্তু এটা শ্রমিক এলাকা নয়। আমি জানি কৃষকরা সব সময় আমার ওপরই নির্ভর করবে। কিন্তু প্রয়োজনে আমি নির্ভর করব কার ওপর?

তাছাড়া পুলিশ পাইক হাতি এলে এরা দৃঢ়তার সঙ্গে দাঁড়াতে পারবে কি না তাও জানি না। তাছাড়া নানা স্বার্থ এদের মধ্যে ক্রিয়া করে। কৃষকরা সঙ্কীর্ণতাবাদীও হয় বটে!

কিন্তু এগুলো যেমন খারাপ দিক, তেমনি আবার গোটা পরিস্থিতির ভালো একটা দিকও আছে।

প্রকৃত ব্যাপারটা হলো: কৃষকদের ওপর ভয়ানক শোষণ চলছে। তাই অবস্থার চাপেই তারা আন্দোলনে নামতে চায়।

আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা আছে, কৃষকদের সংগ্রাম করার আগ্রহ আছে, অতএব তাদের মধ্যে ঐক্য হওয়াও সম্ভব। আর ঐক্য হলে অনেক দুর্বলতাই কেটে যেতে পারে। কারণ ঐক্যের শক্তির যাদুই হলো সে মানুষকে নির্ভয় করে, বেপরোয়া করে।

কৃষকরা টংকবিরোধী আন্দোলনের কথা ভাবছে—এতে তাদের আর্থনীতিক চিন্তাই প্রবল। আমার কাছে এটা রাজনৈতিক আন্দোলন, কিন্তু রাজনীতি সম্পর্কে তাদের কোনো চেতনাই নেই। ওরা মনে করে স্বদেশী ভদ্রলোকের ব্যাপার। তাদের এসব নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।

কিন্তু শ্রমিকরাও তো বাস্তব অবস্থার চাপেই ঐক্যবদ্ধ হয়। তারাও তো অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া নিয়েই আন্দোলন শুরু করে। তারপর তাদের মনে ক্রমে ক্রমে রাজনৈতিক চেতনা জাগে।

আমি বুঝলাম কৃষকদের ক্ষেত্রেও তাইই হবে।

আগেই বলেছি সুসং-এর জমিদার অত্যন্ত শক্তিশালী। এখানকার মধ্যশ্রেণীও রীতিমতো শোষক। আর এরাই গরীব কৃষকদের বাঁচামরার কর্তা।

কিন্তু ইংরাজ সরকারের প্রশাসন ব্যবস্থার দ্বারা সুরক্ষিত ও এই মধ্যশ্রেণীর সেবা আর সহায়তায় পুষ্ট প্রবল প্রতাপ জমিদারের পুরুষানুক্রমে গড়ে ওঠা প্রকাণ্ড সংগঠনের প্রচণ্ড বাধাকে অতিক্রম করাই তো কমিউনিস্টের কাজ।

বুঝলাম শুরু করতে হবে। কারণ আন্দোলনের বাস্তব অবস্থা এবং আন্দোলনকারীদের ঐক্যের সম্ভাবনা—যে কোনো সংগ্রামের এই দুটি প্রথম আর প্রধান শর্তই এখানে উপস্থিত!

তখন, আন্দোলনের রূপটা কি হবে তাই নিয়ে ভাবনা শুরু হলো। আন্দোলনটা যদি খাজনা বন্ধ করার হয় তাহলে জমিদারপক্ষ সরকারী সাহায্যে অত্যাচারের বন্যা বইয়ে অতীতের মতো সহজেই তা দমিয়ে দেবে। শুরু হলো কৌশল নিয়ে চিন্তা। না, শুধু সভা-সমিতির বক্তৃতা নয়। কৃষকের ঘরে ঘরে সেধোতে হবে। তাদের দিয়ে বলাতে হবে—খাজনা আমরা দেব, তবে ধানে নয় টাকায়।

এখন নভেম্বর মাস। জমিদারের লোকরা ধান নিতে বেরোবে জানুয়ারি মাসে। তারা যে-কোন ভাবে ধান নিয়ে ফিরবে। সুতরাং অবিলম্বে "ধান বন্ধ, টাকায় খাজনা" স্লোগান সহ বেরিয়ে পড়তে হবে।

আন্দোলনের এই ফর্মটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই খুঁজে পেলাম। কিন্তু খুঁজে তো পেলাম আমি। এখন, কৃষকদের ওপর এই স্লোগানের প্রতিক্রিয়াটা কি হয় তাও তো দেখতে হবে!

স্থির করলাম কাল থেকে নেমে পড়ব।

এইভাবে, বাড়ি যাওয়ার দু-চার দিনের মধ্যে, সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। বুঝলাম দেরি করলে অবস্থা হাত ফসকে যাবে, জনসাধারণ ডিফেন্সিভেই পড়বে, তাদের কিন্তু অফেন্সিভেই রাখতে হবে।

তাছাড়া এত ভয়েরই বা কী আছে?

শ্রমিক আন্দোলনেও তো দেখছি গোড়ার দিকে শ্রমিকদের মধ্যে চূড়ান্ত হতাশা থাকে। তারা কথায়কথায় বলে: উওতো বহোৎ দিখা, কুছ নেহি হোগা।

কমিউনিস্ট মতাদর্শে দৃঢ়ভাবে বিপ্লবী না হলে শ্রমিকদের এই সংশয় আর অবিশ্বাস দেখে বহু কর্মীই ঘরে বা পার্টি অফিসে ফিরে যেত। আবার দেখা গেছে কোনো ঘটনা ঘটলে ঐ হতাশ শ্রমিকরাই ঐক্যবদ্ধ জঙ্গী সংগ্রাম করে।

সুতরাং বুঝতে পারলাম কৃষকরাও গোড়ায় যতই ডিমরালাইজড ও দ্বিধাগ্রস্ত হোক, অভিজ্ঞতায় পোড় খেলেই তারা মিলিট্যাণ্ট আর ঐক্যবদ্ধ লড়াই শুরু করবে।

হ্যাঁ, বাধা চূড়ান্ত। ভীমরুলের চাকে ঢিল পড়বে। কিন্তু নো রিটার্ণ। যত অল্প সঙ্গীই হোক শুরু করতে হবে। এইভাবে মনস্থির করে আত্মবিশ্বাস অর্জনের পর দশাল গ্রামে চলে গেলাম। সেই বৃদ্ধ কৃষককে ডেকে বললাম: টংক আন্দোলনে আমি আপনাদের সহযোগী। আমি আছি আপনাদের সঙ্গে।

খুবই খুশি হলো বৃদ্ধ। ডাকল সবাইকে। তাদেরও বললাম: আমি আপনাদের সাথী। আপনাদের এগোতে হবে।

তারা বলল: আপনি থাকবেন সামনে। আমরা আপনার পেছনে।

আমি বললাম: আমি কেন সামনে থাকব? টংক উচ্ছেদ হলে আমার কোনো লাভ হবে? বরং ক্ষতি হবে। স্বার্থ তো আপনাদের। সুতরাং আপনাদেরই সামনে থাকতে হবে। আমি দেশসেবক। স্বাধীনতা চাই, কৃষকদের মঙ্গল চাই। আদর্শের কারণে আমি আপনাদের সঙ্গে থাকব।

কিন্তু তারা বুঝল না। বলল: সামনে আপনি থাকবেন। আমাদের কি করতে হবে বলেন।

বুঝলাম অচেতন কৃষকদের এখন এ-কথা বোঝানো যাবে না, বোঝাতে গেলে বৃথাই সময় নষ্ট হবে। যেমন: করতে হবে একতা, জোট বাঁধা।

তারা বলল: এক হব? ব্যাঙকে আপনি পাল্লায় মাপতে পারবেন? একটা এদিকে ছিটকোবে একটা ওদিকে ছিটকোবে। আমাদেরও হবে সেই অবস্থা। ঐক্য ঠিক হবে না।

আমি বললাম: আচ্ছা, এই যেসব কৃষক আছে—তারা কি টংক উচ্ছেদ চায়?

—কি যে কন! ব্যাবাক চায়।

—তা অইলে টংক উচ্ছেদের স্বার্থে হগলের ডুলে ভইরা পাল্লায় তোলেন। খাখবেন কেউ ছিটকাইতে পারব না। টংক উচ্ছেদ হইল ডুল।

শুনে সবাই খুশি হয়ে গেল।

—দ্বিতীয় কথা হইল: এক গোটা টংক ধান কেউ দিতে পারবা না।

শুনে সবাই স্তব্ধ হয়ে রইল।

—কইতে অইব খাজনা আমরা দিমু না, তা না। জোতদারের যে হার আছে

—এক আরা জমিতে ৫ টাকা থিকা ৭ টাকা—আমরা সেই হারে টাকায় খাজনা দিমু।

তখন দুই থেকে সোয়া দুই টাকা ধানের মন। চুক্তি মতো কৃষকদের এক আরা (সোয়া একর) জমিতে আট থেকে পনের মণ ধান দিতে হতো। অর্থাৎ সোয়া একরের পাঁচ থেকে সাত টাকা খাজনার জায়গায় দিতে হতো অন্তত ষোল টাকা। টংক কৃষকদের শোষণের পরিমাণটা এর থেকেই বোঝা যাবে।…

অল্পদিনের মধ্যেই টংক আন্দোলনটা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ কৃষকদের মধ্যে আমি প্রথমে যতটুকু আশা করেছিলাম তার থেকে অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি হলো।

আন্দোলন প্রথম শুরু হলো আমার বাড়ির কাছে সুসং-দুর্গাপুর দশাল গ্রাম থেকে। মুসলিম কৃষকরা—তাদের টংক রেটও বেশি ছিল—ব্যাপক ভাবে আন্দোলনে সাড়া দিল। কিছুদিনের মধ্যেই আমরা সুসং-এর উত্তর দিকে অর্থাৎ পাহাড়ের কোল ঘেঁসে যে উপজাতি এলাকা ছিল, সেখানেও গিয়ে উপস্থিত হলাম। প্রথমে আমি ললিত সরকারের বাড়িতে গেলাম। সেটা লেঙ্গুড়া গ্রাম। আমাদের গ্রাম থেকে সাত মাইল দূরে।

ললিত সরকারের বাড়িতে যাওয়ার কারণ হলো আমি শুনলাম ১৯৩০ সালে সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স আন্দোলনের সময় ললিত সরকারের নেতৃত্বে এখানে একটি কংগ্রেস অফিস খোলা হয়েছিল। এবং তারা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। পুলিশ থেকে সেই অফিস জালিয়ে দেওয়া হয়।

ললিত সরকারের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনার পরিচয় পেয়ে আমি তার কাছে গিয়ে উপস্থিত হই। ললিত সরকার একজন ধনী কৃষকের সন্তান। তার প্রচুর জমি ছিল, কিন্তু কোনো টংক জমি ছিল না। কিন্তু দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে ললিত সরকার টংকপীড়িত কৃষকদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জঘন্য বর্বর টংকপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য এগিয়ে এলেন। প্রকৃতপক্ষে ললিত সরকারকে ভিত্তি করেই পাহাড় অঞ্চলে হাজং ডালু কোচ বানাই প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

পাহাড় অঞ্চলে উপজাতি-এলাকায় টংক হার কম ছিল। মুসলিম এলাকায় টংকর হার ছিল অনেক বেশি। তা সত্ত্বেও হাজংরা অনেক তাড়াতাড়ি এই আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করল।

এই সব হাজং কৃষকরা যেমন আর্থনীতিক আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হলো, তেমনি

একটা দেশপ্রেমিক কাজ বলেও এটাকে গ্রহণ করল। যাদের মোটেই টংক জমি ছিল না এরকম মধ্য ও গরীব কৃষকও এই আন্দোলনে যোগদান করে সংগ্রামকে দুর্বার করে তুলল।

এই আন্দোলনের শুরু হওয়ার সঙ্গেসঙ্গে জমিদারবর্গ, মহাজন, মধ্যবিত্ত সমাজ প্রভৃতি আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। পূর্বে যেটাকে ভিমরুলের চাকে ঢিল বলে মনে করেছিলাম, এখন দেখলাম ব্যাপার এর থেকেও অনেক বেশি গুরুতর। চারদিক থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড আক্রমণ।

দাদারা আমার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। অবশ্য তাঁরা নিজেরা আমাকে কটুকথা বললেন না। মাকে দিয়ে আমাকে প্রভাবান্বিত করবার চেষ্টা করলেন।

মা একদিন আমাকে বললেন ঃ এই যে আত্মীয়স্বজনের লগে তুমি বিরুদ্ধাচরণ করতাম—এইটা কি ভাল হইতাসে ?

আমি মাকে কোনো শ্রেণীসংগ্রাম বোঝাবার চেষ্টা করলাম না। কারণ তিনি যেভাবে মানুষ হয়েছেন তাতে তাঁর এই পরিণত বয়সে তাঁকে শ্রেণীসংগ্রাম বোঝানোর চেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। আমি তাঁকে শুধু এই কথাই বললাম ঃ তুমিই তো আমাদের শিখিয়েছিলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে হয়, যারা গরীব তাদের সাহায্য করতে হয়। শিখিয়েছিলে নরই হচ্ছে নারায়ণ, যত্র জীব তত্র শিব। আমি তো সেই নরনারায়ণকেই সাহায্য করছি। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। তোমার শিক্ষাই আমার জীবনের আদর্শ। সেইভাবেই আমি আন্দোলন শুরু করেছি। এতে সহস্র সহস্র লোকের কল্যাণ হবে। মুষ্টিমেয় কজনের অসুবিধে সত্ত্বেও সহস্র সহস্র লোকের যদি উপকার হয় তাহলে সেইটেই করা কি বাঞ্ছনীয় নয় ?

মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। একটি প্রতিবাদও করলেন না।

সেদিন কোনো বাধাকেই আমি আমল দিইনি। একটিমাত্র সম্ভাব্য বাধাকেই আমার প্রবল মনে হতো। মা যদি বাধা দেন তাহলেই তো মুশকিল।

কিন্তু এর পরে এ-ব্যাপারে মা আর কোনদিন কোনো বাধা দেন নি। আমার জন্যে তাঁর অনেক ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মনে মনে সন্তুষ্ট না হলেও তিনি আমাকে কিছু বলেন নি।

যে বাধাকে আমি বিরাট ভেবেছিলাম, এইভাবে অল্পআয়াসেই তা অতিক্রম করা গেল। আমার সামনে আর কোন বাধাই থাকল না।

গান্ধীনগরে একরাত্রি

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

গোকুলকে সবাই চেনে, চিনে রাখল ডি-আই-বি-র লোক,
স্টেটস্‌ম্যান পড়ার ফাঁকে আড়চোখে, গোকুলের মা
অন্ধকার ঘন হলে বলেছিল, 'আর নয়, এবার ফিরে যা,'
ফেরার আগেই খাকি রঙের বিদ্যুৎ দরজায়—
রিভলবার গর্জে ওঠে, গরজায় গোকুল,
রাষ্ট্রীয় ডালকুত্তা ঝুঁকে ছিঁড়ে নিল এক খাবলা চুল,
রাতকানা মায়ের চোখে কুরুক্ষেত্রে বেল্ট-এর পিতল, বুট,
জলস্রোতে নামে অন্ধকার ;
শবচক্র মহাবেলা প্রশস্ত প্রাঙ্গন
পাথরে পাথরে গর্জে কলোনির সুভদ্রার শোক।

অধ্যাপক বলেছিল, 'হ্বাট্‌স্ র-ঙ্, আইন কেন তুলে নেবে হাতে',
মাস্টারের কাশি ওঠে, 'কোথায় বিপ্লব? শুধু মরে গেল অসংখ্য হাভাতে',
উকিল সতর্ক হয়, 'বিস্কুট নিইনি, শুধু চায়ের দামটা রাখো লিখে'
চটকিলের ছকুমিঞা,'এবার প্যাঁদাব, শালা, হারামি ও. সি-কে।'

উনুন জ্বলেনি আর, বেড়ার ধারেই সেই ডানপিটের তেজী রক্তধারা,
গোধূলি গগনে মেঘে ঢেকেছিল তারা।

দুর্লভ আগুন তুই পেয়েছিলি

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

দুর্লভ আগুন তুই পেয়েছিলি
এইখানে, জনপদে, মানুষের কাছে
কিছুই রাখলিনে তুই অকারণে, দুহাতে ছড়ালি।
হেমন্তে উদ্যান পোড়ে, পুড়ে যায়, অসম্ভব দাহে
কেউ যে দেখেনি তোকে,
দেখেছে যে আগুনের তীক্ষ্ণ ফুলগুলি।

২

কী যে তোর দুঃখ ছিল, কী রকম আশা ও নিরাশা ?
বলেছিলি, তীব্র দ্বন্দ্বে, রৌদ্রদগ্ধ পাখির সংলাপে—
আরক্ত শরীর পোড়ে,
সময়ের দৃশ্যগুলি, হৃদয়ের সব ভালোবাসা।
দুর্দিনের সন্ধিলগ্নে, যন্ত্রণায়, পোড়ে অভিশাপে।

৩

কে তোকে গোলাপ দেবে ?
যা ছিল রক্তের মতো অক্ষয় রৌদ্রের সমারোহে
আঁধার পোড়ানো আলো, উজ্জ্বল আকাশে কলরব !
দেখলিনে কিছুই তুই, নিজেকে না,
অলৌকিক আগ্নেয় সম্মোহে
উদ্যানে পোড়ালি শুধু প্রেমিকার শব।

এখন প্রতিটা দিন

অনন্ত দাশ

এখন প্রতিটা দিন শিকড়েতে টান দেয়
পাতাগুলি নড়ে ওঠে
অনেক শিশির
চোখ ধুয়ে বয়ে যায় সমুদ্রের দিকে।

আকাশ চৌচির করে একদিন সূর্য উঠেছিল
বিপন্ন মানুষ
নিরেট স্তব্ধতা ভেঙে
ছুটেছিল মোহানার দিকে
মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত, সংশয় সন্দেহ
পথরোধ করে

ঝড়ো মেঘ, ঘোলাটে নদীর পথ, প্রতারণা
সব কিছু ভুলে
দক্ষিণ গোলার্ধে দেখি আলোর বিস্তার

তবু মানুষে মানুষে আজ ঘৃণা বাড়ে
ভালবাসা আত্মপরাজয়ে
ক্ষোভে দুঃখে ধৃতরাষ্ট্র যেন ঘূর্ণিপাকে, আত্মদ্বন্দ্বে
হাতের অব্যর্থ তীর বারংবার লক্ষ্যভ্রষ্ট
বিরুদ্ধ স্রোতের মুখে দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ি
দুষ্ট দ্রোণাচার্য ফের অঙ্গীকার চায়

চতুর্দিকে প্রতিদ্বন্দ্বী হাওয়া
যতই সময় যায়
গ্রামেভিতে, অন্ধকার হাঁটু গেড়ে বসে
তবু কোনদিন আমি ও-আঁধার বিদীর্ণ করে
পৃথিবীর দুঃখের শরীরে
শেষ রক্তবিন্দুটুকু দিয়ে যেতে চাই।

সমস্ত রাত : একটি অনুভব

আশিস সান্যাল

সমস্ত রাত
তোমায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখছিলাম
এক ঝাঁক বাদামি অন্ধকার
কেশর দুলিয়ে ক্রমাগত ছুটে চলেছে
অন্য এক গভীরতম স্তব্ধতার দিকে।

অথচ দূরে
সেই পরিচ্ছন্ন নীলিমায় অববাহিকায়
দেখতে পেলাম রাশীকৃত সোনালী রোদ্দুর
যেন আবির্ভাবের অমৃত-যন্ত্রণায় দ্রুত সঞ্চরমান।

দুর্জয় প্রতিরোধের মধ্যে
অন্ধকারগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন করতে করতে
আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম :
হে ভালবাসা,
আমাকে অন্য গ্রহের সংকেতে আবদ্ধ কর।

সমস্ত আকাশ
তোমার চোখের মতো নিরাময় প্রত্যাশায়
কলকল্ করে উঠল।

অপ্রতিদ্বন্দ্বী

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

বস্তুত শিল্পীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই থাকা অসম্ভব তার

যুদ্ধতো নিজের সঙ্গে আমৃত্যু নিজের সঙ্গে একার সঙ্গে একার
মুখোমুখি রথ স্থাপন করে সারথি জ্যা-রোপন করে অতিরথ
বিদ্ধ হয় সে নিজের শরে নিজেই আর গ্রহণ করে শরশয্যা
উত্তরায়নে সূর্য এসে না দাঁড়ালে তার রক্তক্ষরণের বিরাম নেই
বলতে পারবে না—
এইবার আমি পেলাম এই তো সূর্যাস্ত
মরণ দিয়েছে শ্বেতপতাকা উড়িয়ে
যুদ্ধ এবার থেকে তবে বন্ধ হোক
নিজের শরে নিজেই বিদ্ধ হতে হতে তার শরসন্ধান
এক হাতে তোলে বিদ্ধ তীর অন্য হাতে তোলে ব্রহ্মাস্ত্র তার মৃত্যুবাণ
প্রতিপক্ষ নেই বলে জয়ও নেই পরাজয়ও নেই
আমার দেওয়া আঘাত ফিরিয়ে দিতে পারে না তাই দুঃখ।
অরক্ষিত হলেও তার দুঃখ নেই শিরস্ত্রাণ আর বর্ম নেই
কবচকুণ্ডল দান করেও দানের নেশায় পাগল অজেয় সেই পাগল
কুরুক্ষেত্রে ফুড়ে ওঠে অলক্ষ্যে সেই ক্ষরিত রক্তবীজ সেই বিষাদ সেই আত্মজ বিষাদ

ইচ্ছামৃত্যু হলেও এই বিষাদ ফোটাবার জন্যই তার বেঁচে থাকা
মরতে মরতে মরতে বেঁচে থাকা।
বৃথাই আগে মখমলের উপাধান আর মর্ম ভৃঙ্গার
পাতাল ভেদ করে ফেনশূন্য অনুষ্ণ স্বচ্ছ জল
তার তৃষ্ণা নেভাবার নয়
ঠোঁটের প্রান্ত ছুঁয়ে জল নেমে আসে পায়ের পাতায়
বৃথাই লেপন কর স্বার্থবৈদ্যের সঞ্জীবনী তার ক্ষতের মুখগুলিতে
নিরাময় নয় তার জন্য যন্ত্রণা তার নিয়তি এই জীবিতের
উপাধান ওই নিক্ষিপ্ত শরফলক
ক্ষরিত রক্ত রক্তের উষ্ণকণা তার পানীয়
উত্তরায়ণে সূর্য এসে না দাঁড়ালে তার মরণ নেই
রক্তক্ষরণের বিরাম নেই
ক্ষরিত রক্তবীজ যখন মেলে ধরবে বীজপত্র কুরুক্ষেত্রের বিষাদ ভেদ করে
অলক্ষ্যে
সে তখনই বলতে পারবে—
এবার আমি শান্তি পেলাম এই তো সূর্যাস্ত
মরণ দিক শ্বেতপতাকা উড়িয়ে
যুদ্ধ এবার বন্ধ হোক তবে অন্তত সাময়িকভাবে বন্ধ হোক

তবু যদি

তুলসী মুখোপাধ্যায়

তবু যদি জেগে ওঠে ভেতরের কঠিন পুরুষ
চারপাশে উই-এর ঢিপির মতো প্রবল প্রহার
পায়পায় ভ্রাতৃহত্যা, আত্মঘাতী রক্তের উল্লাস
ফুটপাতে পাঁচলক্ষ অর্ধনগ্ন মজুর সন্তান
সূর্য আড়াল করে ধ্যানে মগ্ন রক্তচোষা বাদুড়বাহিনী
ভালোবাসা উড়ে যায় উড়ে যায় সংকল্প স্বদেশ
তবু যদি জেগে ওঠে ভেতরের প্রগাঢ় পুরুষ!

অথচ কি শোভার মতো সচিত্র জীবনপঞ্জিকা
দাড়িকাটা নিভাজ-নিপাট অফিস সান্ধ্য পানসভা
দীঘার সমুদ্রতীরে সস্ত্রীক স্বাস্থ্য উদ্ধার
আর চারপাশে উই-এর ঢিপির মত প্রবল প্রহার
দেবদারু হাঁটু ভেঙে নুয়ে পড়ে পথের দুধারে
ভালবাসা উড়ে যায় উড়ে যায় সংকল্প স্বদেশ
তবু যদি ফুসে ওঠে ভেতরের কঠিন পুরুষ।

উত্তরকালের প্রবন্ধের কথা ভেবে

রবীন সুর

যে-কোন বিরুদ্ধতাই একদিন-না একদিন প্রথাগত অভ্যাসে
তার সার্থক ব্যবহারের তীক্ষ্ণতা হারিয়ে ফেলে
তবু এক-একদিন মধ্যাহ্নের মেঘ দেখলে একা-একা জ্বলে যাই ঘরে,
যখন রোদ্দুরের সময়
অথচ মেঘের অবৈধ দুপুরে ঝাঁজ নেই যন্ত্রণায়
একা একা মনে পড়ে রোদ্দুরের যা-কিছু বিরোধ
ঘরে ঘনিয়ে উঠুক :
অনভ্যাস ভেঙে ভেঙে দ্রুত, বৈপ্লবিক বোধে!

গলায় নখের দাগ, একচোখ ওপড়ানো রক্তমাখা থ্যাঁতা শরীর নিয়ে
উত্তরকালের প্রজন্মের মুখোমুখি
আমি সময়ের বুকে পা-রেখে স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠ, মধ্যাহ্ন রোদ্দুরে
নির্মেঘ আকাশ ক্লান্ত দুহাত তুলে নীল শিখার ঝাঁজে পুড়ে
একটি হৃদপিণ্ড নিয়ে হাজার হাজার শরিক শরীরে
ভাবতে পারি :
একটি মেঘের দুপুরে
একটি দাঁতালো আক্রমণের সঙ্গে মোকাবিলা করে এসেছি!

অধিকার

দীপেন রায়

চাইনি তো বাঙলা দেশ
চেয়েছি ভারতবর্ষ
পৃথিবীর আত্ম অধিকারে
মানুষের মহিমা কেবলই।
কে হে তুমি!
ছিলে কি তেমন দিনে বিপুল কল্লোল
করতল জুড়ে মুক্তি
অকল্পনীয় যা ছিল তেমন সেদিন
বিপুল উল্লাস ভরা কণ্ঠে দিছ গান—
বিনিময়ে বলেছো কেবলই—
"এখানে তোমার নেই কোন অধিকার।"

সমারূঢ়

শিশির সামন্ত

মানব দাঁড়িয়ে আছে সমারূঢ়, কাঙ্ক্ষিত তোমার যা যা রয়েছে বৈভব;
কিন্তু তুমি উপেক্ষায় নিজের মহিমাগুণে ভুলেছ সব; তোমার যা ছিল
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ, স্থিতপ্রজ্ঞ, আপামর ব্যক্তিত্বের যে মানুষই, কেন আজ
অভিভূত তবে?

পার্থেরও কপালে স্বেদ জমে ওঠে, সত্যের প্রতিজ্ঞা দীপ্ত দীপাধার ওই দুনয়ন।
আমরা মশাই ওই পরিত্যক্ত জতুগৃহ হতে চলে যাই; সঙ্গে দ্রৌপদী, পাঁচভাই;
ইতিহাসে এমনই ভ্রান্তিকাল আসে, যারা ছিল চিরকাল জনসমুদ্র জোয়ার
সময়ের পুরোভাগে, অবশেষে তারাই শেষের যাত্রী, সময়কে কল্লোলিত করে
কেলাসিত সুষমায় অজ্ঞাতবাসেতে চলে যেতে অপরূপ সমকালে প্রার্থনা বিদায়!
ইতিহাসে অনিবার প্রবেশ-প্রস্থান, শুভযাত্রিকেরা চলে, দীর্ঘ সেই পথের দুধারে
মৈত্রী ফেরীতে এসে ওড়ায় পতাকা, যে অরণ্য মানুষের গহন হৃদয়, এই
লোকালয়ে

আবৃত যা রয়েছে ঊনকোটি এক ভবিষ্যৎ, এ এক আত্মিক প্ররোচনা।
তবু এই ট্যাজিকেও প্রকৃত প্রস্তাবে হবে জয়, জয় হবে, পার্থ কিন্তু সঙ্গীহীন নয়
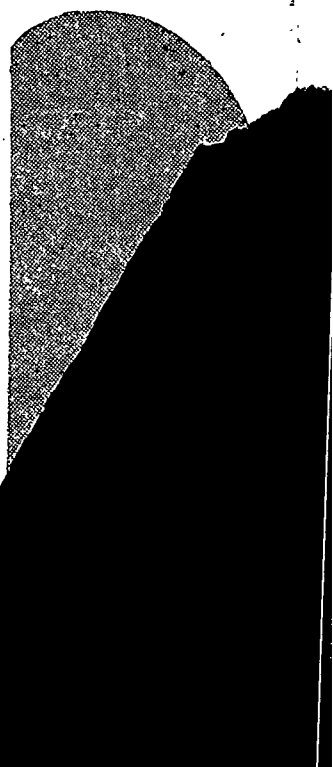
Sulekha®
drawing ink
AVAILABLE IN
EIGHT
DIFFERENT
COLOURS.
SULEKHA WORKS LTD.